আফগান জিহাদে খোদায়ী মদদের অবিশ্বাস্য ঘটনাবলীর ঈমানদীপ্ত সংকলন

আফগান রণাঙ্গনে

সংগ্রহ ও সংকলন মুহাম্মাদ আনওয়ার বিন আখতার

ভাষান্তর
মাওলানা হাসান জামীল

সূচিপত্র
লেখকের কথা.......................................20 জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ ও আল্লাহর মদদের প্রেক্ষাপট.......................................24
- জিহাদের উদ্দেশ্য-আল্লাহর কালিমার মর্যাদা বৃদ্ধি-................................25 পূর্ণ প্রস্তুতি ও শক্তি সংগ্রহ.........25 আল্লাহর দিকে মনোযোগের গুরুত্ব..........26 দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য..............................27 অভ্যন্তরীন কোন্দল হতে বিরত থাকা........27 অহংকার না করা...................................28 আত্মসমর্পণ থেকে বিরত থাকা.................28 শৃংখলা বজায় রাখা.............................29 আফগানিস্তানের মুজাহিদদের দুঃসাহসিকতা ও বীরত্বের বিস্ময়কর ঘটনা:..........29 মুজাহিদীনদের মনে জিহাদের প্রতি আগ্রহ29 ভয়ানক ও আশ্চর্যজনক ঘটনা..................30 বিস্ময়কর ও অভাবনীয় দৃশ্য...............31 নাসরুল্লাহ এবং ছয়টি হেলিকপ্টার.......33

নাসরুল্লাহর মাঝে সবগুলো পুরোদমে বিদ্যমান..33 অকল্পনীয় সাহায্য............................35 জালালুদ্দীন হক্কানীর ঘটনা................37 সুড়ঙ্গের অবিশ্বাস্য ঘটনা................38 কারামতের প্রদর্শনী..........................40 দুই শত্রুকে ঘায়েল...........................41 কর্তিত জিহ্বা নিয়ে মুজাহিদের হামলা. 41 ঈমানী তেজোদ্দীপ্ত এক আফগান নারী........43 নগন্য মুজাহিদ কর্তৃক হাজারো রুশ সৈন্যের মোকাবেলা..44 অভুক্ত অবস্থায় মুজাহিদগণ লড়তে থাকেন ....44 মুজাহিদা সাঈদা বিবির কীর্তি.............45 রুশ সৈনিকের মা মৃত সন্তানের চিঠি পেলেন ....47 রাশিয়ান সৈন্যদের মনে মুজাহিদ ভীতি ও বিজলীর পোষাক পরিহিত সৈন্যরা কোথায়?. 48 রাশিয়ানরাও কারামতের কথা বলে............48

“আল্লাহু আকবার” ধ্বনিতে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি...49 আল্লাহু আকবারের কোন প্রতিরোধক নেই.....49 তারা মানুষ নয়..................................50 রাশিয়ানদের মনে আচমকা ভীতি...............50 ক্লান্ত মুজাহিদকে পিঠে বহন করলো কমিউনিস্ট কয়েদী..............................51 ১২ এপ্রিল ১৯৮৬..................................51 মুজাহিদের প্রতাপ..............................52 মুজাহিদের দোয়া...............................52 পুরো যুদ্ধে একটি গুলী চালাতে হয়নি....53 রাশিয়ান সৈনিকের সাক্ষাতকার.............53 ফৌজী অফিসার ভেজা বেড়ালের ন্যায় চৌকীর নীচে লুকালো......................................54 অত্যাধুনিক অস্ত্রধারী খঞ্জরের সামনে অসহায়...54 রাশিয়ানদের স্বীকারোক্তি.................54 রাশিয়ান সৈন্যদের সন্ত্রস্ততা..........55 খোলা মরুভূমিতে পালংক........................56

ঘন কালো মেঘের জঙ্গী বিমানের সামনে প্রতি বন্ধক রূপে দাঁড়িয়ে যাওয়া.............57 আলোক রশ্মি আমায় পথ দেখিয়েছে...........57 শৈত্য প্রবাহ মুজাহিদদের বাঁচিয়ে দিলো ....58 ধোঁয়া মুজাহিদদের সাহায্য করলো.........59 মেঘ ছড়িয়ে পড়লো.............................59 হতাশ মুজাহিদদের জন্য আল্লাহর মদদ......60 বৃষ্টি সাহায্য করলো..........................61 কুপের ভেতর বিশ দিন............................62 ট্যাংক এবং বুলডোজার কবর স্থান গুড়িয়ে দিতে এসে নিজেই মাটির খেলনার মতো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো.............................63 বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর মদদ.............64 মুজাহিদীনদের জন্য খোদায়ী মদদের বিস্ময়কর ঘটনা.................................65 আল্লাহর মদদের এক ঘটনা.......................65 অন্ধকারেরর সাহায্যে মুজাহিদদের মদদ..66 গোলা বারুদের মাঝে অদৃশ্য বিস্ফোরণ.....67

স্বপ্নে বিজয়ের সুসংবাদ...................68 দুশমনের উপর অগ্নিগোলা......................69 গায়েব থেকে আওয়ায এলো এবং নিরস্ত্র মুজাহিদগণ অস্ত্র লাভ করলো.................69 বৃষ্টি আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করলো......71 দুশমনের উপর অদৃশ্য থেকে আঘাত.............71 মেঘের সাহায্যে মদদ...........................72 জীবিত মুজাহিদ..................................72 আল্লাহর গায়েবী মদদ..........................73 গায়েবী মদদ......................................74 এক ফরাসী সাংবাদিকের রিপোর্ট.............75 ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুজাহিদদের মদদ; সাদা পোষাকধারী ফেরেশতা.....................76 ওগুলো কী ছিলো?..................................76 বিদ্যুতের ন্যায় পোষাকধারী কোথায় গেলো?...76 সফেদ লেবাসধারী ব্যক্তির বিস্ময়কর ঘটনা যার হাতে দুই রুশ সৈন্যের ছিন্ন মস্তক ঝুলছিলো...76

ফেরেশতাদের ঘোড়া..............................77 গায়েব থেকে হেফাযত...........................79 রুশ সেনারা আমাদের নিকট ঘোড় সওয়ারদের কথা জানতে চায়..................................80 ফেরেশতাদের তাকবীর ধ্বনি...................80 সাহায্যের ঘোড়া...............................81 তারা পুরো ময়দানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিলো.................................81 জানাযায় সফেদ লেবাসধারীদের পরিচয় কী82 রাশিয়ানদের উদ্দেশ্যে কে গুলী ছুড়ছিলো?..82 মুজাহিদগণ সংখ্যায় কম হওয়া সত্বেও দুশমনের উপর বিজয়ী হবার ঘটনা.............84 মুজাহিদের নিক্ষিপ্ত পাথর দুশমনের উপর ট্যাংক বিধ্বংসী গোলা রূপে পতিত হলো....85 শুধুমাত্র একগোলার আঘাতে ধ্বংস..........86 একমুঠি ধূলি কণা ট্যাংককে ছাই ভস্মে পরিণত করলো.......................................87 অস্ত্রাধিক্যের অহংকার মাটির সাথে মিশে গেলো..88

ইমাম মাহদীর যুগের আলামত....................88 এ্যান্টিট্যাংক মেশিনগান ব্যতীত ট্যাংক বিধ্বস্ত..89 রাশিয়ানরা গ্রেফতার করতে পারবেনা......89 গোলাবারুদ শেষ হবার পর আল্লাহর পক্ষ হতে মদদ..90 শূন্য হাতে জয়..................................90 আল্লাহর মদদ......................................91 ২ হাজার রাশিয়ানের বিরুদ্ধে ১৫ মুজাহিদের বিজয়...............................91 দুটি ট্যাংক ও ২২জন রুশ সেনা পাঁচজন মুজাহিদ কর্তৃক আটক...........................92 অল্প সংখ্যক মুজাহিদ দুশমনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালেন.................................92 প্রথম আক্রমণেই ধরাশায়ী...................93 রাইফেল তাদের পায়ের সামনে পরে ছিলো....93 গৌরবময় সাফল্য.................................93 নয় বছর বয়সী ট্যাংক শিকারী মুজাহিদ..94 ১২০ জন মুজাহিদ ১০ হাজার রাশিয়ানের মোকাবেলায় অটল রইলেন........................94

রাশিয়ানদের লাশের দুর্গন্ধ..............94 খাদ্য দ্রব্যের প্রয়াজোনীয়তা পূরণে গায়েবী মদদ......................................95 পানি চায়ে রূপান্তরিত হলো.................96 নির্জন এলাকায় হঠাৎ তাবু পরিলক্ষিত হলো ....97 আটা শেষ হলো না..................................97 মরুভূমিতে আঙ্গুর..............................98 হেলিকপ্টারের মোকাবিলায় যুবক নাসরুল্লাহ.......................................98 দস্তরখান এবং হাতের প্রদীপ.................99 আমার নিকট যদি একটি রুটি খরিদ করার পয়সা থাকতো...99 পাথরের সাহায্যে ক্ষুধা নিবারণ........100 গাযীদের কারামতী.............................100 ক্ষুধার্ত মুজাহিদদের জন্য গায়েবী মদদ ....101 পানির পিপাসা অনুভূত হলে খর মৌসুমে বরফপাত হলো.....................................102 বরকতময় আপেল..................................102

আফগান মুজাহিদদের উপর দুশমন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত গুলী ও বোমা কার্যকর না হবার ঘটনাবলী ১৯৮৮ সালে কমান্ডার জালালুদ্দীন হক্কানী আমায় এই ঘটনাটি শুনালেন......103

গুলী বৃষ্টির ভেতর দিয়ে বের হয়ে আসা 103

মুজাহিদদের সাথে ক্ষেপণাস্ত্রের বন্ধুসুলভ আচরণ...............................104

এক মুজাহিদ কর্তৃক গুলি শূন্য রাইফেলের সাহায্যে সশস্ত্র ৮ দুশমন সেনা আটক...104

রকেট লাঞ্চারের আঘাতে মুজাহিদের পাগড়ি ছিদ্র হলো.......................................105

অতুলনীয় বীরত্ব.............................106

গোলা অবিস্ফোরিত থেকে গেলো...............106

ট্রলির গোলার আঘাতে দুশমনের পলায়ন...107

বিষাক্ত গ্যাসের কার্যকারীতা বিনষ্ট হলো 107

কুরআনের সামনে ব্যর্থ গুলী মুজাহিদ গাউছুল্লাহর ভাষ্য..........................107

জীবন্ত অলৌকিকতা.............................108

৩০ গুলী পাজরে আঘাত হেনে বেরিয়ে গেলো 108

গুলীর আঘাতে কাপড় ঝাঝড়া হওয়া সত্বেও অক্ষত মুজাহিদ.................................108

গুলী নিকটে এসে উল্টো পথে ফিরে যাচ্ছিলো 109

সেই মুজাহিদের ঘটনা যার শরীর বোমার আঘাতে দ্বিখন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সে দুই ঘন্টা জীবিত ছিলো.....................................109

মাইনের উপর শুয়ে পড়া সত্ত্বেও তা বিস্ফোরিত হলো না............................110

বারুদ থাকা সত্ত্বেও গোলা বিস্ফোরিত হলো না, বারুদ না থাকা সত্ত্বেও বিস্ফোরিত হলো..110

কুরআন অনুসারীদের বীরত্ব এবং গায়েব থেকে হেফাযত...111

যেন তারা মিথ্যা না মনে করে...............111

তোমরা আমাকে পাথর মারছো কেন..............112

বিস্ফোরণ হলো কিন্তু-.......................112

সর্বশেষ ব্যক্তি বের হওয়ামাত্র ঘর ধ্বসে পড়লো...113

কাপড় পুড়ে গেলেও শরীর অক্ষত রইলো...113

একটি মুরগী ব্যতীত অন্য কারো কোন ক্ষতি হয়নি...114

বোমা বিস্ফোরিত হওয়া সত্বেও আঘাত না লাগা..114 খোদার শোকর গুলি বিদ্ধ হয়নি............114 ক্ষেপণাস্ত্র কোথায় গেলো................114 গুলি হৃদপিন্ড ভেদ করতে পারলো না.......115 আমরা জীবিত বের হলাম........................115 আমি সামান্যতম কষ্ট অনুভব করিনি........115 ক্ষেপণাস্ত্র বিলম্বে বিস্ফোরিত হলো.116 মুজাহিদ নাসরুল্লাহর দেহে গুলি বিদ্ধ না হয়ে পকেটে জমা হলো..........................116 ৭২টি বেয়নেটের নির্মম খোচা সত্ত্বেও প্রাণে রক্ষা..................................117 শরীরে ধাক্কা খেয়ে বুলেট ছিটকে গেলো 117 বোমা পেটে আঘাত হানলো.......................117 বোমার ধাক্কা তাকে গাছে উঠিয়ে দিলো..118 বোমা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলো...............118 ট্যাংকের নীচে চাপা পড়া সত্বেও কিছুই হলো না..119

শাহাদাত বরণের পর আফগান মুজাহিদদের তরতাজা লাশ: আফগান জিহাদে কারামতের প্রকাশ...119 শহীদদের লাশের প্রত্যক্ষ বর্ণনা:.....120 মসজিদের ইমামের বর্ণনা.....................120 মুয়াযযিন......................................120 আব্দুল জব্বার নিয়াযী.....................121 শহীদের দেহের দুর্লভ সুঘ্রাণ............121 শাহাদাত বরণের পর স্বপ্নের মাধ্যমে শহীদ মুজাহিদ নিজের লাশের সন্ধান দিলেন....121 বিবাহের দিন শাহাদাত বরণ..................122 আমি তোমার পার্শ্বেই দাফন হবো...........123 শহীদ হবার পরে মুজাহিদের যবানে আল্লাহর যিকির...123 শহীদের দেহের প্রাণকাড়া সুগন্ধ.......124 প্রিয় ভাই আমার সাথে কথা বলো...........125 রাইফেল দাও আমি তাদের সকলকে খতম করে ফেলবো...126 শহীদের দেহ থেকে নূরানী আলোকরশ্মি....127

শহীদ উমর ইয়াকুব এবং তার রাইফেলের গুলি ....128 শহীদদের কারামত...............................128 শহীদের মুচকি হাসি...........................129 কর্তিত মস্তক উধাও...........................130 স্বপ্নের মাধ্যমে মুজাহিদ নিজের কবর চিহ্নিত করলো..................................131 শহীদের রক্তে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাপ পড়লো..132 মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরত............132 শহীদ কর্তৃক স্বপ্নের মাধ্যমে গুপ্ত ভান্ডারের সন্ধান............................132 শহীদের হাতে জমে যাওয়া রাইফেল.........133 শাহাদাতের পরেও সে হাসছিলো...............134 কবর থেকে আলোর বিচ্ছুরণ....................135 তিন বছরের পুরনো তরতাজা লাশ..............135 যদি তুমি শহীদ হয়ে থাকো তাহলে মুচকি হাসি দিয়ে দেখাও............................136 লাশ থেকে নূর প্রকাশ পেলো.................136

লাশের সুগন্ধ..................................137 সে আমাদের নয় তোমাদের অন্তর্গত........137 এদিকে এসো! কমিউনিস্টরা আমার লাশ নিয়ে যেতে চাইছে.....................................137 ঠান্ডা বরফের মাঝেও শহীদের গরম শরীর..138 ১৮ মাসের পুরানো লাশ থেকে রক্ত ঝরে পরে ....139 পাঁচ মাস পুরানো তরতাজা লাশ..............139 শহীদ হবার পরে পাচ বার মায়ের সাথে সাক্ষাত...140 শহীদের বিস্ময়কর নড়াচড়া..............142 শহীদ কান্না জুড়ে দিলেন..................142 শহীদ মুজাহিদের তাকবীর ধ্বনি............142 শহীদ হবার পরেও রহমাতুল্লাহর শরীর থেকে ঘাম বের হচ্ছিলো..............................143 শহীদ সায়্যেদ শাহ এবং রেশমী শাল.......143 তাকে এই বাগানে খোঁজ করো...................144 ছয় মাস পর......................................144

শহীদের কপালের ঘাম থেকে মেশকের সুঘ্রাণ ....144 নিজের হাত সরিয়ে নাও.......................145 শহীদের দেহের দুই অংশ.......................145 শহীদের উষ্ণ পোষাক...........................145 একমাস পুরানো তাজা লাশ.....................146 তারা ভাত এবং গোশত খাচ্ছিলো..............146 শাহাদাতের সুখ স্বপ্ন......................147 কবর থেকে বিস্ময়কর ও দুর্লভ সুগন্ধ..147 জঙ্গলে লাশের সুঘ্রাণ......................147 পশু পাখীর মাধ্যমে মুজাহিদদের জন্য খোদায়ী মদদ....................................148 বোমারু বিমান এবং কুদরতী বিমান.........149 ঘটনা এক..149 ঘটনা দুই......................................149 ঘটনা তিন......................................149 ঘটনা চার......................................149 ঘটনা পাঁচ.....................................150 ঘটনা ছয়......................................150

ঘটনা সাত......................................150 পাখী কর্তৃক বোমারু বিমান আক্রান্ত...151 বিচ্ছু মুজাহিদদের দংশন করেনি..........151 খোদার মদদ.......................................151 মুজাহিদদের জন্য পাখীর সাহায্য........152 ইদুর এবং পানি লুকানো বিস্ফোরক পরিষ্কার করলো..153 গায়েবী মদদ....................................154 বিষাক্ত বিচ্ছুর স্পর্শে ৬০ রুশ সেনার মৃত্যু...154 কুকুরের ওয়াফাদারী.........................155 জাজীর যুদ্ধে অভাবনীয় ভাবে মুজাহিদদের নিরাপত্তা লাভ.................................155 সাপ, বিচ্ছু আফগান জিহাদের আরেক কারামত ....156 আব্দুস সামাদ সায়্যালের দ্বিতীয় ঘটনা ....157 আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজাহিদদের হেফাযত158 কারমাল পানিও পাবে না.......................159 ইটের স্তুপের নীচে এক ঘন্টা..............159

মুজাহিদদের আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা.160 ঈমানদ্বীপ্ত একটি ঘটনা.....................160 রাশিয়ানদের ভেতর আত্মঘাতী লড়াই.....161 দুশমনের মনে ভীতি............................161 মুজাহিদদের দুঃসাহসিকতা..................161 দুশমনের মাঝে আরসালান রহমানীর ভীতি...162 স্বপ্নের মাধ্যমে বিমান বিধ্বংসী মেশিনগানের ট্রেনিং.........................163 প্রতিপক্ষও বাস্তব স্বীকারে বাধ্য হল164 স্বপ্নে হারিয়ে যাওয়া মুজাহিদের সাক্ষাত...165 বরকত..165 দুশমনের দৃষ্টিসীমা থেকে মুজাহিদদের অদৃশ্য হয়ে যাবার ঘটনাঃ আমি রাশিয়ানদের সামনে ছিলাম কিন্তু তারা আমায় দেখতে পায়নি...165 রাশিয়ানদের চোখের সামনে অদৃশ্য পর্দা নেমে এসেছে.....................................166 কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে দুশমনের দৃষ্টি থেকে গায়েব হয়ে গেলাম.........166

প্রকাশকের কথা

প্রথমেই মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি। আফগানিস্তান বিশ্ব ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ভূখন্ড। পেছনের ইতিহাসে গিয়ে আমি স্রেফ এটুকু

বলতে চাচ্ছি যে, বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে আফগান মুজাহিদগণ প্রবল পরাক্রমশালী সোভিয়েত সৈন্যদেরকে যে চরম পরাজয় দান করেছিলো তা এখনো পর্যন্ত পৃথিবী বাসীর সামনে এক অপার বিস্ময় রূপে দাঁড়িয়ে আছে। মুজাহিদদের সেই অভাবনীয় সাফল্য আমরা প্রায় ভুলতে বসে ছিলাম। এক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ও কিছুটা ভূমিকা আছে। কিন্তু মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের নেতৃত্বে তালেবান সত্যিকার ইসলামী মুজাহিদ দলের উত্থানে স্বার্থান্বেষী তথাকথিত মুজাহিদগণ লেজগুটিয়ে পর্দার অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হয়। তালেবানদের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুমত চালু হয়, আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে ইসলামী চেতনা জাগ্রত হয়। তারপরের দৃশ্যাবলী সম্পর্কে আমরা কমবেশী অবগত রয়েছি। ইয়াহুদী নাসারা ও ব্রাক্ষণ্যবাদীদের যুগপত ষড়যন্ত্রে আফগানিস্তানের ইসলামী হুকুমতকে উত্থাত করা হলো, বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে নিরাপরাধ মুসলমানকে নির্যাতন নিপীড়নের টার্গেট বানানো হলো বিশ্বময়। লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, এই নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে। আফগানিস্তান অপদখল করার পর থেকে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর পর থেকে আফগানিস্তান পুনরায় সারা বিশ্বে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে আফগানিস্তানে নিকট অতীতে সংঘটিত সোভিয়েত রাশিয়ার

বিরুদ্ধে ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে অবগত করার মানসে আমরা পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আরব বিশ্বে জিহাদী ভাবধারা পুণর্জাগরণের প্রবাদ পুরুষ ডক্টর আব্দুল্লাহ আযযাম প্রণীত আরবী কিতাবের উর্দু অনুবাদ মুজাহিদীন কে ছাথ আল্লাহ কি মদদ কে ছাচ্চে ওয়াকেআত আমাদের হাতে আসার পর আমরা এটি অনুবাদের ভার অর্পণ করি তরুণ অনুবাদক মাওঃ হাসান জামীলের উপর। তিনি অল্প সময়ে অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করে বইটি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেন। আমার বিশ্বাস, আফগান জিহাদে মুজাহিদদের চমকপ্রদ সাফল্য ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে খোদায়ী মদদের যে বাস্তব ঘটনাবলী এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা পাঠে এই যুগেও খোদার রাহে আত্মোৎসর্গকারী মুজাহিদদের জন্য খোদার রহমত ও নুসরতের দরজা যে পুরোপুরি উন্মুক্ত তা পাঠকবর্গ উপলব্ধি করবেন। আল্লাহ আমাদের এক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

অনুবাদকের আরজ

“সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, সত্যের
জয় অবশ্যম্ভাবী”। বিংশ শতাব্দীর আশি ও নব্বই দশকে সংঘটিত আফগান যুদ্ধ এখনো পৃথিবী বাসীর সামনে এক জীবন্ত রহস্য রূপে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর তাবৎ অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক, গবেষক, সমরবিদ ও অস্ত্রবিদ বিজ্ঞানীগণ এখনো স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবছেন, আফগান রণাঙ্গনে প্রবল পরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্ধর্ষ বাহিনী কিভাবে পরাজিত হলো

কিভাবেই বা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী যুদ্ধাস্ত্র বুমেরাং হয়ে গেলো? কোন সেই শক্তি যার বলে বলীয়ান হয়ে নিরস্ত্র, শতধা বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত প্রশিক্ষণবিহীন পাহাড়ী আফগানরা কমিউনিজমের ধ্বজাধারী গর্বাচেভ এবং তার সেবাদাস আফগানিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে নিকৃষ্টতম পরাজয় দান করলো? হাজারো অনুসন্ধান শেষে বেদ্বীন সাংবাদিক ও গবেষকগণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, নিরস্ত্র আফগান মুজাহিদদের অভাবনীয় সাফল্যের প্রধান অস্ত্র হলো আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস এবং তার সাহায্যের প্রতি অবিচল আস্থা । বিশ্বের বিভিন্নস্থানে মযলুম মুসলিম উম্মাহ আজ যালিমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তাদের প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রেরণার প্রধানতম উৎস রুশ শ্বেত ভল্লুক ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের যুগান্তকারী সাফল্য। সমাজতন্ত্রের কাস্তে হাতুড়ীর লাল সূর্যের অস্তমিত হওয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ছয়টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র সহ পনেরটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সবকিছুর মূলে রয়েছে আফগানিস্তানের সিংহ সন্তানদের হাতে সোভিয়েত কমান্ডোদের শোচনীয়তম পরাজয়। ঈমান দ্বীপ্ত আফগান রণাঙ্গণের অবিশ্বাস্য ও চমকপ্রদ ঘটনাবলী প্রসঙ্গে এদেশে তেমন লেখালেখি হয়নি বললেই চলে। ফলে বর্তমান প্রজন্ম আফগান জিহাদের বাস্তব ঘটনাবলী সম্পর্কে একরকম অন্ধকারে বাস করছে। অথচ ঈমানদীপ্ত গৌরবোজ্জল অতীত ঘটনাবলী যতো বেশী শুনবো

এবং পড়বো আমাদের ঈমান ও সচেতনতা ততো বৃদ্ধি পাবে বলে মনীষীদের বিশ্বাস। উর্দু ভাষায় লিখিত মুজাহিদীন কে ছাথ আল্লাহ কি মদদ কে ছাচ্চে ওয়াকেআত শীর্ষক বইটি হাতে পাবার পর এর অনুবাদ বাংলা ভাষী পাঠক বিশেষতঃ তরুণ প্রজন্মের হাতে তুলে দেবার বিশেষ তাগিদ অনুভব করতে থাকি। এক্ষেত্রে আমার তিন বছর বয়সী অবুঝ সন্তান সাফওয়ানের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। চেচনিয়া যুদ্ধে মুজাহিদগণ রুশ দখলদার সৈন্যদের পরাজিত করার পর চতুর্দিক থেকে যখন গগণ বিদারী “আল্লাহু আকবার” ধ্বনি উঠতে থাকে, ধারনকৃত সে দৃশ্য দেখার পর থেকে সাফওয়ান প্রায়শঃ মুজাহিদদের ন্যায় সর্বশক্তি দিয়ে “আল্লাহু আকবার” উচ্চারণ করে এবং কাঁধে ছোট্ট কাঠের টুকরা নিয়ে রকেট লাঞ্চারের ন্যায় নিক্ষেপ করে উল্লাস করতে থাকে। সে মুহুর্তে তার নিস্পাপ চোখে মুখে এক বিস্ময়কর ও ব্যাখ্যাতীত আলোকচ্ছটা ভর করে। সাফওয়ানের দিকে তাকিয়ে আমার অনুবাদের ইচ্ছা আরো দৃঢ় হয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য ছাত্র রাজনীতির ব্যস্ত এক কর্মী স্নেহাস্পদ ওয়ালী উল্লাহ আরমানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় । প্রয়াজোনীয় অনেক তথ্য দিয়ে সে আমাকে সাহায্য করেছে। সেই সাথে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি নাদিয়াতুল কোরআন প্রকাশনীর অন্যতম কর্ণধার মুহতারাম মাওঃ মাছউদুল হক এর। নবীন অনুবাদক হওয়া সত্বেও তিনি এই বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় । অনুবাদক হিসেবে আমার ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার দরুণ বইটির বিভিন্ন

স্থানে ভাষার সুন্দর উপস্থাপনা না হওয়া এবং ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়, আশা করি পাঠক মহোদয়গণ আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং মুসলমানদের মাঝে পূর্বযুগের ঈমানী চেতনা ও নির্ভীকতা দান করুন। আমীন!

লেখকের কথা

মহান রাব্বুল আলামীনের ফযল ও করমে মুসলিম উম্মাহর মাঝে জিহাদের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসংখ্য মানুষ ইতোমধ্যে কাশ্মীর, আফগানিস্তান,

ফিলিস্তিন, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, বসনিয়া, চেচনিয়া, ইরাক প্রভৃতি স্থানে শাহাদাতের অমিয় সুধা পানে ধন্য হয়েছে, তাদের পদাংক অনুসরণে লাখো ব্যক্তি দাওয়াত ও জিহাদের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। জিহাদ হচ্ছে ইসলামের শীর্ষ চূড়া, যাতে অংশ নেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, সাধারণ অর্থে ফরয।

আল্লাহর বিধান ও মূলনীতি সমূহ চিরস্থায়ী হিসেবে এসেছে, যা যুগের প্রেক্ষাপটে বদলে যায় না পরিবর্তন যোগ্য নয়। যদি পূর্বের যুগে ফেরেশতাদের দ্বারা মুজাহিদীনদের সাহায্য হতে পারে, তাহলে আজও যদি কোথাও মুজাহিদগণ আল্লাহর নির্ধারিত শর্তসমূহ পূর্ণ করেন তবে অবশ্যই তাদের সাহায্যে আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের পাঠাবেন। আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফালে ইরশাদ করেন, “যদি তোমাদের মধ্য হতে বিশ ব্যক্তিও অবিচল থাকে তবে তারা দুইশত কাফেরের উপর বিজয়ী হবে।” যখন আফগান মুজাহিদগণ জঙ্গী বিমান, ট্যাংক ও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত রাশিয়ান সৈন্যদের সামনে পাহাড় সম দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করলেন তখন রাব্বুল আলামীনও তাদেরকে রুশ কাফেরদের উপর বিজয় দান করলেন। এমনকি রাশিয়ানদের সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিষ্ঠুর ও নির্মম স্পেশাল ফোর্স ‘স্পটনাজ’ যাদের নাম শুনে ইউরোপের লোকদের মনে কম্পন শুরু হয়ে যেতো তারাও আফগানের পবিত্র ভূমিতে চূড়ান্ত রকমের পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এ সব কিছু এজন্যই সম্ভব হয়েছে

যেহেতু আফগানের যোদ্ধারা সর্বাবস্থায় ইস্পাত কঠিন অটল ছিলেন আর আল্লাহতায়ালা অদৃশ্য থেকে তাদেরকে মদদ দান করেছেন। সূরা তাওবায় হুনাইনের যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে আল্লাহ বলেন, “মুসলমানগণ! আল্লাহ অনেক স্থানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমাদেরকে মদদ করেছেন----- আর তোমাদের সাহায্যার্থে এমন লশকর প্রেরণ করেছেন যারা তোমাদের চোখে পড়েনি।” আফগান জিহাদে সফলতা এবং রুশদের পরাজয় এক আশ্চর্যজনক ও অবিশ্বাস্য বাস্তব ঘটনা। আলেমে হক্কানী মুহতারাম যিয়াউল হক প্রায়ই বলতেন আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ানদের পলায়ন বিংশ শতাব্দীর সব চেয়ে বড় বিস্ময়কর ব্যাপার হবে।

এই বিস্ময়কর ঘটনা বাস্তবায়িত হবার ব্যাপারেও তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। সেজন্যই তিনি একথা ও বলতেন যে, বিস্ময়কর সেই ঘটনা অতি দ্রুতই ঘটবে ইনশাআল্লাহ। রাশিয়ানদের মোকাবেলায় আফগান মুজাহিদগণ অবিশ্বাস্য বাহাদুরী ও অবিচলতার নমুনা পেশ করেছেন, সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তাদের ঠিক তেমন মদদ করেছেন যেমন বদর ও হুনাইনের মুজাহিদদের করেছিলেন। মহান রব কুরআনে কারীমে মুজাহিদীনদের হেফাযতের ব্যাপারে ইরশাদ করেন; “আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসতে পারেনা, প্রত্যেকের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।”

অন্যত্র ইরশাদ করেন, “আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষাকারী, আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াশীল।” মুজাহিদীনদের

[illegible]

[illegible] –

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

[illegible]

[illegible] –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

[illegible]

বর্তমানে প্রায় (২৫) পঁচিশটি দেশে মুসলমানদের উপর নির্মম নির্যাতন চলছে, সে সব রাষ্ট্রে কুফরের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণও প্রতিরোধের দেয়াল তুলে দিয়েছেন এবং সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও যালিমদেরকে নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছেন।

মুজাহিদ রহমাতুল্লাহর ভাষ্যমতে, আমরা এক যুদ্ধে জনৈক রুশ সেনাকে গ্রেফতার করি, সে আমাদের বলল; “আমরা তোমাদের মেশিনগান এবং অন্য যুদ্ধাস্ত্রকে মোটেই ভয় পাই না, কিন্তু তোমাদের আল্লাহু আকবার শ্লোগানে আমাদের অন্তরে কম্পনের সৃষ্টি হয়। এ কোন ধরণের জঙ্গী হাতিয়ার যা তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছো?

রাশিয়ান সৈন্যদের মতে মুজাহিদীনরা মানুষ নয় বরং জ্বিন । এমনিভাবে কাশ্মির রণাঙ্গনে হিন্দুস্তানী সৈন্যদের মনেও মুজাহিদদের ভীতি ও প্রভাব চিরস্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছে যে, ভারত অধিকৃত কাশ্মিরে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ভারতী ফৌজ ও বিশেষ কমান্ডো বাহিনীর মনে অজানা রোগ জন্মেছে। সামান্য কথা কাটাকাটির জের ধরে সৈন্যরা সহযোদ্ধা অথবা অফিসারদের উপর গুলী বর্ষণ শুরু করে দেয়। বিশেষত মুজাহিদদের আত্মঘাতী হামলার কারণে তাদের মনোবল একদম শূন্যের কোটায় নেমে গিয়েছে। আরেক রিপোর্ট অনুযায়ী আত্মঘাতী মুজাহিদদের ভয়ে ক্যাম্পের পাহারারত সেনাগণ নিজেদের অফিসারকে গুলী চালিয়ে খতম করে দিয়েছে। অন্য আরেক রিপোর্ট লিখেছে; ভারতীয় সৈন্য

সাজোয়া যানে চড়ে টহল দিচ্ছিলো। আচানক ড্রাইভারের নজর মুজাহিদদের উপর পড়তেই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়, ফলে ঘটনাস্থলে (১৯) উনিশ সেনা নিহত হয়, গুরুতররূপে যখম হয় আটজন। অন্য রিপোর্টে লিখেছে; ইতোমধ্যে অনেক সৈন্য ব্যারাক ছেড়ে পালিয়েছে, কাশ্মিরের মুজাহিদদের ভয়ে সৈন্যদের মধ্যে বারবার বিশৃংখলা প্রকাশ পাচ্ছে, ভীতসন্ত্রস্ত অনেক সৈন্য এরই মধ্যে আত্মহত্যা করেছে।

আফগান জিহাদের ঈমানদীপ্ত ঘটনা গুলো সংগ্রহ করার জন্য আমাকে সরেজমিনে কোন কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে হয়েছে এবং অনেক মুজাহিদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক করতে হয়েছে। পাঠকদের নিকট অধমের বিনীত নিবেদন এই যে, বইয়ের ঈমান দীপ্ত বাস্তব ঘটনাগুলো সংকলন করার সময় যে সকল মুজাহিদ ভাইগণ আন্তরিকতার সাথে তথ্য দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন এবং যাদের ঘটনাগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে দোয়ার মাঝে স্মরণ করবেন।

সর্বশেষে আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি যে, আমার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, এর বদৌলতে আমাকে আমার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, কল্যাণকামী এবং মুজাহিদীনদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করুন।

এর মাঝে এমন বৈশিষ্ট্য দান করুন যেন মুসলিম উম্মাহ বিশেষত নওজোয়ান শ্রেণীর মনে জিহাদের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তারা যেন কাফেরদেরকে নাস্তানাবুদ, অপদস্থ

ও মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। আল্লাহুমা আমীন!

ওয়াসসালাম
মুহাঃ আনওয়ার বিন আখতার

জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ ও আল্লাহর মদদের প্রেক্ষাপট

জিহাদের বাস্তবতা ও প্রয়াজোনীয়তা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা যার আছে সে ব্যক্তি এসম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন যে, জিহাদ এবং সাধারণ যুদ্ধের মাঝে মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধারণ যুদ্ধে জয়-পরাজয় মূলতঃ যোদ্ধাদের সংখ্যা, যুদ্ধ কৌশলে বিশেষ পারদর্শীতা, অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের প্লানের উপর নির্ভরশীল। নিঃসন্দেহে জিহাদেও উক্ত বিষয়গুলো অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু এখানে সফলতা পুরোপুরি আল্লাহর দয়া ও মদদের উপর নির্ভরশীল। কুরআন মাজীদে ঐ বাস্তবতার ঘোষণা এভাবে এসেছে; “আল্লাহর করুণায় বারংবার ক্ষুদ্র দল নিজেদের তুলনায় বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে সফলতা ও বিজয় লাভ করেছে।”

জিহাদের ইতিহাসে নযর দিলে আমরা এ প্রসঙ্গে অসংখ্য চির ভাস্বর ও অম্লান দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। বদরের যুদ্ধে তিনশত তের জনের মুষ্টিমেয় ইসলামী লশকর স্রেফ আল্লাহ তায়ালার গায়েবী মদদে নিজেদের তুলনায় তিন গুণ বেশী সশস্ত্র কাফেরদের উপর সুষ্পষ্ট বিজয় অর্জন করে। কুরআনে কারীমে বদরের যুদ্ধকে “ইয়াউমুল ফুরক্বান” তথা হক্ব বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ঈমানী চেতনা ও আল্লাহ

রাব্বুল আলামীনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে নিরস্ত্র ও সম্বলহীন হওয়া সত্বেও ইসলামের মুজাহিদগণ তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম ও ইরানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী সাফল্য লাভ করেন।

রোম-ইরানের মোকাবেলায় ইসলামী বাহিনী সংখ্যানুপাত, যুদ্ধাস্ত্র ও সমর কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে আসমান যমীনের দূরত্বে পিছিয়ে ছিলো। কিন্তু যুদ্ধে হকের ঝান্ডা বুলন্দ হল আর পরাক্রমশালী দুই শক্তির নাম নিশানা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেলো। নিঃসন্দেহে এই সফলতার একমাত্র কারণ হলো আল্লাহর বিশেষ গায়েবী মদদ মুসলমানরা লাভ করেছিলো। সাম্প্রতিককালের আফগান জিহাদ এই বাস্তবতার জ্বলজ্বলে প্রমাণ, যেখানে আফগান মুজাহিদগণ নিজেদের তুলনায় শত সহস্র গুণ শক্তিশালী প্রতিপক্ষের অহংকারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। বিগত বারো বছর যাবত আমরা কাশ্মিরের জিহাদেও আল্লাহর সাহায্যের অসংখ্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। কাশ্মিরের মুজাহিদগণ সীমাহীন বীরত্ব, দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করে হিন্দুস্তানী ফৌজকে বারবার কঠিন ক্ষতির সম্মুখীন করছেন। এটা নুসরতে ইলাহীর-ই বাস্তব নমুনা ।

আফগান রণাঙ্গনে জিহাদের ময়দানে আল্লাহর মদদ হাসিল করা যেমনি জিহাদে কামিয়াবীর প্রধান উসীলা, তেমনি জিহাদের গ্রহণযোগ্যতার ও আলামত। আল্লামা ইকবাল সেই বাস্তবতাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন; “বদরের পরিস্থিতি তৈরী করো, ফেরেশতা তোমার মদদে চতুর্দিক থেকে কাতার বন্দী

হয়ে নেমে আসতে পারে এখনো।” বদরের পরিস্থিতি কি? তা কিভাবে তৈরী হতে পারে? জিহাদের মাঝে আল্লাহর মদদ হাসিলের প্রেক্ষাপট কি এবং জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর কামিয়াবীর শর্ত সমূহ কি? জিহাদের প্রতি আকৃষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকে অত্যাবশ্যকীয় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা প্রয়াজোন। এখানে সে প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত এবং সেই প্রেক্ষাপট ও শর্ত সমূহ উল্লেখ করছি, জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর কামিয়াবী যার উপর নির্ভরশীল।

- জিহাদের উদ্দেশ্য-আল্লাহর কালিমার মর্যাদা বৃদ্ধি-

জিহাদে কামিয়াবীর প্রধানতম শর্ত হল জিহাদ সত্যিকারার্থে আল্লাহর রাস্তায় হতে হবে এবং সেই প্রেক্ষাপট ও শর্তের ভিত্তিতে হতে হবে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে প্রথম শর্ত এই যে, জিহাদের মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য সামনে থাকবে। পবিত্র কুরআনে জিহাদের এই মৌলিক শর্তের কথা ইরশাদ হয়েছে এভাবে; “ঈমানদারগণ আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে আর কাফিরগণ তাগুতের রাস্তায় লড়াই করে, সুতরাং শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে।”

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন; “হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট জানতে চাওয়া হল যে, কোন এক ব্যক্তি বাহাদুরী দেখানোর উদ্দেশ্যে লড়াই করে অথবা আত্ম সম্ভ্রম বজায় রাখতে লড়াই করে কিংবা লোক দেখানোর জন্য লড়াই করে এর মধ্যে কোন লড়াই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হিসেবে বিবেচিত হবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, একমাত্র সেই ব্যক্তির লড়াই যে আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লড়াই করে।”

পূর্ণ প্রস্তুতি ও শক্তি সংগ্রহ

জিহাদে কামিয়াবীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এই যে, যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি ও শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে নির্দেশনা দিয়ে ইরশাদ হয়েছে; “আর তোমরা সাধ্যানুযায়ী দুশমনের মোকাবেলায় অধিক শক্তি, যোগ্যতা অর্জন করো এবং গুরুত্ব সহকারে যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করো, যেন সেগুলোর সাহায্যে আল্লাহর দুশমনদের কে ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারো”।

আলোচ্য আয়াতে জিহাদ শুরুর পূর্বে পূর্ণ প্রস্তুতি এবং যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহের কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে, যেন এর মাধ্যমে

দুশমনদের মনে ইসলামী লশকরের ব্যাপারে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে হামলা করার সাহস হারিয়ে ফেলে। এখানে পূর্ণ প্রস্তুতির মাঝে সামরিক প্রস্তুতির পাশাপাশি চারিত্রিক ও মানসিক প্রস্তুতি ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী হতে বুঝা যায় যে, তিনি বাহ্যিক প্রস্তুতির তুলনায় চারিত্রিক ও মানসিক প্রস্তুতিতে অনেক বেশী গুরুত্ব দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পূর্বে বছরের পর বছর সাহাবায়ে কেরামকে এমন অতুলনীয় চারিত্রিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে তারা একেকজন সংকল্প, ধৈর্য, সাহসিকতা ও বীরত্বের ময়দানে অমোচনীয় ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হন।

আল্লাহর দিকে মনোযোগের গুরুত্ব
পূর্ণ প্রস্তুতির পর জিহাদে
সফলতার তৃতীয় শর্ত এই যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফের বাহিনীর মুখোমুখি হবার মুহূর্তে নিজেদের সৈন্য ও অস্ত্রবলের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল না হয়ে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হতে হবে। তাঁর দরবারে সবিনয়ে সাহায্যের দোয়া করতে হবে। এই বিষয়ে বদর যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে, যুদ্ধের পূর্বের রাতে তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে সাহায্য সহযোগিতার জন্য অনবরত দোয়া করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী হতে এই পথ নির্দেশও পাওয়া যায় যে, যুদ্ধের পূর্বে সকল মুজাহিদকেই আল্লাহর দরবারে সকরুণভাবে সাহায্যের আবেদন জানাতে হবে। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মাঝে যুদ্ধের পূর্বে দোয়ার প্রচলন করেন, ক্রমান্বয়ে খোলাফায়ে রাশেদার যুগে যা মুসলমানদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। একবার রোমান সৈন্যগণ মুসলমানদের হাতে কঠিন ভাবে পরাজিত হবার পর তাদের সিপাহসালার সম্রাটের দরবারে হাজির হলে সম্রাট তার নিকট পরাজয়ের কারণ জানতে চান, উত্তরে সিপাহসালার বলেন; “তারা দিনের আলোয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করে আর রাতের অন্ধকারে আল্লাহর দরবারে অশ্রুর বান বইয়ে দেয়।"

দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য

জিহাদে কামিয়াবীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শর্ত হল জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তা ও ধৈৰ্য্য প্রদর্শন করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন; “হে মুমীন গণ! দুশমনের মোকাবেলার সময় তোমরা অবিচল থাকো এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো, যেন তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো।”

হক-বাতিলের প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মুহূর্তেও আল্লাহকে পূর্ণ বিশ্বাস ও ভালোবাসা সহ স্মরণ করতে হবে। কারণ অন্তর ও মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে নিজেকে অসহায়

মনে হবে না, এর ফলে নিজের মাঝে অভাবনীয় বীরত্ব ভর করবে ।

নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গের মাঝে পরামর্শ এবং সাধারণ মুজাহিদগণ কর্তৃক সেগুলো শ্রবণ ও অনুসরণ করা যুদ্ধে সফলতার অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেজন্যই আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনিও আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছেন। মহান রাব্বুল আলামীন নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন এই বলে; “আল্লাহ, তার রাসূলের এবং নিজ নেতার আনুগত্য করো।” নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; “যে ব্যক্তি তার নেতার আনুগত্য করলো সে যেন আমার আনুগত্য করলো, আর যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করলো। আবার যে ব্যক্তি নেতার অবাধ্যতা করলো সে আমার অবাধ্যতা করলো, আর যে আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহর অবাধ্যতা করলো।”

বাস্তবতা হল, নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক আলোচনা এবং সাধারণ মুজাহিদ কর্তৃক সেগুলো অনুসরণের ফলে পুরো মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে অকল্পনীয় শক্তি ভর করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন; “আল্লাহ এমন লোকদের ভালোবাসেন যারা তার রাস্তায় শীশা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে।”

অভ্যন্তরীন কোন্দল হতে বিরত থাকা

জিহাদের সময় আল্লাহ তায়ালা যে সকল বিষয় হতে কঠোরভাবে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যাকে দুশমনের মোকাবেলায় পরাজয়ের মৌলিক কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন তন্মধ্যে প্রধানতম হল পারস্পরিক অনৈক্য। অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে কাফিরদের মন থেকে মুসলমানদের ব্যাপারে ভয় ভীতি দূর হয়ে যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন; “আর নিজেদের মাঝে অনৈক্যের সৃষ্টি করোনা, অন্যথায় তোমাদেরকে ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে হবে।”

অহংকার না করা

মহান রাব্বুল আলামীনের সুদৃষ্টি ও সাহায্য লাভের জন্য আরেকটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার তা হল, নিজেদের সৈন্য সংখ্যা যুদ্ধোপকরণ কিংবা যুদ্ধ কৌশলে পারদর্শীতার ব্যাপারে ন্যুনতম অহংকার করা যাবেনা, বরং সফলতার জন্য এগুলোর স্থলে আল্লাহর সাহায্যকে প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হুনাইনের যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে, যেখানে কাফিরদের তুলনায় মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী ছিলো। যা দেখে কোন কোন মুসলমান ভাবছিলো, সংখ্যাধিক্যের জোরে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করবে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতেই মুসলমানদের সামনে পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। যদি তৎক্ষণাৎ রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসাধারণ ধৈৰ্য্য ও অবিচলতার

পরিচয় না দিতেন এবং আল্লাহর সাহায্য সহায়তা না আসতো তাহলে মুসলমানদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিলো। কুরআনে কারীমে সে প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অসংখ্যবার তোমাদের সাহায্য করেছেন, যার একটি নমুনা হুনাইনের যুদ্ধ। যেখানে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে তোমাদের মনে আত্মতুষ্টি দেখা দিয়েছিলো, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং যমীন নিজের প্রশস্ততা সত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো, আর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন শুরু করে দিলে।

অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের মনে নিজের পক্ষ থেকে দান করলেন,তাদের অবিচল করে দিলেন এবং তাদের মদদে সৈন্য প্রেরণ করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না, আর কাফিরদের শাস্তি প্রদান করলেন, নিঃসন্দেহে কাফিরদের জন্য এমন প্রতিদানই রয়েছে”।

জিহাদে আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হল, মুসলিম বাহিনী কাফিরদের সাজসজ্জার স্থলে এমন সাজসজ্জা বেছে নিবে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পছন্দনীয়। সূরা আনফালে ইরশাদ হয়েছে, “আর সে লোকদের সাজ সজ্জা গ্রহণ করোনা, যারা নিজের ঘর থেকে নিজের বেশ ভূষা প্রদর্শনের জন্য বের হয়ে আসে।”

আত্মসমর্পণ থেকে বিরত থাকা

জিহাদের সময় দুশমনের হাতে আত্মসমর্পণ না করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চাই তা একাকী কিংবা সম্মিলিত যে ভাবেই হোক । দুশমনের হাতে আত্মসমর্পণ করা এমন এক কাজ যা মারাত্মক অপরাধ থেকে কোন অংশে কম নয়, আর তার পরিণাম জাহান্নাম। ইরশাদ হয়েছে, “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হও তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করোনা। যারা এমন মুহূর্তে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, (অবশ্য যুদ্ধের কৌশল কিংবা দ্বিতীয় কোন বাহিনীর সাথে মিলিত হবার জন্য এমন করলে ভিন্ন কথা) তারা আল্লাহর গযবে নিপতিত হবে এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঠিকানা।”

শৃংখলা বজায় রাখা

জিহাদের সফলতার জন্য নিয়ম শৃংখলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। মুজাহিদদের মধ্য হতে যাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তার কর্তব্য হল জান-প্রাণ দিয়ে তা পালন করা। উহুদ যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের এক জামাতকে একটি পাহাড়ি ঘাটি প্রহরার দায়িত্ব দেন এবং গুরুত্ব সহকারে একথা বলেন। যে, যে কোন পরিস্থিতিতে তোমরা এই ঘাটি ছেড়ে নড়বে না। কিন্তু সাহাবাদের এই ক্ষুদ্র জামাত কাফিরদেরকে মুমিনদের হাতে পরাজিত হতে দেখে নিজ ঘাটি ছেড়ে কাফিরদের

পশ্চাদ্বানে লিপ্ত হন। নিজ কমান্ডারের নির্দেশ অমান্য করার ফল স্বরূপ মুসলমানগণ এক মহা বিজয়’ হতে বঞ্চিত।

নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য জিহাদের
এমন এক প্রয়াজোনীয় বিষয় যা পুরো করার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য অর্জিত হয়, যে সাহায্যের ব্যাপারে মুমিনদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

আফগানিস্তানের মুজাহিদদের দুঃসাহসিকতা ও বীরত্বের বিস্ময়কর ঘটনা:

মুজাহিদীনদের মনে জিহাদের প্রতি আগ্রহ

আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান যুগে আফগান জিহাদে আমরা যে ধরণের বিস্ময়কর ও অভাবনীয় ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছি তাতে হয়রান হয়ে ভাবছি, আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুগের যুদ্ধে না জানি এরচেয়ে আরো কতো অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রকাশ পেতো।

আফগান জিহাদে ক্যাম্প থেকে আমাদের
কোন সাথী ভাই কোন অভিযানে রওয়ানা দেবার প্রাক্কালে ক্যাম্পে এক আশ্চর্যজনক দৃশ্যের অবতারণা হতো, মুজাহিদদের কেউ সিজদায় পড়ে থাকতেন আর কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত হতেন অনেকে। আমীর সাহেব নাম ধরে বলছেন, অমুক অমুক ব্যক্তি তৈরী হয়ে যাও। যাদের নাম ঘোষণা করা হলো তাদের ঠোটে মুচকি হাসি খেলছিলো আর যাদের নাম বাদ পড়লো তাদের চেহারায় বিষন্নতা ভর করলো। যে সকল

সৌভাগ্যবানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তারা দ্রুত কালাশনিকভ কাঁধে ঝুলিয়ে কোমরে বেল্ট বেঁধে প্রফুল্ল মুখে প্রস্তুতি সেরে নিলো, অবশিষ্ট সাথীগণ তাদের সামানপত্র গুছিয়ে দিতে লাগলো, তাদের ম্যাগাজিনে গুলী ভরে তাদের কানে কানে বলছিলো, “আল্লাহর রাস্তায় যদি তোমরা শহীদ হয়ে যাও তাহলে কেয়ামতের দিন আমাদেরকে ভুলে যেওনা, তুমি আমার জন্য মাওলার দরবারে সুপারিশ কর।” অতঃপর সবাই মিলে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া শুরু করলো; “হে আল্লাহ! তুমি সাহায্য করো, তুমি বিজয় দান করো।” চতুর্দিক থেকে কান্নার রোল উঠলো। এরপর আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে আল্লাহু আকবারের বুলন্দ শ্লোগান দিয়ে মুজাহিদগণ বের হয়ে গেলেন, পেছনের সাথীদের ঈর্ষা মিশ্রিত চোখ গুলো তাদের দেখতে লাগলো, ধীরে ধীরে খোদার পথের যাত্রীগণ তাঁর নাম নিতে নিতে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দুশমনদের যুদ্ধ বিমান গুলো অনবরত বোমা বর্ষণ করছে, মুজাহিদগণ সেদিকে তাকিয়ে দেখার প্রয়াজোনীয়তা অনুভব করছেন না। কারণ তাদের যবানে হরদম উচ্চারিত হচ্ছে “হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকীল” (আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মোহাফেয)

সকল ভয়-ভীতি, বাধা-বিঘ্নকে দুপায়ে দলে, অন্তরে প্রজ্জলিত ঈমানের দীপ্তি, মুখে আল্লাহর যিকির এবং তার রাহে জান কোরবান করার দৃঢ় নিয়ত নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেন, একে অন্যকে পেছনে ফেলার

চেষ্টা করছেন, দুশমনের গুলী বৃষ্টির থোড়াই পরোয়া করে তারা অগ্রসর হয়ে একের পর এক মোর্চা জয় করে নেন। সেখানে এমন মনোরম দৃশ্যের অবতারনা হয় যা শুধু মুজাহিদই উপভোগ করতে পারে। (মাওলানা মাসউদ আযহার)।

ভয়ানক ও আশ্চর্যজনক ঘটনা

মুজাহিদ আহমাদ উল্লাহ বলেন, দুশমনের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে আমাদের এক সাথী তোপ থেকে ৬০/৭০টি গুলী নিক্ষেপ করে, কিন্তু সেগুলো ঝামাখোলা পোস্টে আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর সামনে গিয়ে পড়ে। আমি দূরবীন দিয়ে সেদিকে তাকাই, নিজের অলক্ষ্যে আমার মুখ দিয়ে “আলহামদুলিল্লাহ” উচ্চারিত হয়, কারণ সব গুলো গুলীই নিষ্ক্রিয় হয়ে সেখানে পড়ে ছিলো। যদি সেগুলো বিস্ফোরিত হতো তাহলে কতাজোন শহীদ হতো আর কতাজোন যখমী হতো তা একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। এভাবে আমি, ক্বারী আবিদ হোসাইন, আবু বকর ও সেই সাথী যতোক্ষণ দূরবীনে মুজাহিদদের উভয় গ্রুপকে দেখেছি তাদের নিরাপত্তার জন্য দুশমনের উপর অনবরত গুলী বর্ষণ করেছি, সন্ধ্যার আঁধার ছেয়ে গেলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে গুলী বন্ধ করতে হয়। ওদিকে দুশমনের গুলীর তীব্রতা ক্রমে বাড়তে থাকে, তারা অন্ধকারে এলো পাথারি গুলী চালাতে থাকে। প্রচন্ড গুলীর মুখে সবার সামনে কমান্ডার যুবায়ের তার পেছনে নায়েবে কমান্ডার মাওলানা আব্দুর রহমান

ফারুকী (বাংলাদেশী) এভাবে অন্যান্যরা সামনে চলতে থাকেন।

আচানক দুশমনের কামানের একটি গোলা আমাদের খুব নিকটে এসে বিস্ফোরিত হয়, বিস্ফোরণের ফলে ছোট্ট একটুকরো পাথর মাওলানা আব্দুর রহমানের পায়ের নীচের অংশ কেটে বেরিয়ে যায়। যখম গুরুতর হলেও মাওলানা ফারুকীর হাড় অক্ষত থাকে। রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে কমান্ডার যুবায়ের নিজের রুমাল শক্ত করে ক্ষতস্থানে বেঁধে দেন এবং উভয়ে দ্রুত সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। কমান্ডার যুবায়ের ভাবছিলেন, বিপরীত দিক থেকে গ্রুপ কমান্ডার নাসরুল্লাহ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজের ত্রিশজন জানবায সহযোদ্ধা নিয়ে হয়তো ইতোমধ্যে হামলা করে ফেলেছেন। সেজন্য তিনি অনতিবিলম্বে সেখানে পৌছতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ওয়ারলেস না থাকার কারণে তারা এখবরের বিন্দু বিসর্গ ও জানতে পারলেন না যে, কমান্ডার নাসরুল্লাহর গ্রুপও এক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

বিস্ময়কর ও অভাবনীয় দৃশ্য

কমান্ডার যুবায়েরের নেতৃত্বাধীন বাহিনী শত্রু অবস্থানের কাছে পৌছেই জোরদার হামলা শুরু করলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত মুখোমুখি সংঘর্ষ অব্যাহত রইলো। রাতের আঁধার নেমে আসার সাথে সাথে দুশমন কিছু লাশ পেছনে ফেলে পলায়নের রাস্তা ধরলো। পরের দিন দুপুরের দিকে শাহাদত বরণকারী একমাত্র মুজাহিদের লাশ পাকিস্তান পৌছানোর বাহন

হিসেবে একটি খচ্চর নিয়ে আসা হলো। খচ্চরের পিঠে ওঠানোর পূর্বে সাথীগণ শেষবারের মতো তাকে দেখার জন্য তার মুখের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দিলো। কমান্ডার খালিদ যুবায়ের বলেন, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখে মনে করলাম হয়তো কোন সাথী সুগন্ধী আতর ছিটিয়ে দিয়েছে। আমি আঙ্গুল লাগিয়ে দেখলাম সত্যিই সেগুলো দেহের ঘাম, উপস্থিত সকলেই তা প্রত্যক্ষ করে ।

আফগান যুদ্ধে শহীদদের মাধ্যমে এধরণের অসংখ্য অবিশ্বাস্য ঘটনা তাদের সঙ্গীগণ নিজের চোখে দেখেছেন। যে কোন মুজাহিদের নিকট জিজ্ঞেস করলে সে এ ধরণের অগণিত ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করে যেন তা তাদের দৈনন্দিন আর দশটা কাজের ন্যায় একটি সাধারণ বিষয়। কতো শহীদের দেহের খুন খুশবুদার আতর হয়ে চতুর্দিক সুগন্ধে ভরে দিয়েছে, কারো কবর থেকে মাসের পর মাস দুর্লভ সুগন্ধ ছড়িয়েছে। যেখানে একদিনেই রাশিয়ান ও আফগান সৈন্যদের লাশ দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে, একইস্থানে দিনের পর দিন মুজাহিদদের লাশ অবিকৃত অবস্থায় থেকেছে।

কমান্ডার যুবায়েরও এরকম অনেক ঘটনা আমাকে শুনিয়েছেন। তথ্য সংগ্রহ অভিযানে এসে আমি গেরিলা যুদ্ধ, মুখোমুখি সংঘাত প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করছিলাম, বৈরী আবহাওয়ার দরুন কামরার বাহিরে পা রাখার সুযোগ মিলছিলো না। প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টির শো শো শব্দ ভেতর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। আচানক আপাদ মস্তক কাদা পানিতে একাকার হয়ে কতিপয় ব্যক্তি কামরায়

প্রবেশ করলেন। আগন্তুকগণ সীমান্ত সংলগ্ন মাদ্রাসায়ে ইসলামিয়া আরাবিয়ার নওজোয়ান মুহতামিম মাওলানা আব্দুর রহমান আব্বাসী এবং তার সাথী সহচর, তারা এইমাত্র রণাঙ্গন থেকে ফিরলেন । সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় জানতে পারলাম তারা এই প্রথমবার জিহাদে অংশ নিচ্ছেন এবং প্রায় দশদিন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকার পর আজ ঘাঁটিতে ফিরে এসেছেন, রাতটুকু এখানে কাটিয়ে ভোরেই দেশের পথ ধরবেন। মাওলানা আব্বাসীর চারজন ভাতিজা দীর্ঘদিন যাবত যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করছেন। তিনি জানালেন তারা আজ দুশমনদের এক চৌকির উপর তোপের সাহায্যে হামলা চালিয়েছিলেন, হামলায় দুশমনের ক্ষয় ক্ষতির সঠিক কোন হিসাব না জানলেও কিছু সময়ের ভেতরে সেখানে আগুনের শিখা দেখা গিয়েছে, তাছাড়া এ্যাম্বুলেন্সের ব্যস্ত ছুটাছুটি এবং ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ীর সেখানে তড়িঘড়ি প্রবেশও চোখে পড়েছে। মুজাহিদদের ক্ষতি স্রেফ এটুকুই হয়েছে। যে এক সাথীর চশমা পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছে।

তোপ আক্রমণের কারণে ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিক জানা যায় না, বরং দু চার দিন পরে যে সকল আফগান সৈন্য মওকা বুঝে মুজাহিদদের নিকটে আসে তারা অথবা মুজাহিদদের গুপ্তচরগণ বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে। মুজাহিদগণ পুরোপুরি অনুসন্ধান না করে দুশমনের ক্ষতির হিসাব করেননা। দুশমনের ফৌজে এমন অসংখ্য মুসলমান রয়েছে, যাদেরকে জোরপূর্বক এই যুদ্ধে লিপ্ত করা

হয়েছে, তারা বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে মুজাহিদদের সাহায্য করতো।

নাসরুল্লাহ এবং ছয়টি হেলিকপ্টার

আনুমানিক পঁচিশ বছর বয়সী পাকিস্তানী নওজোয়ান মুজাহিদ নাসরুল্লাহর সাথে পরিচয় হয় এই ঘাঁটিতে, সে একাকী ছয়টি রাশিয়ান গানশীপ হেলিকপ্টার কে সম্মুখ সমরে পরাজিত করে ইতোমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। হালকা পাতলা, ধীরস্থির প্রকৃতির নাসরুল্লাহর সাথে প্রথম সাক্ষাতের পর একথা বিশ্বাস করা কঠিন হলো যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সেই ঘটনার নায়ক এই যুবক। আরেক অভিযানে সে অসংখ্য ট্যাংক ধ্বংস করার পর সাথীগণ তার নাম দিয়েছে “ট্যাংক শিকারী”।

আমি তার নিকট হেলিকপ্টার যুদ্ধের ঘটনা শুনানোর অনুরোধ জানালাম, কিন্তু এই মুজাহিদদের কে আল্লাহ এখলাস ও বিনয়ের সীমাহীন ঐশ্বর্য দান করেছেন যে তারা কোন রকম আত্ম প্রচার ও খ্যাতি অর্জনের ধারে কাছেও ঘেষতে ইচ্ছুক নন। তারা প্রত্যেকে অন্য মুজাহিদের কৃতিত্ব ও সাফল্যের কথা সবিস্তারে বললেও নিজের প্রসঙ্গে কেউ মুখ দিয়ে একটি শব্দ ও বের করেন না। নাসরুল্লাহ ও আমার অনুরোধের জবাবে ছোট্ট একটি বাক্য উচ্চারণ করে খামোশ হয়ে গেলো। জনৈক কবি মরদে মুসলমানের চমকার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যার মধ্য হতে চারটি নিম্নরূপঃ “তার প্রত্যাশা অতি সংক্ষিপ্ত,

তার মাকসাদ সুউচ্চ,তার চাল চলন আকর্ষণীয়, তার দৃষ্টি হৃদয়কাড়া।”

নাসরুল্লাহর মাঝে সবগুলো পুরোদমে বিদ্যমান

নাসরুল্লাহকে আমি এই গুণ চতুষ্টয়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। এই ঘটনা সম্পর্কে আমরা যে প্রশ্নই করতাম, সে তার উত্তরে হাঁ বা না বলে নিরব হয়ে যেত, কিন্তু আমি তাঁর থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকি। আধা ঘন্টার অবিরাম পরিশ্রমের ফলে ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি তা নিম্নে সাজিয়ে লিখছি।

সে বলল-কয়েক বছর আগের ঘটনা। আমি আমার সংগঠনের আমীর সাহেব এবং তাঁর কয়েকজন সহচরকে নিয়ে একটি পিকআপযোগে ‘বাগাড় থেকে উরগুনের ক্যাম্পে এসে পৌছি। রাত তখন তিনটা। এখানে পৌছে অবগত হই যে, এখনই আমাকে ‘বাগাড়’ ফিরে গিয়ে সেখান থেকে আরো কিছু মুজাহিদকে নিয়ে আসতে হবে। কাজটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক করার। আমি অনতিবিলম্বে একজনকে সাথে নিয়ে বাগাড় অভিমুখে যাত্রা করি। অর্ধেক পথে ‘রিবাত' নামক একটি অঞ্চল রয়েছে। সেখানে পৌছতে পৌছতে ভোর হয়ে যায়। সে সময় রাশিয়ার গানশিপ হেলিকপ্টার মুজাহিদদের জন্য ওৎ পেতে থাকত। সর্বদা তাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা ছিল। তাই আমরা পিকআপটিকে একটি টিলার আড়ালে পাহাড়ী খালের মধ্যে খাড়া করে ফজর নামায আদায় করি। বিরামহীন

কর্মব্যস্ততার কারণে রাতে খানা খাওয়া হয়নি। পেটে প্রচন্ড ক্ষুধা ছিল, সঙ্গে যা ছিল তাই খেতে আরম্ভ করি। ইতিমধ্যে হেলিকপ্টারের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। আমার সঙ্গীটি দেখার জন্য দ্রুত সম্মুখের টিলার উপর আরোহন করে। তাড়াহুড়ার ফলে সে ক্লাশিনকোভও সঙ্গে নেয়নি। সে চূড়ার নিকট পৌছতেই আকাশে ছয়টি হেলিকপ্টার আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ক্লাশিনকোভ এবং পাশে যতগুলো ম্যাগজিন ছিল তা হাতে নিয়ে দ্রুত ঐ টিলাতে আরোহণ করি। কিছুটা উপরে উঠে বড় একটা পাথরের আড়ালে পজিশন নিয়ে বসে পড়ি।

হেলিকপ্টারগুলো আমাকে দেখে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে সেগুলো মাথার উপর এসে পড়ে। সম্মুখে এসে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ শুরু করে। আমি ছিলাম পাথরের আড়ালে। সেখান থেকেই আমি ফায়ার করতে থাকি। সে সময় ফায়ার করা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের হুশ আমার ছিল না। আমার সাথীটি কোথায় আছে এবং কি অবস্থায় আছে, সে খবরও আমার ছিল না। অকস্মাৎ আমার এক বা একাধিক গুলি একটি হেলিকপ্টারকে আঘাত করে এবং দেখতে দেখতে তা ভূপাতিত হয়। হেলিকপ্টারটিতে আগুন জ্বলে ওঠে। হেলিকপ্টারের পাইলটটিও সম্ভবত জাহান্নামে পৌঁছে যায়। কারণ তার মধ্য থেকে কাউকে আমি বাইরে বের হতে দেখিনি। অবশিষ্ট পাঁচটি হেলিকপ্টার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে অবতরণ করে। তার মধ্য থেকে সৈনিকরা বাইরে বের হয়ে এসে কিছু জ্বলন্ত হেলিকপ্টারের দিকে অগ্রসর হয়, আর বাকিরা ফায়ার করতে করতে আমার দিকে

অগ্রসর হতে থাকে।উর্দি দেখে বুঝা যাচ্ছিলো তারা অফিসার শ্রেণীর লোকজন। আমি অন্ধের মতো তাদের উপর ফায়ার করে আমার পুরো ম্যাগজিন খালি করে ফেললাম, দুয়েকজন আমার গুলীর আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর কি হলো আমি জানিনা, কারণ গুলী শেষ হবার পর আমি অচেতন হয়ে পড়ি। আল্লাহ ভাল জানেন যে কতো ঘন্টা অতিবাহিত হবার পর আমার হুশ ফিরে আসে, তখন আমি নিজেকে ছোটখাটো এক কামরার খাটে আবিষ্কার করি, হঠাৎ আমি ডান উরুতে প্রচন্ড যন্ত্রণা অনুভব করি। দেখলাম রক্তমাখা কাপড় দিয়ে সেখানের যখমে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে। সামনে এক যুবক বসে ছিলো। ধীরে ধীরে আমার স্মৃতিশক্তি কাজ শুরু করে। এই সফরে আমার সেই সাথীর কথা মনে পড়লো, এরপর সহসা হেলিকপ্টারের ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমি উঠে বসতে চাইলাম, কিন্তু মাথা চক্কর মারলো। সামনের যুবক দ্রুত আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলল; “তোমার শরীরে প্রচন্ড জ্বর এসেছে, শুয়ে থাকো ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে। আমি সেই সাথীর কথা জানতে চাইলে যুবক তৎক্ষণাত আমার সাথীকে হাযির করলো, তার সাথে আরো কয়েকজন মানুষও আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। সাথীকে দেখতে পেয়ে আমার খুশীর অন্ত রইলোনা, কিন্তু ক্রমান্বয়ে যখমের ব্যথা বেড়েই চলছিলো, এবার আমাকে জানানো হলো আমি রিবাতের হোটেলে অবস্থান করছি ।

আমার সাথী মোবারকবাদ দিয়ে আমাকে বলল; “তুমি দুশমনের একটি হেলিকপ্টার

ধ্বংস করার পর অন্য হেলিকপ্টারের অস্ত্রধারী আরোহীরা তোমার দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। তাদের অধিকাংশ তোমার গুলীতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। কিন্তু ততোক্ষণে তোমার তরফ থেকে গুলী বন্ধ হয়ে যায়, যা দেখে আমি দুর্ভাবনায় নিপতিত হই, কিন্তু শূন্য হাত হবার কারণে দুশমনের কার্যক্রম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনি। তারা গুলী ছুড়তে ছুড়তে তোমার অবস্থানের কাছে চলে যায়, তাদের নিক্ষিপ্ত একটি গুলী তোমার রানে বিদ্ধ হয়। তুমি বেহুশ হয়ে রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে আছো দেখে তারা মনে করে তুমি মারা গেছে। সময় ক্ষেপণ না করে তারা ঝটপট সঙ্গীদের লাশ এবং যখমীদের হেলিকপ্টারে তুলে নিজেদের পথ ধরে। তারা যেতেই আমি ছুটে তোমার কাছে আসি, যখম থেকে রক্ত ঝরছিলো। ইতোমধ্যে বিবাতের সাহায্যকারী লোকজন আমাদের নিকট এসে জড়ো হয়। তাদের সাহায্যে আমি তোমার পায়ে পট্টি বেঁধে দিই এবং এখানে নিয়ে আসি। যখম তেমন বিপদ জনক নয়, ইনশাআল্লাহ তাড়াতাড়িই তুমি সুস্থ্য হয়ে যাবে।” সে একনাগাড়ে এতো গুলো কথা বলে নিঃশ্বাস নিতে থাকে।

নাসরুল্লাহ বললেন, আমার রানের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিলো, পাকিস্তান এনে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অতঃপর আল্লাহর ফযল ও করমে সুস্থ হয়ে আবার এখানে ছুটে এসেছি। এখান থেকে ফিরে যেতে মন চায়না। বাবা মা অবিলম্বে আমার শাদীর কাজ সমাধা করতে চান, কিন্তু আমার মন চায় যে শাদীর পূর্বে আরগুন আমাদের দখলে নিয়ে নেই।

অকল্পনীয় সাহায্য

ভাই নাসরুল্লাহ আরেকটি ঘটনা শুনিয়েছেন। “আমি আমার কয়েকশ গাযী ভাইদের সাথে নিয়ে এক পাহাড়ে আবাস গাড়লাম। সেখান থেকে নীচে নেমে আচমকা দুশমনের উপর হামলা চালাতাম। কিন্তু একবার আমরা খাদ্যের ঘাটতিতে পড়ে গেলাম। একদিন বাদ ফজর জায়নামাযে বসে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেটে প্রার্থনা করছিলাম; আপনার এই নেক বান্দাগণ আমার সহযোদ্ধা হয়ে আপনার রাস্তায় জান দেবার জন্য তৈরী হয়েছেন, কিন্তু তাদের খোরাকের কি ব্যবস্থা হবে? আমি না নিজের ক্ষুধা সহ্য করতে পারি আর না সাথীদের ক্ষুধার্ত মুখ দেখতে পারি---- এই বলে কিছু সময় নীরবে চোখের অশ্রু বইয়ে দিলাম। ধীরে ধীরে আমার চোখে তন্দ্রার ভাব এলো, এসময় কে যেন আমার ডান কাঁধে হাত রেখে বলল; “আল্লাহর ব্যাপারে ভুল ধারণা করছো?”

আমি কিছুক্ষণ পূর্বের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, মাথা নীচু করে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললাম, “না, না আমি আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভুল ধারণা করিনি” আওয়ায এলো তোমাকে এবং তোমার সাথীদের তিনিই রিযিক দিবেন যিনি এর পূর্বে দিয়েছেন। যখন তোমরা তার রাহে জিহাদে অংশ নিচ্ছো, তিনি কি করে তোমাদেরকে অভুক্ত রাখবেন? তোমাদেরকে এতো বেশী রিযিক দান করবেন যে তোমরা গাছের মাথায় গোশতের বড় বড় টুকরো লটকানো অবস্থায় দেখতে পাবে। এই অবিশ্বাস্য ঘটনার দুই ঘন্টার ভেতর সামনের গাছের দিকে তাকিয়ে আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম, সেখানে দুটো জবাইকৃত বকরী ঝুলছিলো। গ্রামের এক

ব্যক্তি সামনে দাঁড়িয়েছিলো, সে মুজাহিদদের জন্য বকরী দুটো এনে এই মাত্র জবাই করে গাছে লটকে দিয়েছে। এরপর আর কখনো আমরা রিযিকের সংকটে ভুগিনি।”

মুজাহিদ নাসরুল্লাহ ডক্টর আব্দুল্লাহ আযযাম কে আরেকটি ঘটনা শুনিয়েছেন। “যে পাহাড়ে আমরা অবস্থান করছিলাম সেখানে আগুন জ্বালানো সম্ভব হচ্ছিলো না। কারণ হুকুমতের গুপ্তচরেরা ধোয়া দেখার সাথে সাথে সে সম্পর্কে সৈন্যদেরকে খবরদার করে দেবে (শুধু রান্না করার জন্যই নয় বরং শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচার প্রয়াজোনেও আগুন জ্বালানো অত্যাবশ্যকীয় ছিলো) এই দুর্ভাবনাকে আল্লাহ তায়ালা এভাবে দূর করে দিলেন যে, ঘনকালো মেঘ সারা বছর আমাদের পাহাড়ের উপর এমন ভাবে ছেয়ে রইলো যে বাহির থেকে আগুনের ধোঁয়া দেখার কোন উপায়ই রইলোনা।”

আরেকটি ঘটনা নিম্নরূপঃ “যখন কোন মুজাহিদ শহীদ হয়ে যেতেন এবং হুকুমত তার পরিচয় জেনে যেতো তখন গোয়েন্দারা তার সকল আত্মীয় স্বজনকে খুন করে ফেলতো। কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ তাঁর করুণা করলেন এভাবে যে, আমাদের মধ্য হতে একজনের আত্মীয়দেরও তারা খুঁজে পেত না, কারণ তারা বহু পূর্বে আফগানিস্থান ত্যাগ করে পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন।”

মাওলানা নাসরুল্লাহ বললেন; “কমুনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম পর্যায়ে দুশমনের ট্যাংক আমাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ আমাদের নিকট ট্যাংক বিধ্বংসী কোন অস্ত্র ছিলো

না। আমরা কিছু পয়সা জমিয়ে উল্লেখিত অস্ত্রের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। আমরা সর্বসাকুল্যে ৩৫০ জন সাথী একসাথে ছিলাম। একদিন প্রায় এক হাজার সরকারী সৈন্য ট্যাংক, কামান ও মেশিনগান সুসজ্জিত হয়ে আমাদের উপর হামলা করলো। আড়াই দিন যুদ্ধের পর দুশমন পরাজিত হয়ে পিছু হটলো। গনীমত হিসেবে আমরা ২৫০টি ট্যাংক বিধ্বংসী কামান, কয়েকশ মেশিনগান, আটটি ট্যাংক এবং প্রায় সাতশ দুশমন ফৌজকে বন্দী করলাম, তাদের প্রত্যেকের নিকট একটি করে কালাশনিকভ রাইফেল ছিলো।”

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়ান সেনা বাহিনী আফগান ভূমিতে পা রাখে। এবার রুশ জঙ্গী বিমান এবং গানশীপ হেলিকপ্টার নিয়ে মুজাহিদদের দুর্ভাবনার অন্ত রইলোনা, কারণ মুজাহিদদের নিকট কোন বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ছিলো না। এভাবে কয়েক বছর শূন্য হাতে পরাক্রমশালী দুশমনের মোকাবেলা করতে হলো। কিন্তু এই সমস্যার কোন সমাধানে পৌছা গেলোনা। এভাবে নাসরুল্লাহ অনেক ঘটনার মধ্য থেকে একটি যা ১৯৮২ সালে সংঘটিত হয় আমাকে শুনিয়েছেন; আমরা ৫৯ জন মুজাহিদ ছিলাম, দুশমন ২৫০টি ট্যাংক ও সাজোয়া বহর নিয়ে আমাদের উপর হামলে পড়লো । কম্যুনিস্টরা সংখ্যায় দেড় হাজারের বেশী ছিলো, উপর থেকে তাদের বোমারু বিমান অবিরাম বোমা বর্ষণ করছিলো। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, তাদের ৪৫টি ট্যাংক ও সামরিক যান ধ্বংস

হলো, ১৫০ জন সৈন্য ঘটনাস্থলে প্রাণ হারালো, গুরুতররূপে যখমী হলো প্রায় ১০০ জন, গনীমত হিসেবে আমরা যা পেয়েছিলাম তা নিম্নরূপঃ

বিমান বিধ্বংসী কামান ১টি

গ্রানাফ গান ৩টি

কালাশনিকভ ২২মিলিমিটার

কামান ১টি

কামানের গোলা ২৮০টি

রাইফেলের গুলী ৩৬হাজার
৭০টি ।

জালালুদ্দীন হক্কানীর ঘটনা

পেশোয়ারে হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর মোজাযী খলীফা মাওলানা ফকীর মুহাম্মাদ সাহেবের সাথে আমার দেখা হয়, মাওলানা রাতের খাবার তার ঘরে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে জানান সেখানে বিখ্যাত মুজাহিদ কমান্ডার জালালুদ্দীন হক্কানীও তাশরীফ আনবেন। আল্লাহর এ সকল প্রিয় বান্দার সান্নিধ্যে দুয়েক মুহূর্ত কাটানো আমার দৃষ্টিতে বিশেষ সৌভাগ্যের কারণ। কিন্তু আমি তখন পর্যন্ত সে বিষয়ে অবগত ছিলাম না যা ডক্টর আব্দুল্লাহ আযযাম তার “আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান” কিতাবে উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় তখন পর্যন্ত মাওলানা হক্কানীর সীনার সাথে পেচানো গুলীর বেল্ট অবশ্যই বিশেষভাবে দেখতাম।

ডক্টর আযযাম লিখেনঃ “জালালুদ্দীন হক্কানী গুলীর যে বেল্ট সর্বদা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখেন, আমি নিজের চোখে সেই বেল্টের উপর দুশমনের নিক্ষিপ্ত গুলীর দাগ দেখেছি, কিন্তু সেই গুলী তার শরীরে সামান্যতম আচড়ও কাটেনি।”

মাওলানা হাক্কানীর সহোদর মুহাম্মাদ ইব্রাহীম এর চেয়েও আশ্চর্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হন। তিনি বলেন; “২০শে শাবান (১৯৮২) খোস্তের এক যুদ্ধে আমাদের উপর বোমা বর্ষণ শুরু হলো, আমাদের দূরবীনও ভেঙ্গে গিয়েছিলো। বারুদের টুকরা লেগে আমার পায়জামা পুড়ে যায়, কিন্তু শরীরে কোন আঘাত লাগেনি। বোমা এবং গোলার আঘাতে ছোট ছোট পাথরের টুকরা সাথীদের শরীরে আঘাত হানে, অনেকের গুলীর বেল্ট ছিড়ে যায়, পরিধেয় বস্ত্রও জ্বলে যায় অনেকের, কিন্তু কেউ যখমী হয়নি।” (ডক্টর আযযাম বলেন ইব্রাহীমের পুড়ে যাওয়া পায়জামা এখনো আমার নিকট সংরক্ষিত আছে)।

পাকিস্তানী সীমান্ত মীরান শাহ’ থেকে ‘খোস্ত যাবার পথে ‘পাকতিয়া প্রদেশের ঝাওরের পাহাড়ী এলাকায় মাওলানা হক্কানীর জিহাদী এলাকা শুরু হয়। এই দরবেশ প্রকৃতির মানুষ সেখানকার বিপদসংকুল পাহাড় খুড়ে বড় বড় সুরঙ্গ তৈরী করেছেন। সেখানে দুশমনের বোমা থেকে রক্ষার জন্য মসজিদ, অস্ত্র, রসদ, চিকিৎসা সরঞ্জামের গুদাম, হাসপাতাল, গাড়ীর ওয়ার্কশপ, ওয়ারলেস স্টেশন, ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রভৃতি তৈরী করেছেন। বাহিরে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ট্যাংক,

সাজোয়া যান প্রভৃতি কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মজার ব্যাপার হলো, এর অধিকাংশই দুশমনের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে।

সুড়ঙ্গের অবিশ্বাস্য ঘটনা

আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট সৈন্যরা ১৯৮৬ সালের গোড়ার দিকে ঝাওরে অবস্থিত মুজাহিদ মারকাযের উপর স্থল ও আকাশ পথে বিশ বার হামলা চালায়। আক্রমণের তীব্রতায় মাওলানা জালালুদ্দীন সহযোদ্ধাদের নিয়ে এক পাহাড়ি সুড়ঙ্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু দুশমনের জঙ্গী বিমান পাহাড় লক্ষ্য করে এমন প্রচন্ড বোমা বর্ষণ শুরু করলো যে আচমকা বিশাল এক পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিলো। সুড়ঙ্গের পেছন দিকে বের হবার দ্বিতীয় কোন রাস্তা ছিলো না। মাওলানা হাক্কানী বলেন, “আমরা ভাবলাম এই সুড়ঙ্গই আমাদের কবর স্থান হবে, নিরুপায় হয়ে কালিমায়ে তায়্যিবা এবং বিভিন্ন দোয়া দরুদ পড়তে লাগলাম---- কিছুক্ষণ যেতে না যেতে দুশমনের বোমারু বিমানগুলো ফিরে এসে পূর্বের চেয়ে আরো তীব্র ভাবে বোমা বর্ষণ করতে লাগলো, তাদের নিক্ষিপ্ত বোমাই এবার আমাদের মুক্তির পথ দেখালো। লাগাতার বোমার আঘাতে সুড়ঙ্গ মুখ থেকে পাথর খন্ডটি দূরে সরে যায় এবং আমরা নিরাপদে বাহিরে পা রাখি।”

আনুমানিক দশ মিনিট পর মারকাযের দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। সেই সাথে কুরআনে

কারীমের এই আয়াত তাদের সামনে বাস্তব রূপে ধরা দিলো ;

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় পায় আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করেন।" এই হামলায় দুশমন অগ্নি বোমা নিক্ষেপ করে সমগ্র জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেয়। একটি গোলার আঘাতে মাওলানা হাক্কানী কয়েক ফুট শূন্যে উড়ে দূরের আগুনে গিয়ে পড়েন, তার শরীরের অনেক স্থান পুড়ে যায়। গুরুতর যখম অবস্থায় তাকে পেশোয়ারের হাসপাতালে পৌছে দেয়া হয়। আগুনে পোড়া দাগ এখনো তার শরীরে বিদ্যমান, যা আমি নিজের চোখে দেখেছি। দুশমনের এই হামলার সময় 'ইত্তেহাদে ইসলামী আফগানিস্তান' সংগঠনের বিখ্যাত কমান্ডার মাওলানা আরসালান রহমানী নিকটস্থ এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যস্ত ছিলেন।

অন্য কয়েক কমান্ডারের ন্যায় তিনিও মাওলানা হাক্কানীর মারকাযের উপর দুশমনের হামলার খবর শুনে দীর্ঘ পথ ঘুরে নিজের শতাধিক সহযোদ্ধা নিয়ে আচানক দুশমনের উপর হামলা চালান। তীব্র প্রতিরোধের মুখে নিজেদের বেশ কিছু সৈন্যের লাশ ফেলে দুশমন পিছপা হতে বাধ্য হয়। শত্রুমুক্ত করার পর আফগানিস্তানে পূর্ণ ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য দ্বীনদার সুশিক্ষিত, পরিশ্রমী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুশৃংখল একদল নওজোয়ানের প্রয়াজোনীয়তা অনুভব করে মাওলানা হাক্কানী মীরান শাহ' এলাকায় 'মামবাউল উলুম' নামে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে আফগান নওজোয়ান ও

মুজাহিদদের সন্তানগণ এমন সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা নিয়েছেন যা ভবিষ্যতে ইসলামী আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

কারামতের প্রদর্শনী

আজ সেই নির্ভীক যোদ্ধাদের যেখানে বিভিন্ন ধরণের কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হচ্ছিলো সেখানে প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তাদের জন্য এমন অবিশ্বাস্য ও গায়েবী মদদ দৃশ্যমান হলো যাতে ঈমানের মাঝে নতুন চাঞ্চল্য এবং অন্তরে নতুন শক্তির সঞ্চার হয়।

ডোগরের বহু পুরাতন মুজাহিদ হিযবুল্লাহ বলেন; “আমি মাওলানা আব্দুর রহমানের সাথে ছিলাম, কিছুদূর চলার পর তাকে হারিয়ে ফেললাম। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে দুশমনদের এক কামরা লক্ষ্য করে রকেট লাঞ্চার নিক্ষেপ করলাম, কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়ায না শুনে আমার বিস্ময়ের সীমা রইলোনা। কারণ, রকেট লাঞ্চারটি প্রচন্ড আওয়াযে বিস্ফোরিত হয়ে থাকে । ইত্যবসরে মাওলানা আব্দুর রহমান তার দুই সাথী সহ এক দুশমন সেনাকে আহত অবস্থায় আটক করে কামরার বাহিরে নিয়ে এলেন। আমি জানতামনা যে তারা কামরায় প্রবেশ করেছেন। আমি ভেতরে গিয়ে দেখলাম আমার নিক্ষিপ্ত রকেট অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে, যদি তা বিস্ফোরিত হতো তা হলে মাওলানা আব্দুর রহমান ও অন্য সাথীগণ যখমী হয়ে যেতেন।”

হিযবুল্লাহ আরেকটি ঘটনা শুনালেনঃ “আমি এক কামরার ভেন্টিলেটর দিয়ে ভেতরে গ্রেনেড ছুড়ে মারলাম, কিন্তু সেটি ভেন্টিলেটরের ফাঁকে আটকে গেলো, ভেতরে গেলোনা, বিস্ফোরিতও হলো না। পিন খুলে গ্রেনেড ছুড়ে মারলে তা ফেটে যাওয়া স্বাভাবিক, কোনভাবেই তার বিস্ফোরণ ঠেকিয়ে রাখা যায় না। পরে জানতে পারলাম যে ঐ কামরায় আমার সাথীগণ অবস্থান করছিলেন, হয়তো সেই কারণে মহান রাব্বুল আলামীন গ্রেনেডটিকে অকেজো করে দেন।”

হিযবুল্লাহ তৃতীয় ঘটনা বর্ণনা করেন; “কমান্ডার যুবায়ের মুজাহিদ আদিল ও আমাকে তালাবদ্ধ কামরায় তল্লাশী নিতে বলেন। আমরা বদ্ধ দরজায় লাথি মারতেই দরজা ভেঙ্গে একদিকে পড়ে যেতো, অথচ দরজাগুলো যথেষ্ট মযবুত ভাবে তৈরী করা হয়েছিলো। আমি মনে করলাম, হয়তো দরজা গুলো দুর্বল তাই লাথি দেবার সাথে সাথে ভেঙ্গে পড়ছে। এই ভাবনায় পরবর্তী দরজায় লাথি মারলাম, কিন্তু এবার আমার লাথি কোন কাজে এলোনা। দু তিন বার সর্বশক্তিতে চেষ্টা করলাম কিন্তু দরজা ভাঙ্গলো না। আদিলও আমার ন্যায় চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। ভাই সফদার খান এসে চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারলো না। এবার আমরা তিনজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালাম, ফলাফল পূর্বের মতোই হলো। এবার আমার মনে পড়লো, কিছুক্ষণ পূর্বে আমি মনের মাঝে একটি ভুল ধারণাকে স্থান দিয়েছিলাম, সুতরাং আমি তৎক্ষণাত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বলতে লাগলাম; “ইয়া আল্লাহ! এই দরজা ভীষণ শক্ত, আমাদের দ্বারা এগুলো

ভাঙ্গা সম্ভব নয়, আমরা আপনার সাহায্য চাই”----- এই বলে আমি আরেকবার দরজায় লাথি দিতেই তা দূরে ছিটকে পড়লো ।

দুই শত্রুকে ঘায়েল

১৯৮৬ সালের অক্টোবরের ৩০ তারিখ হরকতুল জিহাদিল ইসলামীর দুই মুজাহিদ এক পাহাড়ি উপত্যকায় রাত যাপন শেষে সকালে মসজিদে ফজর ও ইশরাক নামায আদায় করে গ্রামের পথ ধরলেন। পথিমধ্যে এক ছোট নদী অতিক্রম করার সময় এক সাথী প্রস্তাব করলেন নদীতে গোসল সেরে গ্রামের দিকে যাই। প্রস্তাব অনুযায়ী উভয় নিজ কাপড় খুলে তার ভেতর পিস্তল গুজে তীরে রেখে গোসলের উদ্দেশ্যে পানিতে ঝাপিয়ে পড়লেন। আচমকা দুই আফগান সেনা সেখানে উপস্থিত হলো, একজনের হাতে পানির বালতি অপরজন রাইফেল হাতে তার বডিগার্ডের দায়িত্ব পালন করছিলো। তারা নিকটে পৌছা মাত্র এক মুজাহিদ পানি থেকে আওয়ায দিলো; “ কেমন আছেন স্যার”? “স্যার” সম্বোধনে সে ভীষণ খুশী হয়ে বলতে লাগলো; “তোমরা কারা? তারা উত্তরে বলল; “আমরা পাশের গ্রামের বাসিন্দা, মযদুরীর কাজ করি।” সৈন্যরা আবার জানতে চাইলো, “এদিকে কোন অস্ত্রধারী আসেনি তো?” “সৈন্য ছাড়া অন্য কোন অস্ত্রধারী আমাদের গ্রামে পা রাখার দুঃসাহস করবে না।” মুজাহিদদের এই উত্তর শুনে তারা নিশ্চিন্তে পানি পূর্ণ বালতি নিয়ে ক্যাম্পের দিকে চললো। তারা উল্টো পথে চলতেই এক মুজাহিদ নিঃশব্দে কিনারে উঠে এসে পিস্তলের গুলীতে দেহরক্ষী

সৈন্যকে জাহান্নামের পথ দেখালো। দ্বিতীয়জন পালানোর কোশেশ করলে সে দৌড়ে এসে মৃত সৈনিকের কালাশনিকভ উঠিয়ে তাকেও গুলীর তোড়ে উড়িয়ে দিলো। অতঃপর তারা দুজন মুহূর্তের মাঝে সেই এলাকা ত্যাগ করেন।

কর্তিত জিহ্বা নিয়ে মুজাহিদের হামলা

মুজাহিদ আরিফ রাব্বানী বলেন; “আলোচ্য ঘটনা প্রবাহ নূর মুহাম্মাদ তারাকির সময়কার, আজকের তুলনায় তখন খুব কম সংখ্যক মানুষই জিহাদের আহবানে সাড়া দিয়েছিলো। সমগ্র যাওরান এলাকায় সেদিন আমার সাথে সর্বসাকুল্যে ৩০ জন মুজাহিদ ছিলেন। তাদের মাঝে আব্দুল ওয়াকীল নামে আমার এক নিকটাত্মীয়ও ছিলো। আমরা গারদেযের নিকটবর্তী যারমাস্ত এলাকার দখলকৃত হেড কোয়ার্টার 'তামীরে’ শক্র কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। রাতের দ্বিপ্রহরে শত্রু বাহিনী আমাদের উপর প্রচন্ড হামলা চালায়। আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে আমরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হই। কিছুদূর আসার পর আব্দুল ওয়াকীল আমাদের সাথে নেই দেখে ভাবলাম হয়তো সে শহীদ হয়ে গেছে। কিন্তু আসল ঘটনা এই যে, দুশমনের গুলী আব্দুল ওয়াকীলের মুখে আঘাত হানে ফলে তার জিহ্বা ছিড়ে যায় আর অচেতন অবস্থায় সে একস্থানে পড়ে থাকে।

ফজরের ওয়াক্তে তার হুশ ফিরে আসে এবং
সে নিজেকে সঙ্গী সাথী বিহীন অবস্থায় দেখতে পায়। ঝুলে থাকা জিহ্বা সীমাহীন

যন্ত্রণা দিচ্ছিলো, বিধায় টান দিয়ে ছিড়ে সেটিকে দূরে ফেলে দেয়। তার মুখও মারাত্মক রকমের আঘাত প্রাপ্ত ছিলো। সে চাদরকে মযবুতভাবে মুখের সাথে বেঁধে নিলো। নিজের রাইফেল উঠিয়ে হেড কোয়ার্টারের চতুর্দিকে ঘুরে সাথীদের সন্ধান করতে লাগলো, কিন্তু মুজাহিদগণ সেখানে থাকলে তো তাদের সন্ধান পাবে! সে আবার নিজের পূর্বের অবস্থানে ফিরে এসে ‘তামীর’ কে লক্ষ্য করে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করলো। ‘জি খ্রীর গুলীর আঘাতে তিন দুশমনকে জাহান্নামের রাস্তা দেখালো এবং মুজাহিদদের ফেলে যাওয়া গ্রেনেড উঠিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলো। তার এই হামলায় ভীত হয়ে দুশমন চতুর্দিকে অনুসন্ধানে নামলো। একস্থানে কর্তিত জিহ্বা পড়ে থাকতে দেখে তারা চতুর্দিকে মাইকে জানালো যে, হামলাকারীর জিহ্বা নেই, তার নিকট রাইফেল আছে, সামনে পড়া মাত্র যেন তাকে গ্রেফতার করা হয় অথবা দ্রুত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। তাদের এই ঘোষণা আব্দুল ওয়াকীলের কানেও গেলো, কিন্তু সে নির্ভীক চিত্তে চলতে লাগলো। অনেকেই তার নিকট দিয়ে গেলো কিন্তু না কেউ তাকে চিনতে পারলো আর গ্রেফতার করতে পারলো। আমরা দূর থেকে তাকে দেখে ভাবলাম হয়তো সে দুশমন দলের কেউ হবে, নিকটে আসার পর দেখলাম সে আমাদের ভাই আব্দুল ওয়াকীল ।

নিঃসন্দেহে তার উপর আল্লাহর গায়েবী
মদদ ছিলো, কারণ গুরুতর যখম থাকা সত্ত্বেও সে দুশমনের সাথে লড়াই করেছে এবং তিন ব্যক্তিকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়েছে।”

তিনি আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন; “আফগান জিহাদের দ্বিতীয় বছর চলছিলো। কুন্ডাও শহরে দুশমনের কনভয় প্রবেশ করলো। এই কনভয়ে কাবুলের সৈন্যরা ছিলো, যারা আফগানিস্তানের সৈন্য বাহিনীর মাঝে সর্বাধিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈন্য হিসেবে পরিচিত ছিলো। আমরা কনভয়ের সামনের রাস্তা বন্ধ করে দিলাম, দুশমনের সৈন্য সংখ্যা আনুমানিক ছয় হাজার হবে, তাদের সাথে তিনশত সাজোয়া যান এবং ট্যাংক ছিলো। আমরা সর্বমোট সাতশত মুজাহিদ ছিলাম। দীর্ঘ একমাস আমরা কনভয়ের রাস্তা অবরোধ করে রাখলাম, ইতোমধ্যে আমাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ শেষ হয়ে এলো। খাদ্য সামগ্রীও ফুরানোর পথে, বহু কষ্টে এক বেলার খাবার যোগাড় হতো। দুর্বল বিশ্বাসের মুজাহিদগণ আস্তে আস্তে দল ছেড়ে চলে যেতে লাগলো। যেতে যেতে আমরা ২৩ জন অবশিষ্ট রইলাম। বাধ্য হয়ে কনভয়ের পথ ছেড়ে দিতে হলো। খাবার শূন্য অবস্থায় প্রথম দিন একটি বন্য মোরগ আমাদের হাতে এলো, আটজন সেটা খেয়ে কোন রকমে ক্ষুধা নিবারণ করলো, বাকী পনের জন অভুক্ত থাকলাম। আমি সাথীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলাম; “এবার আমরা কি করবো?” মুজাহিদগণ উত্তর দিলেন; “আপনি যা বলবেন আমরা তাই করবো।” আমি বললাম; “বাহ্যিক কোন রাস্তা এখন আর আমাদের সামনে নেই, তথাপি আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ খুব শীঘ্র আমাদের বিজয় দান করবেন। এরপর নাঈম নামে এক মুজাহিদকে ১৮ জনের সালার বানিয়ে নির্দেশ দিলাম তুমি কনভয়ের পেছন দিক দিয়ে হামলা চালাতে থাকো, তিন জনকে বিমান বিধ্বংসী রকেটের দায়িত্ব অর্পণ করলাম,

অবশিষ্ট এক সাথীকে নিয়ে আমি ফখরী গ্রামে গেলাম। সেখানে মৌলভী মুহাম্মাদ ভাইকে পেলাম (তিনি পরবর্তীতে শহীদ হয়ে গিয়েছেন)। কনভয় চলে গিয়েছে শুনে অসুস্থ শরীরে রাইফেল উঠিয়ে তাদের প্রতিহত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

আমার আপত্তিতে কান না লাগিয়ে তিনি দ্রুত ২০ জন গ্রামবাসীকে জড়ো করলেন এবং অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে কনভয়ের রাস্তায় পাঠিয়ে দিলেন। আরো ১৫ ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা রওনা হতে না হতেই এক ব্যক্তি গুলী করতে করতে গ্রামে এসে পৌছলো। সে জানালো কনভয়ের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের মধ্য হতে ৪০০ ব্যক্তিকে জীবিত পাকড়াও করা হয়েছে। তিনজন মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেছেন। এ নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রকাশ্য সাহায্যের নিদর্শন, অন্যথায় হাজারো সৈন্যের মোকাবেলায় মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তি কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে? কিভাবেই বা তাদের পরাজিত করে?

ঈমানী তেজোদ্দীপ্ত এক আফগান নারী

নূরতান এলাকার খায়র মুহাম্মাদ নামে
এক ব্যক্তি কমিউনিস্ট ধ্যান ধারণা গ্রহণ করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। তার স্ত্রী তাকে অনেক বুঝায় যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইতে শরীক হয়ে নিজেকে কুফুরীর দিকে ঠেলে দিওনা। অনেক বুঝিয়ে ব্যর্থ হয়ে তার স্ত্রী মনে মনে এক ফন্দি আঁটে এবং তাকে বলে যে, এখানে আমি

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগি, সুতরাং আমাকেও তোমার ব্যারাকে নিয়ে চলো, একরাতে তার স্বামী রাগী চেহারায় ঘরে এসে তাকে দ্রুত ব্যারাকের দিকে যেতে নির্দেশ দিলো। স্ত্রী তার কমিউনিস্ট স্বামীকে বারবার বোঝানোর ব্যর্থ কোশেশ করে অবশেষে নিজের পিস্তলের আঘাতে কাফের স্বামীকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়।

নগন্য মুজাহিদ কর্তৃক হাজারো রুশ সৈন্যের মোকাবেলা

১৯৮০ সালের ঘটনা, লোকেরা ঘরে ঘরে ঈদের আনন্দ উদযাপন করছিলো। ঠিক তখন দুশমনের সামরিক বহর গারদে থেকে খোস্তের দিকে চললো। সামরিক বহরে কয়েক হাজার সুসজ্জিত সেনা, বিশটি অত্যাধুনিক রাশিয়ান ট্যাংক ও শত শত সাজোয়া যান অন্তর্ভুক্ত ছিলো। রাস্তায় পাহারারত হাতে গোনা কতিপয় মুজাহিদ কৃতিত্বের সাথে এই কনভয়ের গতি রুদ্ধ করে দেন। ফায়ারিংয়ের আওয়ায শুনে আশপাশের মুজাহিদগণ তাদের সাথে যোগ দেন, এভাবে তাদের সংখ্যা পাঁচশতে পৌছে যায়। তারা শুধু মাত্র রাইফেল হাতে নিয়ে ত্রিশ দিন কনভয় আটকে রাখেন এবং তাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদীর শেষ সীমায় উপনীত করেন। আল্লাহর দুশমনেরা ঘুনাক্ষরেও জানতে পারেনি যে, তাদের তুলনায় হাতে গোনা কিছু ব্যক্তি সামান্য রাইফেল নিয়ে তাদেরকে ধ্বংসের কিনারায় পৌছে দিয়েছে।

অভুক্ত অবস্থায় মুজাহিদগণ লড়তে থাকেন

ভাই হিযবুল্লাহ বলেন যে, “এই যুদ্ধে অধিকাংশ সাথী সারা দিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় যুদ্ধ করতে থাকেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে রওয়ানার সময় সকল সাথীকে কম বেশী কিছু খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু এই রাতে যেহেতু আমরা রাত তিনটার দিকে ক্যাম্প থেকে বের হই, ফলে যে গ্রুপের নিকট খেজুর দেওয়া হয় তারা আমাদের কাছ থেকে অনেক পেছনে পড়ে যায়। যার কারণে অধিকাংশ যোদ্ধা রাত থেকে কিছু না খেয়েই দুশমনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে, এভাবে পরবর্তী পুরো দিন যুদ্ধে কেটে যায়। সারা দিন এক ফোটা পানি মুখে না দেওয়া সত্ত্বেও মুজাহিদগণ প্রবল বিক্রমে দুশমনের মোকাবেলা করতে থাকেন, তাদের মুখ দিয়ে কোন রকম অনুযোগও বের হয়নি। কারারগাহ বিজয় করার পর দুশমনের ফেলে যাওয়া নানা রকমের খাবার আমাদের হস্তগত হয়। সেখানে পানির বিশালাকৃতির ড্রাম মজুদ ছিলো, কতিপয় সাথী কোথা থেকে যেন চিনি খুঁজে বের করে শরবত বানিয়ে অন্য সাথীদের মাঝে বন্টন করছিলো, আচানক দ্বিতীয় ছাউনি থেকে ট্যাংকের নিক্ষিপ্ত এক গোলা আমাদের মাঝে এসে প্রচন্ড আওয়াযে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের ফলে আমি, গোলাম সারওয়ার, আদিল ও মুহাম্মাদ সারওয়ার যখমী হই এবং সৌভাগ্যবান ভাই আব্দুর রহমান শাহাদতের পেয়ালায় ঠোট রাখে।”

ক্বারী আব্দুর রশীদ কাওছার বর্ণনা করেন, “আমরা রাত তিনটায় নিজেদের মারকায থেকে রণাঙ্গন অভিমুখে রওয়ানা হই। যে

ধরণের বিপদ সংকুল এবং কঠিন রাস্তা আমরা পাড়ি দিয়েছি তা ভাষায় বর্ণনা বুঝানো যাবেনা। সেই এক ঘন্টায় আমরা জীবনের ঐতিহাসিক এক সফর সম্পন্ন করি । রাতের নিকষ অন্ধকারে দুশমন এলাকার ছয় কিলোমিটার পাহাড়ি অসমতল ঝুঁকি পূর্ণ রাস্তা, কোথাও বরফ জমে আছে, কনকনে হাড় কাঁপানো শীতে নিঃশ্বাস জমে যাবার দশা। এমনি অবস্থায় নিজ নিজ অস্ত্র সামলানোর পাশাপাশি গোলা বারুদ ও অন্যান্য সামান কাঁধে নিয়ে দুশমনের দুটি পোস্টের মাঝামাঝি রাস্তা অতিক্রম করে সামনের সুপ্রসস্ত খোলা ময়দান পেছনে ফেলে ছোট্ট এক নালার সামনে অবস্থান নিয়ে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। নিকটবর্তী দুশমন ঘাটিকে টার্গেট করে আমরা অগ্রসর হলাম । আমাদের পেছনে খোস্ত ব্যাটালিয়ন, ডানে বামে দুশমনের অন্য দুটি ছাউনী বিদ্যমান ছিলো। নালার সামনে সকল মুজাহিদ একত্র হলো। আমাদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাতের ঘন অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ফজরের ওয়াক্তের আগমনী বার্তা ঘোষিত হলো। ফজরের ওয়াক্ত হতেই আমার পক্ষে আর নীরব বসে থাকা সম্ভব হলো না, আমি দাড়িয়ে বুলন্দ আওয়াযে আযান দিলাম। আমার মন আমাকে ডেকে বলল; “আব্দুর রশীদ! আজ আল্লাহর অস্বীকার কারীদের মাঝে তুমি সুউচ্চ কণ্ঠে তার নাম ঘোষণা করে দাও।” দুশমনের ঘাঁটির নিকট পূর্বেই অবস্থান গ্রহণকারী সাথীগণ মহান রবের নামের আযান শুনতেই তাদের দেহমনে অকল্পনীয় এক সাহসিকতা ও প্রাণ চাঞ্চল্য অনুভব করলেন। তারা নিজেদের অবস্থানের কথা ভুলে গেলেন। খোদার নামের সেই প্রশান্তি ও

নির্ভরতা পৃথিবীর অন্য কিছুর মাঝে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অতঃপর আমরা জামাতের সাথে নামায আদায় করলাম। নামায শেষে মুজাহিদগণ মোর্চায় অবস্থান নিয়ে যিকির ও তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে সকালের ইন্তেযার করতে লাগলেন। জিহাদ শুরুর পূর্বের সকাল আমাদের নিকট অন্য যে কোন সকালের তুলনায় হাজারো গুণ মনোরম মনে হচ্ছিলো।”

মুজাহিদা সাঈদা বিবির কীর্তি

সাঈদা বিবি নামে ষোল বছরের এক মুসলিম তরুণীর সংগ্রামের কথা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় মাসিক “হিজরত” নামক পত্রিকায় এসেছে। নাগমান প্রদেশের ডুবিশারান গ্রামে সাঈদা বিবি নামে ষোল বছরের এক তরুণীর ভাই আফযাল হোসাইন কট্টর কমিউনিজম বিশ্বাসী ছিলো। রাশিয়ান লাল বিপ্লব আফগানিস্তান গ্রাস করার পর সে নির্বিচারে মুসলিম নিধনে মেতে ওঠে। একদিন রাশিয়ান রক্ত পিপাসু লাল ফৌজ পার্শ্ববর্তী গায়ের উপর হামলা চালায়, তাদের হামলায় গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শিশু জোয়ান শত শত বনী আদম মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে যায়। গ্রামের অধিকাংশ ঘর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়, ভগ্নদশা নিয়ে যে দুয়েকটি অবশিষ্ট ছিলো তার ভেতর থেকে স্বজনহারা নারী শিশুদের মর্মান্তিক আহাজারীতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। গ্রামের বুক চিড়ে বয়ে চলা ছোট্ট নদীর পানি রক্তের বর্ণ ধারণ করে। অপারেশন শেষে আফযাল কতিপয় কসাই কমিউনিস্ট নিয়ে ঘরে ফিরলে তার বোন অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে

তাদেরকে সাদরে বরণ করে নেয়। সে বলতে থাকে, “তোমাদেরকে মোবারকবাদ, তোমরা আজ চমৎকার ও প্রশংসনীয় এক কাজ করেছো, আমাদের বিপ্লবের শত্রুদের ধ্বংস করেছ। তোমাদের সফলতায় আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে, মনে চাচ্ছে ভবিষ্যতে আমিও এধরণের অপারেশনে শামিল থাকবো। এখন আমার নিবেদন হচ্ছে, তোমরা রাতে আমার মেহমানদারী কবুল করো। তার ভাইয়ের সহযোগী শতাধিক রুশ সৈন্য সন্তুষ্টচিত্তে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। বাহাদুর এবং হুশিয়ার সাঈদা দ্রুত রাতের খাবার তৈরী করে তাদের সামনে পেশ করলো। সুস্বাদু খাবার শেষে তারা প্রাণ ভরে মদ পান করে মাতাল হয়ে মরণ ঘুমে বিভোর হলো। সাঈদা যখন বুঝলো যে, প্রচন্ড মদের নেশায় তারা মরার মতো ঘুমাচ্ছে তখন সে ধারালো এক তলোয়ার নিয়ে একে একে একশ রাশিয়ান সৈন্যকে জাহান্নামের ঠিকানায় পাঠিয়ে নিজের ভাই আফযালকে বিন্দ্রি করে বলল, “ভাইজান! তোমার সাথীদের অবস্থা একটু ভাল ভাবে দেখে নাও।” আফযাল নিজ সাথীদেরকে খুনের দরিয়ায় মাখামাখি অবস্থায় দেখে প্রচন্ড ক্রোধে চিৎকার শুরু করে। মুজাহিদা সাঈদা বলল; “ভাইজান অযথা কেন ছটফট করছো? তোমার জন্যও একই পরিণতি অপেক্ষমান । আমি নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন দখলদার রাশিয়ান এবং দেশ বিক্রিকারী ব্যক্তিদেরকেও এমন করুণ ও অবমাননাকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে যা এখন তুমি নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছে। আমার মনে এই বিশ্বাসও আছে যে, মুসলমানের রক্ত বৃথা যেতে পারে না, এবং অবশ্যই আফগানিস্তান

একদিন স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।”

আফযাল বোনের অগ্নি মূর্তি দেখে তার নিকট করজোড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো, কিন্তু ঈমানদার বোন তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে “যদি আমি তোমাকে মাফ করে দিই তবু আমার আল্লাহ আমাদের দ্বীন, আমাদের মাতৃভূমি, এই যমীনের মাসুম বাচ্চা, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষের প্রবাহীত রক্ত তোমাকে মাফ করবেনা।” এই বলে সে তলোয়ারের অগ্রভাগ দিয়ে তার ভাইর দেহকে দ্বিখন্ডিত করে ঈমান ও দেশ প্রেমের প্রমাণ পেশ করলো। পরবর্তীতে গানশীপ হেলিকপ্টারের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে শাহাদত বরণ করে সাঈদা অন্যদের সামনে নজীরবিহীন ঈমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যায়।

মুজাহিদ কমান্ডার আহমাদী পারওয়ান প্রদেশের তেজাব নামক স্থানে এক ঘটনার উল্লেখ করেন; আমরা দুইশো মুজাহিদ দুশমনের এক ফৌজী কাফেলার উপর হামলা করলাম, যে কাফেলায় ৫০০ ট্যাংক ও সাজোয়া যান শামিল ছিলো। আমরা সেগুলোর মধ্য হতে ৭৩টিকে সমূলে ধ্বংস করলাম, এবং প্রায় দুশ ট্যাংক ও সাজোয়া যান অক্ষত অবস্থায় হস্তগত করলাম, যে গুলোর বেশীর ভাগ ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপ যোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত ছিলো। এছাড়া ২টি ১২২ মিলিমিটার কামান ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ও গনীমত হিসেবে আমাদের দখলে আসে। স্থানীয় লোকজন দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য করছিলো, তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, আমরা পরাজিত হবো। যুদ্ধ

শেষে দেখা গেলো আমাদের মধ্যে কেউ শহীদ তো দূরের কথা সামান্য যখমীও হয়নি। পেশোয়ারে খবর পাঠালে আমাদের সাথীরা হয়তো বিশ্বাস না ও করতে পারে ভেবে জানালাম যে, আমাদের কয়েক ভাই শহীদ ও যখমী হয়েছে। এই খবর পেশোয়ার পৌছার পর তারা শহীদ ও আহত লোকদের জন্য প্রয়াজোনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। কমান্ডার গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার সাহেবের সামনে হাযির হয়ে আমরা হাসতে লাগলাম, তিনি জানতে চাইলেন, “হাসার কারণ কি? উত্তর দিলাম, আমরা আপনাদের নিকট সঠিক সংবাদ পৌছাইনি, সঠিক সংবাদ পেলে হয়তো আপনারা আমাদেরকে বিশ্বাস করতেন না তাই শহীদ এবং যখমীর ব্যাপারে অসত্যখবর পাঠিয়েছি।

রুশ সৈনিকের মা মৃত সন্তানের চিঠি পেলেন

১৯৮৩ সালের ঘটনা রাশিয়ার মেকভ শহরের স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ হতে আফগানিস্তানে যুদ্ধে লিপ্ত এক রুশ সৈন্যের মা বাবাকে তলব করা হলো। সরকারী অফিসে পৌঁছার পর তাদেরকে মুখ বন্ধ একটি কফিন বক্স দিয়ে বলা হলো এর ভেতর তাদের মৃত সন্তানের লাশ আছে।

সরকারী কর্মকর্তা তাদেরকে বারবার তাগিদ দিলো যে, মুখ না খুলেই কফিনটিকে দ্রুত দাফন করে দাও। সরকারী ভাষ্যমতে নিহত এই সৈনিককে সেই বছরই অধিকৃত আফগানিস্তানে প্রেরণ করা হয়। বাগরামে তার অবস্থানের আট মাস অতিবাহীত না হতেই সে স্বপক্ষ ছেড়ে ইসলাম কবুল করে মুজাহিদদের

সাথে যোগ দেয়। মুসলমান হবার পর তার নাম রাখা হয় ইসলামুদ্দীন। তাকে নূরিস্তানে মুজাহিদদের ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়, সেখানে সে মৌলভী আব্দুর রাযযাকের নিকট প্রয়াজোনীয় ইসলামী তালীম সম্পন্ন করে। বাড়তি শিক্ষার জন্য নওমুসলিম রুশ সৈন্য পিরয়ান চলে যায়। শিক্ষা সমাপ্ত করে ইসলামুদ্দীন রাশিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নেবার ফয়সালা করে এবং কমান্ডার ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহ মাসুদের নেতৃত্বাধীন এক ব্রিগেডে প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। বাবা মার কথা ভেবে একদিন সে কমান্ডার আহমদ শাহ মাসুদের অনুমতি ক্রমে তাদের নামে নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারীত জানিয়ে চিঠি লেখে এবং কাবুলে অবস্থানরত জনৈক মুজাহিদের মাধ্যমে ডাক মারফত রাশিয়ায় পাঠায়। চিঠি পেয়ে তার বাবা মার বিস্ময়ের সীমা রইলনা। তারা দ্রুত সমাধিস্থলে গিয়ে সেই কফিন খুলে দেখতে পায় তার ভেতর মাটি ব্যতীত অন্য কিছু নেই। সঙ্গে সঙ্গে এই খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, হুকুমতের গোয়েন্দারা এসে তার পিতাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলো, তার গ্রেফতারীর বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকজন সংঘবদ্ধ হয়ে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য আন্দোলন শুরু করলো। ওদিকে ইসলামুদ্দীনের মাতা কাবুলের মুজাহিদের ঠিকানায় চিঠি লিখে তাকে সব কিছু অবগত করলো। চিঠিতে সে তার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখায় মুজাহিদদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। সে আরো লিখলো যে, তার সন্তান ইসলাম গ্রহণ করায় সে মোটে ও দুঃখিত নয়। চিঠির

উপসংহারে লিখলো, আমি তোমার সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করি ।

ইসলামুদ্দীন জানিয়েছে, যদিও মেকভ শহরের বাসিন্দাগণ খৃষ্টান ধর্মানুসারী কিন্তু তার পরিবার স্রষ্টার ব্যাপারে বিশ্বাস রাখেনা। ইসলামুদ্দীন নিজের বাবা মাকে ভীষণ ভালোবাসে, সে দোয়া করছে যে, একদিন যেন তার বাবা মা ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়।

রাশিয়ান সৈন্যদের মনে মুজাহিদ ভীতি ও বিজলীর পোষাক পরিহিত সৈন্যরা কোথায়?

মাওলানা মুহাম্মাদ সাহেব এবং জনাব মাসউদ কান্দাহারের বাসিন্দা। তারা বলেন, ১৯৮২ সালে ঈদুল ফিতরের পাঁচ দিন পর আমরা একদল রাশিয়ান সৈন্যের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে গ্রেফতার করলাম । স্বাভাবিক হবার পর তারা জানতে চাইলো “সেই লোকেরা কোথায়? যারা তোমাদের সাথে ছিলো, যাদের পরিধানে বিজলীর পোষাক শোভা পাচ্ছিলো। যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদেরকে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করলো।” আমরা বললাম, এমন কোন লোকের ব্যাপারে আমাদের কিছুই জানা নেই।

রাশিয়ানরাও কারামতের কথা বলে

জনাব ইসমাঈল আবুজার বর্ণনা করেন, ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে দুই রাশিয়ান সৈন্য এক পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাতকারে স্বীকার করেছে যে, আমরা আফগান যুদ্ধে এমন কিছু ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি যা সাধারণ

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা বিবেচনায় পাওয়া যায় না। যেমন একবার মুজাহিদগণ আমাদের কাফেলার উপর হামলা করলো। কাফেলার সাথে প্রচুর সংখ্যক ট্যাংক ও সামরিক যান গুলো অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলো। মুজাহিদরা আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে আহবান জানালো, জবাবে আমরা তাদের উপর হামলে পড়লাম। এবার চতুর্দিক থেকে আমাদের উপর পাল্টা হামলা শুরু হলো, অথচ আমরা কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

“আল্লাহু আকবার” ধ্বনিতে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি

মুজাহিদ রহমাতুল্লাহ বলেন, একদা আমরা একজন রুশ সৈন্যকে আটক করি ।তার নাম ফিজাভ। সে বলল, “আমরা তোমাদের মেশিনগান কিংবা অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রকে মোটেই ভয় পাই না। কিন্তু তোমাদের “আল্লাহু আকবার” ধ্বনিতে আমাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। এটা কেমন ধরণের জঙ্গী হাতিয়ার তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছো।”

আল্লাহু আকবারের কোন প্রতিরোধক নেই

একবার মৌলভী নূর মুহাম্মাদ আফগান ইসলামী হুকুমতের প্রধান মন্ত্রী জনাব আব্দুর রাসূল সাইয়াফের সাথে জিহাদ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। কথা প্রসঙ্গে জনাব সাইয়াফ একটি মজার ঘটনা শুনালেন। আফগান জিহাদ চলাকালীন রাশিয়ান সামরিক কর্মকর্তাগণ তাদের সরকারের নিকট আবেদন জানালো যে, আফগান মুজাহিদগণ আমাদের

বিরুদ্ধে “আল্লাহু আকবার” নামক এক বিস্ময়কর অস্ত্র প্রয়োগ করছে যার কোন প্রতিরোধক আমাদের নিকট নেই। যেহেতু রাশিয়ান সরকার ইতোপূর্বে এই নামে কোন অস্ত্রের খবর জানতে পারেনি। সুতরাং তারা আফগান পুতুল সরকারের নিকট খবর পাঠালো যে, অনতিবিলম্বে ‘আল্লাহু আকবার' নামক অস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাঠানো হোক, যেন রুশ বিজ্ঞানীরা এর প্রতিরোধক অস্ত্র উদ্ভাবন করতে পারে। অতঃপর আফগান সরকার আল্লাহু আকবার সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করলো এবং তারাও এর কোন রকম প্রতিরোধক উদ্ভাবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো ।

তারা মানুষ নয়

বদখশা এলাকার আজু নামক স্থানের মুজাহিদ সংগঠক জামাল নাসের বলেন, একবার আমরা সদলবলে বদখশা যাচ্ছিলাম। যখন আমরা বাগলান জেলার দিরাঈ এবং লিয়ান এর মধ্যস্থ রাস্তা অতিক্রম করছিলাম তখন সামনে মোর্চা ও ঘাঁটি গেড়ে বসা রাশিয়ান সৈন্যদের সাথে আমাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়। দুশমন সংখ্যায় অনেক বেশী ছিলো। মাথার উপর জঙ্গী বিমান বোমা বর্ষণ করছিলো, নীচে ট্যাংক, সাজোয়া যান এবং মর্টার অবিরাম গোলা নিক্ষেপ করছিলো। এভাবে তের দিন যুদ্ধ চলতে থাকলো। অবশেষে তাদের প্রতিনিধি এসে প্রস্তাব করলো, আমরা তোমাদের যাবার রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছি,

বিনিময়ে আমাদের সেই ত্রিশ সহযোদ্ধাকে ছেড়ে দাও যাদের তোমরা আটক করেছে। রুশ প্রতিনিধিকে জবাব দিলাম, আমরা তোমাদের কোন সঙ্গীকে আটক করিনি বরং যুদ্ধ চলাকালীন প্রবল বৃষ্টি ও পাহাড়ী স্রোত হয়তো তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তখন তারা স্বীকার করলো যে, এই যুদ্ধে রাশিয়ান ও আফগান যৌথ বাহিনীর প্রায় পাঁচ শত সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে এবং দুটি জঙ্গী বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। রাশিয়ান সৈনিকদের মতে, মুজাহিদরা মানুষ নয় বরং জ্বিন-ভূত জাতীয় কিছু হবে।

রাশিয়ানদের মনে আচমকা ভীতি

আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার সামনে কোন শক্তিই দাঁড়াতে পারেনা, তিনি যাবতীয় ক্ষমতার মালিক। আফগান যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যস্ত রাশিয়ান সৈন্যদের মনে মুজাহিদদের ব্যাপারে এতো ভয়ের জন্ম নেয় যে, তারা সাধারণ আফগানদের মাধ্যমে কুরআনের লিখিত তাবীজ সংগ্রহ করে গলায় ঝুলানো শুরু করে, কেউ কেউ হাতেও বেঁধে রাখে, অনেকে নিজেদের আবাসস্থলে কুরআন শরীফ সংরক্ষণ করে। অবস্থা দৃষ্টে রাশিয়ান সামরিক কর্মকর্তাগণ আশংকা প্রকাশ করলেন যে শেষে আবার না আমাদের সৈন্যরা সদল বলে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলছে? যেখানে ইসলামের পিতা নিজ পুত্রকে মাফ করেনা, আর নারীরা তো ত্যাগের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বহু স্থানে। এক রুশ সেনা বর্ণনা করেন যে,

কাবুলে ছাত্রীরা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। তাদের হাতে কোন ঝান্ডা ছিলো না, এক তরুনী নিজের সবুজ ওড়না খুলে সেটিকেই ঝান্ডা বানিয়ে নেয়। তারা রাশিয়া এবং বারবাক কামালের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। আমরা গুলী চালিয়ে কয়েকজন ছাত্রীকে গুরুতররূপে যখমী করি, কয়েকজন শহীদ হয়ে যায়। ঝান্ডা বুলন্দকারী ছাত্রীর ডান হাত উড়ে গেলে সে বাম হাতে ঝান্ডা উঁচু করে রাখে। বাম হাত গুলীতে অচল হলে সে উভয় বাহু দিয়ে ঝান্ডা উঁচুতে তুলে ধরার চেষ্টা চালায় এরপর সে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলে আরেক ছাত্রী ঝান্ডা হাতে তুলে নেয়। আহত ছাত্রীদেরকে আমরা এ্যাম্বুলেন্সে তুলে হাসপাতালে নিতে চাইলে তারা আমাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করে বলতে থাকে; “আমরা নাপাক কাফেরদের হাতে চিকিৎসা গ্রহণ করবোনা। আমরা এই সড়কে মরে পড়ে থাকবো, কিন্তু কোন কাফের আমাদের দেহ স্পর্শ করবে তা মেনে নেবো না। ” তাদের এমন বেয়াদবী পূর্ণ কথা শুনে অফিসারের নির্দেশে সকল আহত ছাত্রীকে গুলীর তোড়ে উড়িয়ে দেয়া হলো।

ক্লান্ত মুজাহিদকে পিঠে বহন করলো কমিউনিস্ট কয়েদী

গুল রহমান ১৮ বছর বয়সী এক নওজোয়ান,
সে একদিনে পঞ্চাশ কমিউনিস্টকে জাহান্নামের পথ দেখায়।

নূর মুহাম্মাদ তারাকীর শাসনামলে ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে সে জিহাদে শরীক হয়

এবং ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। সে একবার ট্যাংকের নীচে বারুদ রেখে সেই ট্যাংকটি উড়িয়ে দেয়। তখন তার বয়স ছিলো মাত্র দশ বছর। গুল রহমানের ব্যাপারে তার ছাউনীর কমান্ডার আসাদুল্লাহ বলেন, সে মানবরূপী এক সিংহ। আমি আফগান জিহাদে তার ন্যায় দুরন্ত সাহসী মুজাহিদ একজনও দেখিনি। একদিন সে এক কমিউনিস্ট লিডারকে রাইফেলের সাহায্যে পাকরাও করে। কিছুক্ষণ পর তাকে বলে আমি ভীষণ ক্লান্ত আমাকে কাঁধে উঠিয়ে চলো। মজার ব্যাপার হলো অর্ধরাস্তা পর্যন্ত কয়েদী তাকে কাঁধে বহন করে নিয়ে আসে। যখন কয়েদী তাকে কাঁধ থেকে নীচে নামায়, কালবিলম্ব না করে গুল রহমান রাইফেলের গুলীতে তার খুলী উড়িয়ে দেয়।

১২ এপ্রিল ১৯৮৬

রাশিয়ান বাহিনী উসামা বিন যায়েদ ছাউনীর উপর হামলা করে নিজেদের দখলে নিয়ে সেখানে মোর্চা বানিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। আচমকা ছাউনীর আত্মগোপনকারী ৫০ জন সিংহ হৃদয় মুজাহিদ খোলা ময়দানে বেরিয়ে দুশমনের উপর পাল্টা হামলা চালায়। তাদের মাঝে আসাদুল্লাহ, গুল রহমান, জাফর, শের মুহাম্মাদ এবং মুস্তাকীম উল্লেখ যোগ্য। তাদের প্রবল আক্রমণে রাশিয়ানরা ছাউনী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে মুজাহিদদের বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় গুল রহমানকে হারানোর মাধ্যমে।

দুশমনের নিক্ষিপ্ত গুলী গুলরহমানের সিনায় বিদ্ধ হয় এবং সে শাহাদতের অমীয়

সুধা পানে ধন্য হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, শাহাদতের পরেও রাইফেল হাতে নিয়ে গুল রহমান ফায়ারিং এর পজিশনে বসে থাকে। সে জীবিত আছে মনে করে কোন রাশিয়ান তার নিকট ঘেষতে সাহস করেনি।

আসাদুল্লাহ বলেন, তার শাহাদতের চার ঘন্টা পর আমি তার কাছে গিয়ে দেখি তখনো সে পজিশন নিয়ে বসে রয়েছে। তার চেহারায় মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। আমি আজ পর্যন্ত তার ন্যায় অন্য কোন শহীদের দেখা পাইনি। আল্লাহ কান্দাহারের সিংহকে জান্নাত দান করুন এবং আমাদের তার উত্তম বদলী প্রদান করুন। আমীন!

মুজাহিদের প্রতাপ

তোমরা পৃথিবীর বুকে হতাশ ঘুরছো আর ভাবছো আমরা কী করতে পারি? ময়দানে একবার নেমেই দেখোনা যে তুমি কী করতে পারো, আল্লাহ কিভাবে তোমার মদদ করেন। আমাদের এক কমযোর মুজাহিদ, জীর্ণশীর্ণ স্বাস্থে্যর কারণে তার হাড্ডিগুলো গণনা করা যায়। যখন সে খোস্তে এক ছাউনী দখল করার পর ভেতরে প্রবেশ করল তখন দুশমনের বড় এক কমান্ডার তাকে দেখা মাত্র ভয়ে অচেতন হয়ে পড়ে। তার শিরায় হাত রেখে দেখা যায় সে মৃত্যুর দুয়ারে পা রেখেছে। মুজাহিদের মুখ দেখেই কাফের মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মুজাহিদগণ দুশমনের ট্যাংক লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারে, মুহূর্তের মাঝে ট্যাংক ছাই ভস্মে পরিণত হয়।

মুজাহিদের দোয়া

হরকতে ইনকিলাবে ইসলামীর সিপাহ সালার মাওলানা আরসালান রহমানী আমাকে বলেছেন (সমগ্র আফগানিস্তানে মুজাহিদ কমান্ডার হিসেবে মাওলানা আরসালানের নাম শীর্ষ কাতারে উচ্চারীত হয়। রাশিয়ানদের মনে তার ব্যাপারে এমন ভীতি ও প্রভাব জন্ম নেয় যে তারা সৈনিকদেরকে তার ব্যাপারে আলাদা ভাবে সতর্ক করে দেয় যে, সে জ্যান্ত মানুষের গোশত খায়) “এক যুদ্ধে আমাদের নিকট ট্যাংকের মোকাবিলায় স্রেফ একটি রকেট লাঞ্চার এবং তার শুধু মাত্র একটি গোলা ছিলো। আমরা প্রথমে নামায পড়লাম এবং আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানালাম যে, আমাদের এই একটি গোলা যেন দুশমনের উপর বিস্ফোরিত হয়। ফরিয়াদ শেষে দুশমনের অবস্থান লক্ষ্য করে রকেট লাঞ্চার ছুড়ে মারলাম, সেটি সোজাসুজি দুশমনের গোলাবারুদ পূর্ণ ট্রাকে আঘাত হানে, ফলে ট্রাকের গোলা বারুদে আগুন ধরে যায় এবং একে একে ৮৫টি ট্যাংক ও অন্যান্য সাজোয়া যান ভস্মীভূত হয়, দুশমন বিপুল পরিমাণ ক্ষয় ক্ষতির কারণে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। গনিমত হিসেবে আমরা বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ হস্তগত করি।”যে নওজোয়ান সেই রকেট লাঞ্চারটি নিক্ষেপ করেছিলো পরবর্তীতে আমি তার সাক্ষাত লাভ করেছিলাম।

পুরো যুদ্ধে একটি গুলী চালাতে হয়নি

ভাই ওয়াকার আহমাদ এক বিস্ময়কর ঘটনা শুনালেন, “বৃষ্টির ন্যায় গুলী

বর্ষণের মুখে আমি নিরাপদ অবস্থানে বসে কালাশনিকভের লক খুলছিলাম। আচানক সামনে এক কামরায় দেখতে পেলাম তিন দুশমন সেনা লুকিয়ে আছে। আমি দরজার সামনে গিয়ে হাক ছাড়লাম (তাসলীম শাহ) অস্ত্র ফেলে দাও। আমার আওয়ায শোনামাত্র তারা হাত উঠিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে সামনে এসে দাড়ালো। এভাবে আরো কয়েকজন সৈন্যকে গ্রেফতার করলাম, কিন্তু এই যুদ্ধে আমাকে একটি গুলীও চালাতে হয়নি, অথচ আমি সামনে সামনে ছিলাম।

রাশিয়ান সৈনিকের সাক্ষাতকার

কাবুল ফেরত এক সৈন্যকে রাশিয়ান টেলিভিশনে হাযির করা হলো। আফগান যুদ্ধ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলতে লাগলো, “মুজাহিদদের আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনামাত্র অনেক রুশ সৈন্য প্রস্রাব করে কাপড় ভিজিয়ে ফেলে। টিভির সরাসরি সাক্ষাতকার পুরো রাশিয়ায় সম্প্রচারিত হচ্ছিলো। আফগান মুজাহিদগণ গর্বাচেভের ক্ষমতার মসনদ তো উল্টে দিলেনই, বরং পুরো পৃথিবী থেকে কমিউনিজমের ভূত বিদূরীত হলো।

কমিউনিস্ট নীতি নির্ধারকগণ গর্বাচেভ কে বুঝালো যে, ধর্ম আফিমের ন্যায় এক নেশার বস্তু, যা জাতিকে মাতাল করে দেয়। কিন্তু এখন তাদের দয় হয়েছে যে, ধর্মানুরাগী মুসলমানগণ তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার কওমকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের অন্যতম প্রধান পরাশক্তি ছিলো, ভেঙ্গে

টুকরো টুকরো হয়ে গেলো । নাস্তিকেরা বিশ্বাস করতো যে, ধর্ম সেই ব্লটিং কাগজের ন্যায় যা কওমের খুনকে শুষে নেয়। কিন্তু গর্বাচেভ অনুভব করেছেন যে, সেই ধর্মানুরাগী আফগানরাই মহাশক্তিধর কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়া ও তাদের দুর্ধর্ষ ফৌজকে নাকানী চুবানী খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

ফৌজী অফিসার ভেজা বেড়ালের ন্যায় চৌকীর নীচে লুকালো

মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, “যুদ্ধ চলাকালীন দুশমন অবস্থানের এক কামরায় আমি প্রবেশ করতে চাইলে উবাইদুল্লাহ এবং তাহির সতর্ক করে বলল, আপনি ঐ কামরা থেকে দূরে থাকুন, ভেতর থেকে ফায়ারিং করা হচ্ছে। তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে আমি কামরার ভেতরে এক হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে মারলাম, কিছু সময় পর আরেকটি ছুড়লাম, এরপর ভেতরে প্রবেশ করলাম। কামরায় লোড করা একটি কালাশনিকভ পড়ে থাকতে দেখলেও কাছাকাছি কোন মানুষের দেখা পেলাম না। কালাশনিকভ হাতে উঠিয়ে চারদিকে সন্ধানী চোখ বুলিয়ে দেখলাম এই ঘাঁটির প্রধান অফিসার খাটের তলায় চুপচাপ শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ পূর্বে সেই মুজাহিদদের লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ছিলো। এখনো তার হাতে কালাশনিকভ থাকলেও সে বিড়ালের ন্যায় গুটিশুটি মেরে লুকানোর চেষ্টা করছিলো, আমি মুহর্তমাত্র বিলম্ব

না করে কালাশনিকভের গুলীতে তাকে জাহান্নামের পথ দেখালাম।”

অত্যাধুনিক অস্ত্রধারী খঞ্জরের সামনে অসহায়

কমান্ডার মাওঃ আব্দুল কাইয়ুম আরেকটি ঘটনা শুনালেন, দুশমনের কামরায় বাংলাদেশী ভাই আলী আহমদ প্রবেশ করলেন। দেখলেন লোড করা কালাশনিকভ নিয়ে দুই সৈন্য ঘাপটি মেরে বসে আছে। আলী আহমদ রকেট লাঞ্চার চালাতেন, তাই তার নিকট কালাশনিকভ কিংবা অন্য কোন রাইফেল ছিলোনা। তিনি দ্রুত খঞ্জর বের করে রাশিয়ান সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হলেন। আল্লাহর কী কুদরত যে, তাকে দেখামাত্র অত্যাধুনিক অস্ত্র সত্ত্বেও রাশিয়ান সৈন্যরা থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলো। ইতোমধ্যে আমিও সেই কামরায় প্রবেশ করলাম এবং তাদেরকে বেঁধে বাহিরে নিয়ে এলাম।

রাশিয়ানদের স্বীকারোক্তি

ইসমাঈল আবুজর বলেন, ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে দুই রুশ সৈনিক সাংবাদিকদের নিকট স্বীকার করেন যে, আমরা আফগান যুদ্ধে বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য অসংখ্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। একবার অসংখ্য ট্যাংক সহ আমাদের এক কাফেলা হিরাতের পথে চলছিলো। আচমকা মুজাহিদ বাহিনী আমাদের পথ আটকে বলল তোমরা আত্মসমর্পণ করো। এই কথাকে দুঃসাহস মনে করে আমরা তাদের উপর হামলা চালালাম। কিছু সময়ের মধ্যেই আমরা নিজেদের ভুল

বুঝতে পারলাম। চতুর্দিক থেকে আমাদের উপর বৃষ্টির ন্যায় গোলা বর্ষণ শুরু হলো। কে গুলী করছে অথবা কোন দিক থেকে গুলী আসছে আমরা ঠাওর করতে পারছিলাম না। সামান্য হামলায় আমাদের ট্যাংক গুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলো এবং আমরা হাতিয়ার ফেলে দিতে বাধ্য হলাম।

রাশিয়ান সৈন্যদের সন্ত্রস্ততা

যামাখোলা এবং আরগুন সেক্টরে শোচনীয় পরাজয়ের পর যখন রাশিয়ান ও নজীবুল্লাহর ফৌজ লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছিলো তখন তাদের ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা দেখে ধারণা করা যেতো যে তাদের মনে মুজাহিদদের ব্যাপারে কী ধরণের ভূত সওয়ার হয়েছে সেই সাথে কতো দ্রুত তারা পলায়ন করছিলো তাও দেখার মতো এক দৃশ্য ছিলো। হরকাতুল মুজাহিদে ইসলামীর দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধা করাচীর বাসিন্দা খালিদ মাহমুদ বলেন, আমরা যামাখোলা পোস্টে প্রবেশ করে সৈন্যদের প্রবল ভয়ার্ত ও অনুভূতিহীন অবস্থায় দেখতে পাই।

(১)এক কামরায় মেঝেতে দেখলাম কাগজ পড়ে আছে, তার উপর কয়েক ছত্র লেখা হয়েছে, কলমও পাশেই পড়ে আছে। এটি একটি অসম্পূর্ণ চিঠি যা জনৈক সৈনিক তার প্রিয়জনের নিকট লিখছিলো। বাক্য তখনো পূর্ণ হয়নি। মুজাহিদদের আগমন টের পেয়ে চিঠি পূরো করা তো দূরের কথা কলম ও সরাতে পারেনি, তার আগেই পালানোর রাস্তা ধরেছে।

(২)দ্বিতীয় কামরায় এর চেয়েও আশ্চর্যজনক দৃশ্য চোখে পড়লো । এক প্লেটে

পোলাউ পড়ে ছিলো, যেখান থেকে তিন চার চামচ খাওয়া হয়েছে। আরেক কামরায় দুধে পূর্ণ গ্লাস পড়ে ছিলো। কোন কোন কামরায় তাশের কাগজ ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। দেখে মনে হচ্ছিলো, মুজাহিদরা তাদের উপর চড়াও হয়েছিলো। তাদের মনে মুজাহিদদের ব্যাপারে এমন ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হলো যে, তারা যে যেই হালতে ছিলো সেই হালতে পলায়নের মাঝে নিজের কল্যাণ মনে করেছে।

(৩) যামা থেকে পলায়নপর এক ফৌজী অফিসার আরগুন পৌছে বললেন, “জানিনা এই গেরিলা যোদ্ধারা কোন ধাতুতে গড়া, যারা গোলা বারুদের কোন রকম পরোয়া করেনা। মাইন বিস্ফোরিত হলে তাদের অগ্রযাত্রা ব্যহত হয় না, কামানের গোলাও তাদের মনে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনা । আমাদের সৈন্যদের ধরে ধরে তারা খেয়ে ফেলছে, পায়ের আঘাতে আমাদের মোর্চাগুলোকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিচ্ছে।”

(৪) এখানে আশ্চর্যজনক একটি ব্যাপার ঘটলো। কমান্ডার খালিদ যুবায়ের বলেন, আমরা দুজন সেনাকে এক কামরা থেকে আটক করি। তাদের মধ্যে একজন প্রচন্ড ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাচ্চাদের ন্যায় কান্নাকাটি করছিলো। তাকে অনেক বুঝালাম যে, আমরা তোমাকে কিছুই বলবো না, ভয় পেওনা চুপচাপ বসে থাকো। কিন্তু ভয়ার্ত এই সৈনিক অনবরত কেঁদেই চলছে। করাচীর ভাই খালিদ মাহমুদ তাকে সান্তনা দেবার জন্য নিজের সীনার সাথে লাগিয়ে তার কপালে চুমু খেলেন এবং বললেন, ভয় পেওনা আমরা তোমাকে কোন শাস্তি

দিবোনা। দূর থেকে পলায়নপর এক সেনা এই দৃশ্য দেখে চিৎকার শুরু করলো যে, তারা মানুষ খোর। সে আরগুন ক্যাম্পে গিয়ে এই খবর ছড়িয়ে দিলো যে, মুজাহিদরা জ্যান্ত মানুষ চিবিয়ে খায়, আমি নিজের চোখে তা দেখেছি, আরগুন ছেড়ে চলো যাই, অন্যথায় তারা এখানে এসে হাযির হবে, আর আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে। তার এই প্রচারণার ফলে গোটা আরগুন ক্যাম্পের ফৌজের মাঝে প্রচন্ড ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

খোলা মরুভূমিতে পালংক

মুজাহিদ আব্বাস আমাকে এই ঘটনা শুনালেন; কিছু সংখ্যক মুজাহিদ এক স্থানে সমবেত হয়ে পরামর্শ করছিলেন, হঠাৎ ট্যাংক ও জঙ্গী বিমান নিয়ে রাশিয়ান বাহিনী আমাদের উপর চড়াও হয়। কিছু মুজাহিদ ট্যাংকের ঘেরাও ভেদ করে নিরাপদ দূরত্ব বেছে নিতে সক্ষম হলেও আমরা ছয়জন মুজাহিদ এক টিলার আড়ালে বসে মৃত্যু অথবা সেখান থেকে বের হবার ইন্তের করছিলাম। এভাবে ভুখ পিপাসা অবস্থায় তিন দিন কেটে গেলো। চতুর্থ দিন আল্লাহ তায়ালা সেখানে প্রবল বৃষ্টি দান করলেন। বৃষ্টি আমাদের দুর্ভাবনা ও বিপদাশংকার মেঘ কাটিয়ে দিলো, দেহ-মনে নতুন সজীবতা ফিরে এলো।

আব্বাসের ভাষায়, এই আচমকা বৃষ্টি কিভাবে এলো আমরা বলতে পারবোনা। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আকাশ সহসা মেঘে পূর্ণ হয়ে অঝোর ধারায় আমাদের উপত্যকা ভিজিয়ে দিলো। প্রথমে তো আমরা ভাবলাম যে, বিমান

থেকে হয়তো আমাদের উপর বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

পশ্চাদপসরনের সময় আমরা এক যখমী ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে তাকে উঠিয়ে চলতে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে আমাদের এক সহযোদ্ধা ভাই বেহুশ হয়ে যান। অবস্থা দৃষ্টে যখমী ব্যক্তি দোয়া করলো, হে আল্লাহ! “আমাদের জন্য এমন কোন বাহন পাঠাও যার উপর সওয়ার হয়ে আমরা নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারি। দোয়া শেষে আমরা বিরাণ মরুভূমি ধরে এক কিলোমিটার সামনে যেতেই নতুন একটি পালংক পড়ে থাকতে দেখলাম। আমরা যখমীকে তার উপর বসিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিলাম।

আমরা মনে মনে চাচ্ছিলাম উট বা এই জাতীয় কোন সওয়ারী মিললে তাতে করে যখমীকে পাকিস্তান সীমান্তে পৌঁছে দেবো। আমাদের এই আশা পূর্ণ না হলেও একটু পর একদল মুজাহিদের সাক্ষাত লাভ করলাম, তারা ভাই আনোয়ার উল্লাহকে পাকিস্তান সীমান্তের দিকে নিয়ে গেলেন।

ঘন কালো মেঘের জঙ্গী বিমানের সামনে প্রতি বন্ধক রূপে দাঁড়িয়ে যাওয়া

পাগমানের কাযী গোলাম রব্বানী বলেন, আমরা কতিপয় মুজাহিদ একস্থানে জমা হলাম। অকস্মাৎ রাশিয়ান জঙ্গী বিমান উড়ে এসে আমাদের উপর বিরামহীন বোমা বর্ষণ শুরু করলো। আমরা ভাবলাম জীবনের অন্তিমলগ্নে পৌছে গিয়েছি। আচমকা ঘনকালো মেঘ এসে

চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিলো। কিছুক্ষণ না যেতেই প্রবল বর্ষণ শুরু হলো, কেউ যেন চতুর্দিকে অমাবশ্যার রাতের ন্যায় কালো পর্দা বিছিয়ে দিলো। অন্ধকারের সুযোগে জঙ্গী বিমানের চোখ ফাকি দিয়ে আমরা সেখান থেকে কেটে পড়লাম।

আলোক রশ্মি আমায় পথ দেখিয়েছে

সারখাব প্রশিক্ষণ শিবিরের জিবরানগুল আমায় জানালো, আমি পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন ত্রিমঙ্গল নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম । এসময় আমার নিকট সংবাদ এলো সামরিক কনভয় লোগড়ের কাছাকাছি পৌছে গেছে। আমি অনতিবিলম্বে লোগড় পৌছতে চাইলাম যেন সেখানকার মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করতে পারি । কালবিলম্ব না করে ত্রিমঙ্গল থেকে রওয়ানা করলাম এবং সন্ধ্যা নাগাদ দুবান্দি পৌছলাম । দুবান্দি পৌছে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, রাত টুকু সেখানেই কাটাবো। কারণ রাস্তা অনেক লম্বা এবং রাতের আকাশ ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছিলো। পরক্ষণে ভাবলাম, এটি কেমন কথা হবে যে আমার সহযোদ্ধা ভাইগণ শক্ৰবেষ্টিত অবস্থায় থাকবে আর আমি এখানে আরামে ঘুমাবো। সুতরাং আমি আবার পথ চলতে শুরু করলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমার সামনে সরু এক আলোকরশ্মি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ডানে বামে ভালভাবে তাকিয়ে এই আলোর কোন উৎসের সন্ধান পেলাম না। তখন আমানুল্লাহ ও আরো দুই মুজাহিদ আমার সাথে ছিলো। তারা জানতে চাইলো এই তীব্র অন্ধকারের ভেতর তুমি এতো

দ্রুত রাস্তা চিনে কিভাবে হাটছে? উত্তরে আমি কিছুই বললাম না। তারা আবারো প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিলাম এই রাস্তা সম্পর্কে আমার পূর্ব ধারণা আছে। এভাবে আলোক রশ্মি সারা পথ আমার সামনে চললো। রাত দুইটায় আমরা ছোট্ট শহর যারউনের মসজিদে পৌছে ইমাম সাহেবকে বিনিদ্র করে তার নিকট সামরিক কনভয় সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা কাল আসরেরওয়াক্তে দুশমন বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিয়েছেন। জিবরান গুল এই ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে কসম খেতে প্রস্তুত। মুজাহিদ বাবর আমাকে এই ঘটনা শুনালেন; ১৯৮৬ সালের ২৯ জুলাই রাশিয়ান সৈন্যদের সাথে এক যুদ্ধে দুই রুশ সৈন্য আমার একদম নিকটে পৌঁছে যায়। তারা আমাকে জীবিত গ্রেফতার করতে চাচ্ছিলো আমি তাদের উদ্দেশ্যে গুলী ছুড়লেও সেগুলো তাদের দেহে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়। আমি ক্ষণিকের জন্য ভয় পেলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আমার এই ভীতি দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে আমি আবার ফায়ার করতেই তারা উভয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হলো। আমার চেয়ে ত্রিশ মিটার দূরে আরো তিন রুশ সেনা উপস্থিত ছিলে, সামনের দুজনকে খতম করে এবার তাদের দিকে মনোনিবেশ করলাম।এক আক্রমণে সেই তিনজনকেও জাহান্নামের পথ ধরালাম। ইতোমধ্যে এক ট্যাংক আমার সামনে হাযির হয়, তার তোপের নালা আমার কয়েক ফুট দূরত্বে পৌছে যায়। এখন ট্যাংক থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় এই যে লাফ দিয়ে তার উপর চড়ে বসবো। আমার ভাবনা পূর্ণ না হতেই ট্যাংক পিছপা হতে শুরু করলো। আমার নিকট রকেট লাঞ্চার

থাকলেও নিক্ষেপ করার মতো রকেট ছিলোনা । আমার হাতে কালাশনিকভ ছিলো কিন্তু তা দিয়ে ট্যাংক অকেজো করা সম্ভব নয়। মুক্তির পথ ভাবতে ভাবতেই আমি কিভাবে যেন পার্শ্ববর্তী প্রায় ২৫ মিটার উঁচু প্রাচীরের উপর পৌছে গেলাম । সাধারণ অবস্থায় এই প্রাচীরে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আজ পর্যন্ত আমি এই রহস্যের কুল কিনারা খুঁজে পেলাম না যে, চোখের পলকে কিভাবে আমি সেই প্রাচীরে চড়লাম। প্রাচীর থেকে নেমে দ্রুত মুজাহিদদের কাছে গেলাম এবং রকেট নিক্ষেপ করে তিনটি ট্যাংক ধ্বংস করলাম।

শৈত্য প্রবাহ মুজাহিদদের বাঁচিয়ে দিলো

ইহসানুল্লাহ আমার সামনে বর্ণনা করেছেন যে, আমি মানতিকা, শিকাল ও জাজী প্রভৃতি যুদ্ধ ক্ষেত্রে কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছিলাম। একটি অপারেশন সম্পন্ন করে ফেরার পথে দুইশত সহযোদ্ধা সহ এক গ্রামে আশ্রয় নিতে চাইলাম, কিন্তু গ্রামের লোকজন হুকুমতের ভয়ে আমাদেরকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করলো। বাধ্য হয়ে আমরা খোলা ময়দানের উদ্দেশ্যে ছুটলাম। সেখানে বসে দুটি গরুর বাছুর খরিদ করে ভুনা করে ক্ষুধা নিবারণ করলাম।

ইত্যবসরে হুকুমতের পাঁচশত সশস্ত্র মিলিশিয়া আশপাশের পাহাড়ী টিলার উপর আমাদের অজ্ঞাতসারে পজিশন নেয়। অকস্মাৎ আল্লাহ রাব্দুল আলামীনের দয়ায় প্রচন্ড শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়। শীতের এমন তীব্রতা

ইতোপূর্বে আমরা কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। ঠান্ডার প্রকোপে আমাদের সবার মাথা ব্যথা হয়ে যায়। আমরা মানতিকা ছেড়ে গন্তব্যের দিকে রওয়ানা দিতে বাধ্য হই। এভাবে আল্লাহ আমাদের সকলকে বাঁচিয়ে দেন। শৈত্য প্রবাহ শুরু না হলে নিশ্চয়ই মিলিশিয়াদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধতো। যেখানে মিলিশিয়ারা আমাদের চেয়ে সুবিধাজনক স্থানে ছিলো ।

লোগড়ে আবু বকর সিদ্দীক গ্রুপের কমান্ডার হেদায়েতুল্লাহ বলেন, আমরা তাবারাহ পাহাড়ে সুড়ঙ্গ খনন করছিলাম, আচমকা প্রায় ১০০ ট্যাংক ও ৫০টি সামরিক গাড়ী সহ দুশমনের সুসজ্জিত এক কাফেলা সেই পথ ধরে এগিয়ে আসে। আমাদের মাঝে দেড় ঘন্টার মতো যুদ্ধ চললো, তেরোটি গাড়ী হারিয়ে দুশমন পিছু হটে যায়। এটি ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরের কথা, যখন আমরা সর্বসাকুল্যে এগারাজোন মুজাহিদ সেখানে ছিলাম।

ধোঁয়া মুজাহিদদের সাহায্য করলো

আব্দুল জব্বার বর্ণনা করেন যে, রাশিয়ান ট্যাংক গুলো মুনকীতাকা নামক স্থানে আমাদের উপর হামলা চালায় এবং আমাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, ছয়জন মুজাহিদ শহীদের তালিকায় নাম লিখায়। আমরা তাদের লাশ উঠিয়ে নিতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু স্থলে ট্যাংক এবং আকাশে জঙ্গী বিমান প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রবল ভাবে

তাদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছিলো, কোনভাবে লাশ সরানো সম্ভব হচ্ছিলোনা। কিন্তু নিজেদের শহীদ সহযোদ্ধাদের লাশ সরিয়ে নেবার ব্যাপারে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম চতুর্দিক প্রচন্ড ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে, নিঃসন্দেহে এই ধোঁয়া আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য হিসেবে এসেছিলো। আমরা ধীরস্থিরভাবে শহীদদের লাশ উঠিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে এলাম।

মেঘ ছড়িয়ে পড়লো

মুআল্লিম তুর জানিয়েছেন, আমরা অস্ত্র ও গোলাবারুদে পূর্ণ এক কাফেলার সাথে লোগড় যাচ্ছিলাম। রাস্তায় তিন কিলোমিটার বিস্তৃত এক শত্রু ছাউনী অতিক্রম করতে হতো। সেই ছাউনী সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় ছিলো না। আমরা রাতের বেলা উল্লেখিত ছাউনীর নিকট উপস্থিত হলাম। আকাশে চাঁদ চমকাচ্ছিলো, শংকা ছিলো যে কোন মুহূর্তে দুশমন সেনা আমাদের ঘিরে ফেলতে পারে। কিন্তু আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে চলতে চলতে ছাউনীর কাছে পৌছা মাত্র আমাদের মাথার উপর একটুকরা ঘন কালো মেঘ কোথা হতে যেন উদয় হলো। মেঘের আড়ালে চাদ হারিয়ে গেলো, আর আমরাও নিরাপদে ছাউনীর লাগোয়া পথ অতিক্রম করলাম । ছাউনী ছেড়ে কিছু দূর অগ্রসর হতেই মেঘ উধাও হয়ে গেলো।

হতাশ মুজাহিদদের জন্য আল্লাহর মদদ

এটি সহ পরবর্তী পাঁচটি ঘটনা কমান্ডার সায়্যিদুর রহমান বর্ণনা করেছেন। সায়্যিদুর রহমান গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হিযবে ইসলামীর দায়িত্বশীল ছিলেন। ৪০ বছর বয়সী সায়্যিদুর রহমান কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকোনমিক্স এ মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। তিনি খোরওয়াটি গোত্রভুক্ত। ছোট বেলায় লোগড়ে দিন কাটিয়েছেন। নূর মুহাম্মাদ তারাকীর বিপ্লব পর্যন্ত শিক্ষা কমিশনের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিউনিস্ট সরকার তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়। গাড়ীতে বসিয়ে তাকে ফাঁসির হুকুম কার্যকর করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন নিরাপত্তা রক্ষীগণ তার কথায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। তিনি বিপদজনক জঙ্গল, মরুভূমি এবং পাহাড়ী পথ পাড়ি দিয়ে মুজাহিদদের নিকট পৌছে যান। হিযবে ইসলামীর প্রথম দিকের সাথী সায়্যিদুর রহমান ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে আমাকে এই ঘটনা শুনান।

সায়্যিদুর রহমান বলেন যদি জিহাদের ঘটনাবলী বলা শুরু করি তাহলে এমন সুদীর্ঘ ও অসংখ্য ঈমানদ্বীপ্ত ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং কানে শুনেছি যেগুলো শেষ করার জন্য অনেক সময়ের প্রয়াজোন। বাস্তবতা হলো যখন এবং যেখানেই মুজাহিদদের দুর্বলতা প্রকাশ পেতো সেখানে আল্লাহতায়ালা কোননা কোন কারামত দেখিয়ে তাদের ঈমান চাঙ্গা করে দিতেন এবং জিহাদের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে দিতেন। একবার দুশমন আমাদেরকে

ঘেরাও করে ফেলে। এভাবে অনেক দিন কেটে গেলো, অস্ত্র ও শেষ হবার পথে, খাবার দাবার শেষ হয়ে গেলো। বাহির থেকে সাহায্য পাবারও কোন উপায় ছিলো না। সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে আমরা শহীদ হবার ফয়সালা করে ফেললাম। এছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায়ও ছিলো না। গ্রেফতার হতে পারতাম অথবা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে ধুকে ধুকে মরতে পারতাম। কিছু সাথী স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত সিন্ধান্ত নিলো। এরপর উভয় গ্রুপ মিলে কর্মপন্থা নির্ধারণে পরামর্শে বসলাম। হঠাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এমন অভাবনীয় সাহায্য এলো যে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দুশমনের জঙ্গী বিমান মাথার উপর এসে গর্জন করতে লাগলো, তারা রাশিয়ান সৈন্যদের খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে এসেছে। শাহাদত বরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মুজাহিদগণ বাহিরে গিয়ে নিজেদের রাইফেল শূন্যে তুলে বিমানের আরোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলো। তারা ভাবছিলো, বিমান থেকে দুশমন ভেবে তাদের উপর যেন বোমা বর্ষণ করে, এভাবে তারা শহীদ হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টার ফলাফল দাঁড়ালো এই যে, প্লেনের লোকজন মনে করলো এরা তাদের বাহিনীর ফৌজ। তারা আমাদের উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও খাবার উপর থেকে ছেড়ে দিলো। এভাবে আল্লাহ দুশমনের মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করলেন। খাদ্য ও অস্ত্র পাবার পর আমরা বেষ্টনী ভেঙ্গে বাহিরে এলাম এবং দুশমন বাহিনীকে আটক করলাম । গনীমত হিসেবে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র আমাদের হাতে এলো। মজার ব্যাপার হলো

মারকাযের সাথীগণ আমরা শহীদ হয়ে গিয়েছি মনে করে আমাদের জন্য ফাতেহা খানী সম্পন্ন করে ফেলে। যখন অস্ত্রশস্ত্র ও বন্দী নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হলাম, আমাদের দেখা সত্ত্বেও তারা আমাদের জীবিত থাকার কথা বিশ্বাস করতে চাইলো না।

বৃষ্টি সাহায্য করলো

নায়েবে কমান্ডার শহীদ আব্দুর রহমান হিন্দী, যিনি ৪ বছর যাবত হরকতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি অনেকবার মারাত্মক ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন, যামাখোলার যুদ্ধে তার কৃতিত্ব পূর্ণ ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। মাওলানা আব্দুর রহমান আমাকে বলেন যে, আমরা খোদায়ী মদদের বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি। যামা খোলার সর্বত্র দুশমন মাটির নীচে বিস্ফোরক পুতে রাখে, প্রত্যেক পাহাড় ও টিলায় মাইন বিছানো ছিলো। দুশমনের ক্যাম্পের কাছাকাছি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতে আমাদেরকে সীমাহীন সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো। আমাদের অনেক সাথী পাহাড়ী ছোট্ট নদী নালার মাইন বিস্ফোরণের ফলে যখমী হলো। এই অবস্থায় দুশমনের পোস্টের উপর হামলা চালানো সীমাহীন ক্ষতির কারণ হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য গায়েবী মদদ পাঠালেন। একদিন এমন প্রচন্ড বৃষ্টি হলো যে সারাদিন মোর্চা থেকে আমরা নড়াচড়া করতে পারলাম না। বৃষ্টি বন্ধ হবার পর আমরা গোশত ক্রয় করার জন্য গায়ের উদ্দেশ্যে পা বাড়াতেই

চতুর্দিকে দুশমনের লুকানো মাইন মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখলাম। বৃষ্টির কারণে উপরের মাটি সরে গিয়ে মাইন গুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছিলো। কাল বিলম্ব না করে অন্যান্য মুজাহিদের সহায়তায় প্রায় হাজার খানিক উত্তোলন করে আমরা পুরো এলাকা সাফ করে ফেলি, যদি দুশমনের লুকায়িত মাইন বৃষ্টির কারণে প্রকাশ না পেত এবং সেগুলো সরিয়ে না ফেলতাম তাহলে হয়তো কোনভাবেই যামা খোলা পোস্টের উপর হামলা করা সম্ভব হতো না।

কুপের ভেতর বিশ দিন

১৯৮৬ সালের ১৩ই মে আমার ঘরে বসে মাওলানা আব্দুর রহমান ফিদাঈ এই বিস্ময়কর ঘটনাটি শুনান যা গনীর মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।

মুজাহিদ নাসরুল্লাহ মানসুর পায়ে হেটে কোথাও যাচ্ছিলো। আচমকা সামনের দিক থেকে ট্যাংক এসে হাযির হলো। যেহেতু নাসরুল্লাহর চাচা বিখ্যাত মুজাহিদ কমান্ডার ছিলেন, তাকে আটক করে দুশমন তার চাচার অবস্থানের কথা ফাঁস করতে মযবুর করতে পারে ভেবে নাসরুল্লাহ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটলো। ট্যাংকের চালক তাকে পাকড়াও করতে তার পিছে ট্যাংক নিয়ে ছুটলো। অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, নাসরুল্লাহ সোজা রাস্তা ধরে দৌড়াচ্ছিলো আর তার পেছনে ট্যাংক গর্জন করতে করতে ছুটে আসছিলো। সামনে ছোট্ট এক কুয়া মুখ দেখে নাসরুল্লাহ তার ভেতর ঝাপ দিলো, কুঁয়ায় পানি থাকায় তার শরীরে কোন আঘাত লাগেনি।

কিছুক্ষণ পরে নাসরুল্লাহর মনে বাহিরে বের হবার ভাবনা উদয় হলো। সে মাথার পাগড়ির এক প্রান্তে পাথরের টুকরা বেঁধে উপরে নিক্ষেপ করলো এই আশায় যে হয়তো কারো চোখে পড়বে এবং সে তাকে উদ্ধার করবে। কিন্তু তার এই আশা নিরাশায় পর্যবসিত হতে বেশী সময় লাগলো না। নাসরুল্লাহ এই বন্দী দশা থেকে মুক্তির কোন পথই খুঁজে পেলো না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রহমতের দৃষ্টিতে সর্বত্র বিরাজমান, যিনি মাছের পেটে থাকা ইউনুস (আঃ) এর মদদে এসেছিলেন, ইব্রাহীম (আঃ) কে আগুনের মাঝে সহী সালামতে রেখেছিলেন। দুদিন পর থেকে নাসরুল্লাহ কুঁয়ার মাঝে সেই শহীদানের সাক্ষাত লাভ শুরু করলো যারা এক বছর পূর্বে শহীদ হয়েছে। শহীদ নাসরুল্লাহ এবং শহীদ ক্বারী আব্দুল্লাহ তার জন্য খাবার নিয়ে আসতে লাগলো, সেও পূর্ণ তৃপ্তি সহ সেগুলো দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলো । একদিন নাসরুল্লাহ মুজাহিদ দাইমুহাম্মাদকে দেখতে পেলো, নাসরুল্লাহ কুঁয়ায় নিপতিত হবার পরে সে শহীদ হয়। তাকে দেখে নাসরুল্লাহ বুঝতে পারলো যে, দাই মুহাম্মাদও শহীদ হয়ে গেছে। সে নাসরুল্লাহর জন্য চা নিয়ে আসতো। একদিন নাসরুল্লাহ তাকে কুঁয়া থেকে বাহিরে নিয়ে যাবার জন্য দাই মুহাম্মাদকে অনুরোধ জানালো। দাই মুহাম্মাদ লোহার বড় একটি পেরেক দিয়ে তাকে বলল এটার সাহায্যে কুঁয়ার দেয়ালে পা রাখার মতো গর্ত তৈরী করে উপরে উঠে যাও। নাসরুল্লাহ বলল, কুঁয়ার এই পাথুরে দেয়াল সামান্য পেরেকে ফুটো হবে কি করে? দাই মুহাম্মাদ উত্তর দিলো, আমি তোমাকে মদদ করবো। নাসরুল্লাহ

কুঁয়ার পাথুরে দেয়ালে গর্ত খোড়ার জন্য খোচা দিতেই শক্ত পাথর নরম কাদা মাটির মতো মনে হলো। এবার উভয়ে কাজ শুরু করে দিলো এবং বিশ দিনের মাথায় নাসরুল্লাহ সুস্থ্য সবল দেহে উপরে উঠে এলো।

ট্যাংক এবং বুলডোজার কবর স্থান গুড়িয়ে দিতে এসে নিজেই মাটির খেলনার মতো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো

বুরুক প্রদেশের ২৫ বছর বয়সী মুজাহিদ ফারুক খান এই ঘটনা শুনিয়েছে। গ্রাজুয়েট এই যুবক নূর মুহাম্মাদ তারাকীর শাসনামলে জিহাদে শরীক হয়েছে এবং জমিয়তে ইসলামী আফগানিস্তানের সাথে সাংগঠনিক ভাবে তার সম্পৃক্ততা আছে। ১৯৮৮ সালের ১৫ এপ্রিল পাকতিয়া প্রদেশে অবস্থিত জমিয়তের মারকাযে তার সাথে সাক্ষাত হলে আমাকে মুহাম্মাদ ফারুক খান বলল যে, বুরুক প্রদেশে শহীদানের এক কবরস্থান আছে, রাশিয়ানরা সেই কবরস্থানের নাম নিশানা মুছে ফেলে সেখানে বড় বড় বিল্ডিং নির্মাণের পরিকল্পনা করে। তারা ট্যাংক ও বুলডোজার নিয়ে সেখানে হাযির হয়। কিন্তু এরপর যা সংঘটিত হয় তা তাদের অবিশ্বাস্য ও অভাবনীয় ছিলো। প্রথম ট্যাংক কবরস্থানের সীমায় প্রবেশ করা মাত্র নিজে নিজেই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অবস্থা দৃষ্টে দ্বিতীয় ট্যাংক স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। নির্বাক রাশিয়ানরা ভয় ও বিস্ময়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুমড়ানো মোচড়ানো ট্যাংক দেখে মনে হচ্ছিলো সেটি

বাচ্চাদের খেলনা বস্তু, কেউ যেন পায়ের চাপে সেটিকে ভেঙ্গে ফেলেছে। এবার ট্যাংকের স্থলে তারা বুলডোজার সামনে এনে এক শহীদের কবর বরাবর চালিয়ে দিলো, বুলডোজারও ভেঙ্গে দু' টুকরো হয়ে গেলো, এবার ভয়ার্ত রাশিয়ানরা কালবিলম্ব না করে কবরস্থান ছেড়ে পালালো। ফারুক খান তার ভাইর এক ঘটনা শুনালো যেখানে অমানবিক যুলুম নির্যাতনের মুখে মুজাহিদদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার অনুপম নমুনা খুঁজে পাওয়া যায়। ফারুক খানের বড় ভাই নজীবুল্লাহ সামরিক বাহিনীতে লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদায় চাকুরী করতেন। তারাকীর অভ্যুত্থানের পর নজীবুল্লাহকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সাহায্যকারী হবার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। বন্দীখানায় তার উপর নিকৃষ্টতর ও নির্মম যুলুম নিপীড়ন শুরু হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে শক দেয়া হতে শুরু করে প্লাস দিয়ে হাত পায়ের নখ উপড়ে ফেলা এবং চোখে মরিচের গুড়া ঢেলে দেয়া হয়। কিন্তু এতো নির্যাতন সত্ত্বেও এই মর্দে মুজাহিদের মনে বিন্দুমাত্র ভয় ঢুকানো সম্ভব হয়নি। শত নিপীড়ন সত্বেও সে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়। কসাই রাশিয়ানরা হাত পা বেঁধে তাকে মাটির উপর ফেলে রাখে অতঃপর তার উপর দিয়ে ট্যাংক চালিয়ে তাকে শহীদ করে দেয়। এই ঘটনা কান্দাহার ছাউনীতে সংঘটিত হয়।

বৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর মদদ

এটি ১৯৮২ সালের ঘটনা, যা মুজাহিদ ওয়ালী খান আমাকে শুনিয়েছেন। ওয়ালী খান পাকতিয়া প্রদেশের রাজ্জী খিল নামক স্থানের বাসিন্দা, তিনি দাউদের শাসনামলের শেষ দিকে জিহাদে যোগ দেন। তিনি বলেন, একাঈ সূবী’ নামে পাকতিয়ায় একটি দূর্গ আছে যা একাধারে মিলিটারী ক্যাম্প এবং থানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মুজাহিদগণ একবার সেটিকে ঘেরাও করে রাখেন। দুশমন ইতোমধ্যে সীমাহীন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। গেরিলা যুদ্ধে দ্রুত আক্রমণ ও পিছু হটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ এক অনুষঙ্গ। হঠাৎ করে আসা আক্রমণ রুদ্ধ করার জন্য দুশমন মুজাহিদদের চলাচলের রাস্তায় মাইন ও বিস্ফোরক বিছিয়ে দেয়। মাইন অনেক ধরণের হয়ে থাকে ।তন্মধ্যে ট্যাংক বিধ্বংসী এবং এ্যান্টি পারসোনাল অন্যতম। ‘এ্যান্টি পারসোনাল’ আবার কয়েক ধরণের হয়, এর মাঝে এক ধরণের মাইন ছাতার মতো যা হেলিকপ্টার ও জঙ্গী বিমান থেকে নিক্ষেপ করা হয় । ছাতার মতো মাইন গুলো শূন্যে বা মাটিতে সাধারণত বিস্ফোরিত হয় না। কিন্তু পায়ের চাপ অথবা অন্য কোন চাপের কারণে তৎক্ষণাত বিস্ফোরিত হয়। উল্লেখিত স্থানে রাশিয়ানরা ঠিক ঐ ধরণের মাইন ছড়িয়ে রাখে। রং ও আকৃতিতে অবিকল পাথরের ন্যায় হওয়ার ফলে বুঝবার উপায় থাকে না যে, এগুলো মাইন না পাথর। কয়েকজন মুজাহিদ মাইন বিস্ফোরণে গুরুতর রূপে আহত হওয়ার ফলে মুজাহিদদের স্বাভাবিক উঠা বসা ও চলার মাঝে ব্যঘাত সৃষ্টি হলো। সবাই ভীষণ

দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন যে, এই মুসীবত থেকে বাঁচার উপায় কী? বিশাল পাহাড়ী এলাকায় ছড়ানো ছিটানো মাইন সরিয়ে ফেলা সহজ কোন কাজ ছিলো না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত হামলা প্রয়াজোন ছিলো। কিন্তু মুজাহিদগণতো এক পা ও সামনে অগ্রসর হতে পারছিলেন না। এই হালত দেখে কমান্ডার জালালুদ্দীন হাক্কানী সকল মুজাহিদ নিয়ে আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন শুরু করলেন। দোয়া শেষ না হতেই প্রচন্ড ঝড় তুফান শুরু হলো। পানির বিশাল বিশাল ফোটা বৃষ্টির রূপে বর্ষিত হতে লাগলো। বড় বড় শিলার আঘাতে আশপাশের সকল মাইন বিস্ফোরিত হলো। এভাবে পুরো এলাকা খোদার গায়েবী মদদে কিছুক্ষণের মধ্যে মাইন মুক্ত হলো।

মুজাহিদীনদের জন্য খোদায়ী মদদের বিস্ময়কর ঘটনা

আফগান জিহাদের বিরুদ্ধে ইসলামের দুশমনেরা সুপরিকল্পিত চক্রান্তের মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে, কতিপয় মুসলমান নিজের অজ্ঞাতসারে তাদের প্রোপাগান্ডার চালিকা শক্তি রূপে কাজ করছে। অপরদিকে মহান রাব্বুল আলামীন তার দ্বীনের দুশমনদের অপপ্রচার নস্যাৎ করে মুজাহিদদের জন্য নিজ রহমতের অফুরন্ত ভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি একবার আন্তরিকতার সাথে এই জিহাদের পথে অগ্রসর হয়েছে, অতঃপর সে আফগান জিহাদের বাস্তবতার ব্যাপারে শত অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি এবং মনে

প্রাণে পূর্বের তুলনায় আরো বেশী জিহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। পরবর্তী ঘটনাবলীতে তেমনই কিছু দৃষ্টান্তমূলক বিষয় প্রকাশ পেয়েছে।

আল্লাহর মদদের এক ঘটনা

হায়দ্রাবাদের বাসিন্দা এবং জামেয়া উলুমে ইসলামিয়া বিনুরী টাউনে শিক্ষা সমাপনকারী মাওলানা সাআদাতুল্লাহ বলেন, আরগুন ছাউনীর উপর হামলা করার জন্য আমরা এক পাহাড়ে পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করি, যার উপর চার মুজাহিদ দায়িত্ব পালন করছিলেন। মুজাহিদ দলে ঘাপটি মেরে থাকা গুপ্তচর দুশমনের নিকট তাদের অবস্থানের কথা জানিয়ে দেয়। রাতের আঁধারে ট্যাংক সাজোয়া যান অত্যাধুনিক অস্ত্রেসজ্জিত দুশমন বাহিনী পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের চার মুজাহিদের উপর হামলা চালায়। রুশ সেনারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে, তারা কামান নিয়ে পাশ্ববর্তী পাহাড়েও অবস্থান নেয়। আমাদের মূল ঘাঁটি কিছু দূরে থাকলেও আমরা রাত ব্যাপী ট্যাংক ও সাজোয়া যানের অবিরাম আওয়াজ শুনতে পাই। আমরা মনে করলাম, দুশমন হেলিকপ্টারের সাহায্যে রসদ সরবরাহ করছে এবং ছাউনীর সেনারা তা সামলে নিচ্ছে।

ভোরের আলোয় চার মুজাহিদ আশপাশে শত্রু সেনার উপস্থিতি টের পেয়েই তাদের উপর ফায়ারিং শুরু করে। ফায়ারিং শুনতেই আমরা অস্ত্র হাতে দ্রুত তাদের অবস্থান লক্ষ্য করে ছুটতে থাকি। কিন্তু দুশমন

পুরো উপত্যকায় তোপ, মর্টার ও মেশীনগানের সাহায্যে এলোপাথারি গুলী বর্ষণ করতে থাকে। আমরা পাহাড়ের মধ্যবর্তী সরু পথ দিয়ে গা বাঁচিয়ে লক্ষ্য স্থলের দিকে পা বাড়াই। আচানক আমার প্রস্রাবের প্রয়াজোনীয়তা দেখা দেয়। আমি কমান্ডারের নিকট প্রস্রাবের অনুমতি দেবার জন্য মিনতি করতে থাকি। ক্রমে প্রস্রাবের প্রয়াজোনীয়তা তীব্রতর হতে থাকে, আমার দেখাদেখি অন্য সাথীগণও তাদের প্রস্রাবের হাজত সম্পন্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন।প্রস্রাবের কারণে সেখানে আট/ দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয় । দুশমন ইতোমধ্যে সেই গিরিপথ লক্ষ্য করে মর্টারের গোলা বর্ষণ শুরু করে। আমরা দশ মিনিট না থামলে যেখানে পৌঁছতাম সেখানে দুশমনের গোলা আঘাত হানে। পরবর্তীতে জানতে পারি যে, কেউ একজন ওয়ারলেসের মাধ্যমে আমাদের গিরিপথ ধরে অগ্রসর হবার সংবাদ দুশমনের কানে পৌছায়, সেই অনুযায়ী দুশমন মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে। যদি কুদরতের পক্ষ থেকে আচমকা প্রস্রাবের হাজত না আসতো তাহলে অবশ্যই আমরা সকলে মর্টারের গোলার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হতাম।

অন্ধকারেরর সাহায্যে মুজাহিদদের মদদ

অন্ধারের এই ঘটনা সায়্যিদুর রহমান শুনিয়েছেন। কাবুলের সন্নিকটে এক নীচু পাহাড়ী ঢাল সংলগ্ন উপত্যকায় মুজাহিদদের অস্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, তার পাশ দিয়ে সরু অথচ খরস্রোতা এক নদী প্রবাহিত হচ্ছিলো। একদিন রুশ ও আফগান

সেনারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ট্যাংক নিয়ে চতুর্দিক থেকে সেই অস্থায়ী মারকায ঘেরাও করে। সায়্যিদুর রহমান সেই মারকাযের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছিলেন, তিনি নিজের ১৪০ জন সহযোদ্ধা নিয়ে সেই ঘেরাও ভাংতে চাইলেন, তিনদিন যুদ্ধ সত্ত্বেও তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এভাবে এক পর্যায়ে তাদের মর্টার ও কামানের গোলা নিঃশেষ হয়ে গেলো। সায়্যিদুর রহমান বলেন, আমরা চাইলে হালকা অস্ত্র নিয়ে আলাদাভাবে বেষ্টনী ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সাথের ৮২ মিলিমিটার কামান, ১৪.৫ মিলি মিটার তোপ, ১২.৭ মিলি মিটার ওয়াশকা মেশিনগান ছেড়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না, কারণ যুদ্ধাস্ত্র মুজাহিদদের নিকট প্রাণের চেয়েও প্রিয় হয়ে থাকে। ওদিকে রাশিয়ানরা তাদের বেষ্টনী ধীরে ধীরে আরো সংকীর্ণ করে ফেললো। রাশিয়ানরা ট্যাংকের উপর লাউড স্পীকার লাগিয়ে মুজাহিদদেরকে ওয়ার্নিং দিলো যে, তোমরা অতিসত্বর আত্মসমর্পণ করো, অন্যথায় তোমাদেরকে ট্যাংকের সাহায্যে পিষে ফেলা হবে।

কমান্ডার সায়্যিদুর রহমান সকল মুজাহিদকে একত্র করে বললেন, আমরা তো আমাদের সাধ্যমত বতীয় কোশেশ করে দেখলাম, এবার চলো সকলে সম্মিলিতভাবে আসমান যমীনের মালিকের সাহায্য প্রার্থনা করি, যিনি নিজের দ্বীনের নামোচ্চারণ কারীদের হেফাযতের যিম্মা নিয়েছেন। মুজাহিদগণ তায়াম্মুম সেরে দুরাকাত নফল নামায আদায়

করে মহান রবের দরবারে চোখের পানি ফেলতে লাগলেন। সায়্যিদুর রহমান বলেন, দোয়া শেষ করে আমরা মুখের উপর থেকে হাত সরাতে পারিনি এরিমধ্যে আকাশে মেঘের গুড়গুড় আওয়ায শুনতে পেলাম। এভাবে কিছুক্ষণের ভেতর পুরো উপত্যকার আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেলো। তীব্র অন্ধকারের কারণে দুই/চার হাত দূরের কিছুও দেখা যাচ্ছিলো না। আমি সাথীদের বললাম, আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করেছেন এবং এই অন্ধকার দিয়েছেন যেন আমরা দুশমনের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিরাপদে বের হয়ে যেতে পারি, দ্রুত সামান উঠিয়ে নালা ধরে উল্টো দিকে চলতে থাকো। মুজাহিদগণ অনতিবিলম্বে ভারী ও হালকা অস্ত্রশস্ত্র উঠিয়ে নালা পথে রওয়ানা হলেন। এরপর তারা এমন শান্ত এবং ধীরস্থিরভাবে সেই এলাকা ত্যাগ করেন যেন নিজেদের সুরক্ষিত মারকাযের ভেতরে চলাফেরা করছেন। দুশমন কোন কিছু বুঝতেই পারলোনা অথচ মুজাহিদগণ নালা অতিক্রম করে তাদের খুব কাছ দিয়ে নিজেদের পথে চললেন। ঠান্ডা পানির ভেতর দিয়ে দীর্ঘ সময় চলার পরেও সাথীদের মধ্য হতে একজনেরও সর্দি- কাশির সমস্যা হয়নি। পরে আমাদের গুপ্তচরগণ জানিয়েছে যে, আমাদের গ্রেফতার বা গতিরোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সেই অভিযানের প্রধান দায়িত্বশীল রুশ অফিসারকে কর্তব্যে অবহেলার দায়ে বরখাস্ত করা হয়েছে।

গোলা বারুদের মাঝে অদৃশ্য বিস্ফোরণ

সায়্যেদ আহমদ শাহ বলেন, ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমরা জিদরানের দোটা কানডাও নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। একদিন সেখানে ১৩০০ দুশমন ফৌজ অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাংক ও সাজোয়া যান সহ উপস্থিত হয়। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে বেশীরভাগ মুজাহিদ পিছু হটে যায়। কিন্তু আমরা পনেরাজোন মুজাহিদ সিদ্ধান্ত নিলাম পিছু না হটে প্রয়াজোনে তাদের মোকাবেলা করে শাহাদত বরণ করবো।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা দুশমনের উপর হামলা চালালাম, ইতোমধ্যে তাদের সাথে আরো সৈন্য যুক্ত হলো। দুশমনের এই বিশাল বহর খোস্ত যাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলো। তাদের বহরে ট্যাংক, সামরিক গাড়ী ও তোপ, মর্টার প্রভৃতি ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিলো, পক্ষান্তরে আমাদের নিকট কালাশনিকভ রাইফেল ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ছিলোনা যা দিয়ে দুশমনের ট্যাংক, সাজোয়া যানের গতিরোধ করবো।কুদরতের কী লিলা, আচমকা একটি ট্রাক আমাদের সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমরা ট্রাক লক্ষ্য করে ফায়ার করলাম, ট্রাক গোলা বারুদ ও ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপ যোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রে পূর্ণ ছিলো। আমাদের ফায়ারিং এর ফলে ট্রাকের গোলা বারুদ বিস্ফোরিত হয় এবং ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তাদের ট্যাংক ও সাজোয়া বহর অভিমুখে তীব্র গতিতে ছুটতে থাকে। বিস্ময়কর এই দৃশ্য তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিই বা করতে পারতাম আমরা। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে

দুশমনের ৪৫টি সামরিক গাড়ী একটি ট্যাংক ও অগণিত সৈন্য মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এভাবে কোন রকম ক্ষতি ও রক্তপাত ছাড়াই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফিরদের উপর আমাদেরকে বিজয় ও প্রচুর গনীমত দান করেন। পরবর্তীতে জানতে পারি যে এই কনভয়ের ক্যাপ্টেনের কাঁধে পরাজয়ের দায়দায়িত্ব চাপিয়ে রুশ কর্তৃপক্ষ তাকে বিচারের সম্মুখীন করেছে।

স্বপ্নে বিজয়ের সুসংবাদ

কমান্ডার নাসরুল্লাহ জিহাদ ইয়ার বলেন, ৩০ শে সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের ৪ দিন পূর্বে আমরা সীমাহীন কর্মব্যস্ততার মুখোমুখি হলাম । বিশ্রাম এবং ঘুমানোর তেমন সুযোগই মিলছিলোনা। যুদ্ধের পূর্বের রাত সাড়ে এগারোটায় সকল যুদ্ধোপকরণ নিয়ে আমরা আব্দুর রহমান ঘাঁটিতে পৌছলাম এবং বারোটায় ঘুমের উদ্দেশ্যে পাথুরে বিছানায় আল্লাহর নিকট দোয়া করতে লাগলাম, হে আল্লাহ আমরা ক্লান্ত, রাত তিনটায় তাহাজ্জুদ আদায় করার জন্য তুমি আমাদেরকে বিনিদ্র করে দিও। রাত ঠিক তিনটায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো, তাহাজ্জুদের জন্য সকল সাথীকে ডেকে তুললাম। সাথীগণ নফল নামায পড়লেন, দুয়েকজন রোযা রাখলেন। ফজরের ওয়াক্ত হলে আমরা নামায আদায় করে সামান্য সময়ের জন্য শুয়ে পড়লাম। আমরা জানতাম, অনাগত দিনের প্রতিটি মুহূর্ত রণাঙ্গণে কাটাতে হবে, রাতে শোয়ার সুযোগ মিলবে কি না তা জানতাম না। হালকা ঘুম আসতেই স্বপ্নে

দেখলাম যে, আমরা আল্লাহর রহমতে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছি এবং অনেক দুশমন ফৌজকে আটক করেছি। ইতোমধ্যে এক সাথী আমায় বিনিদ্র করে বলল, নাশতা তৈরী হয়েছে, খেতে চলো। “আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমি নাশতা করবো না” বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। একটু পরেই পূর্বের ন্যায় একই স্বপ্ন দেখলাম। সাথী এসে পুনরায় আমায় জাগিয়ে বলল, নাশতা খেয়ে নাও। কিন্তু প্রবল ক্লান্তির কারণে আমি আবারো শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তার পার্শ্বে ছোট ছোট ঝোপঝাড় রয়েছে। হঠাৎ একটি ঝোপ থেকে এক বিড়াল দৌড়িয়ে আরেক ঝোপে লুকানোর চেষ্টা করলো। আমার সাথী আমাকে আবার বিনিদ্র করলো। আমি সাথীদেরকে ডেকে স্বপ্নের কথা বললাম, ক্রমাগত এই স্বপ্ন দেখার ফলে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, সামনের যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হবো ইনশাআল্লাহ।

দুশমনের উপর অগ্নিগোলা

ওয়ারদাকের বাসিন্দা শায়খ মাহমুদ
বিন সিরাজুদ্দীন বর্ণনা করেন, মুজাহিদগণ রাতের অন্ধকারে দুশমন অবস্থানের নিকট জমা হয়, দুশমন প্রবল বিক্রমে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিলো। ট্যাংক ও সামরিক যানবাহনে সুসজ্জিত দুশমনের সাথে আট দিন ব্যাপী সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। অষ্টম দিন রাত নয়টার দিকে আকাশের কর্ণারে আগুনের এক গোলা দেখতে পাই। অগ্নি গোলাটি তীব্র বেগে দুশমন ট্যাংক বহরের নিকট এসে

বিস্ফোরিত হয়। বাধ্য হয়ে দুশমন সেখান থেকে পাততারি গোটাতে বাধ্য হয়। বিস্ফোরণের স্থলে মানুষের হাত পা, ছিন্ন মস্তক এবং জমে থাকা থোকা থোকা রক্ত চতুর্দিকে ছড়ানো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম বলেন, আমি ঘটনার মূল বর্ণনাকারী মাওলানা মাহমুদকে জিজ্ঞেস করলাম যে, অদৃশ্য থেকে ধেয়ে আসা অগ্নিপিন্ডের আকৃতি কি রূপ ছিলো? তিনি উত্তরে বললেন, সূরায়ে ফীলে উল্লেখিত আবাবীলের যে রূপ আকৃতি ছিলো অথবা বদর যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র হাতে কংকর নিয়ে দুশমনের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলে তা যেমন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে অথচ কোন কাফির তা দেখতে পায়নি।

মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ (আরগুনের অধিবাসী) বলেন, আমরা আটজন মুজাহিদ একস্থানে অবস্থান করছিলাম, দুশমন ফৌজ দুটি ট্যাংক ও তিনটি অস্ত্রসজ্জিত গাড়ী নিয়ে আমাদের উপর হামলা চালায়, আমাদের ট্যাংক বিধ্বংসী বোমা নিঃশেষ হয়ে শুধুমাত্র রকেট লাঞ্চারের একটি গোলা অবশিষ্ট থাকে। এবার বিপন্ন অবস্থায় আমরা আল্লাহর দরবারে কাতর স্বরে সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি শুরু করলাম। মাওলানা শাহমুহাম্মদ বলেন, ট্যাংক লক্ষ করে সর্বশেষ গোলা নিক্ষেপ করি, গোলার আঘাতে একটি গাড়ী বিধ্বস্ত হয়। দুশমন আত্মসমর্পণ করে এবং আমরা গণীমত হিসেবে দুটি ট্যাংক ও দুটি গাড়ী লাভ করি।

পরবর্তীতে সেই ট্যাংকের সাহায্যে আমরা ‘নেক মুহাম্মাদ কেল্লা দখল করি ।

গায়েব থেকে আওয়ায এলো এবং নিরস্ত্র মুজাহিদগণ অস্ত্র লাভ করলো

মুহাম্মাদ ইমতিয়ায আহমদ শামী আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর ব্যাপারে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি বর্ণনা করেন। মাওলানা হাক্কানী কতিপয় মুজাহিদ নিয়ে এক মসজিদে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ একটি ট্যাংক ও কিছু সামরিক যান সজ্জিত দুশমন ফৌজ মসজিদ ঘেরাও করে ফেলে। মাওলানার নিকট অস্ত্র বলতে একটি ২২ বোরের রিভলবার ও দেশীয় প্রযুক্তির সাধারণ রাইফেল ছিলো। তিনি অনেকক্ষণ যাবত রাইফেল ও পিস্তল দিয়ে ফায়ারিং করলেন, কিন্তু পিস্তলের গুলী ট্যাংকের বিরুদ্ধে কীই বা করতে পারে। ট্যাংক নিয়ে দুশমন বেপরোয়া ভঙ্গীতে মসজিদের নিকটে পৌছে যায়। মুজাহিদদের নিকট বাড়তি আসবাব বলতে যা ছিল তা হচ্ছে কন্টেইনার ভর্তি পেট্রল এবং গাধার উপর বোঝা বহনের চাটাই। মুজাহিদগণ তার পরামর্শ মোতাবেক চাটাইর উপর তেল লাগিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে ট্যাংক লক্ষ্য করে ছুড়তে লাগলেন। ট্যাংকের ড্রাইভার এবং গোলা নিক্ষেপকারী কিছু বুঝতে না পেরে ট্যাংকের বাহিরে পা রাখা মাত্র মাওলানা হাক্কানীর রিভলবারের টার্গেটে পরিণত হয়। ট্যাংকের পেছনে লাইন ধরে সাজোয়া যান দাঁড়িয়ে ছিলো। মাওলানা এক মুজাহিদের হাতে তেলের কন্টেইনার দিয়ে দুশমনের গাড়ীর নিকট পাঠিয়ে দেন।

সে অতি সংগোপনে গাড়ীর পেছনে চলে যায় এবং তেল ছিটিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখা মাত্র গাড়ীর ফৌজ পড়িমরি করে গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটাছুটি শুরু করলো। কারণ ট্যাংকের সামনে এবং গাড়ীর পেছনে একই সময়ে আগুন জ্বলে ওঠে। যদিও এই আগুন দুশমনের কোন ক্ষতি করতে পারতো না, কিন্তু আল্লাহ তাদের মাঝে এর মাধ্যমে ভীতি ছড়িয়ে দেন। মাওলানা হাক্কানী নিজের গুলী শূন্য পিস্তল এবং বেল্ট এক মুজাহিদের হাতে দিচ্ছিলেন, এসময় এক দুশমন ফৌজ মাওলানার উদ্দেশ্যে গুলী ছোড়ে। মাওলানার স্থলে তার সাথীর দেহে গুলী আঘাত হানে এবং সে ঘটনাস্থলে শহীদ হয়ে যায়।

মাওলানা হাক্কানীর পাল্টা গুলীতে দুশমনও জাহান্নামের পথ ধরে। একটু পর পুরো দুশমন ফৌজ অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। মুজাহিদদের গোলাবারুদ পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছিলো ফলে মাওলানার চেহারায় কিছুটা দুর্ভাবনার চিহ্ন ফুটে ওঠে। আচমকা তার ডান দিক থেকে আওয়ায আসে, “জালালুদ্দীন অস্থির হইয়োনা, এই অস্ত্র নাও”। মাওলানা জালালুদ্দীন দ্রুত ডান দিকে অগ্রসর হয়ে দেখতে পান। মসজিদের বাহিরে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পূর্ণ একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। নিকটে গিয়ে তার ভেতর কাউকে দেখতে পেলেন না। আওয়ায দিয়ে ডাকা সত্বেও নিকট অথবা দূর থেকে কেউ সাড়া দিলো না। বিলম্ব না করে মাওলানা হাক্কানী ড্রাইভিং জানা এক মুজাহিদের হাতে

স্টিয়ারিং দিয়ে অবশিষ্ট মুজাহিদদের নিয়ে ট্রাকে সওয়ার হয়ে নিজ ঘাঁটিতে পৌছে গেলেন।

বৃষ্টি আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করলো

মুজাহিদ আনোয়ার হুসাইন বলেন, “যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আমরা আল্লাহর সরাসরি মদদ কামনা করছিলাম। আমাদের কতিপয় সাথী দুশমনের হাতের নাগালে চলে গেলো, অন্যান্য মুজাহিদগণ আশপাশের ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলো। বিপদজনক অবস্থানে থাকা মুজাহিদদের গুলী প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো, আমাদেরও একই হাল । কমান্ডার ফায়ারিং বন্ধ করে পাঁচ মিনিট আল্লাহু আকবারের উচ্চ শ্লোগান দিতে বললেন। নারায়ে তাকবীরের পাঁচ মিনিট পূর্ণ না হতেই দুশমন পিছু হটতে লাগলো, এই সুযোগে আমরা এগারো রুশ সেনাকে আটক করলাম। আটককৃত সৈন্যদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা সংখ্যায় এতো বেশী হওয়া সত্বেও পলায়ন শুরু করলে কেন? তারা উত্তরে বলল, আমাদের চতুর্দিক থেকে যখন তোমরা নারায়ে তাকবীরের ধ্বনি বুলন্দ করো তখন পলায়ন অথবা আত্মসমর্পণ ব্যতীত আমাদের সামনে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা থাকে না।

আমরা আল্লাহর মদদের শুকরিয়া আদায় করছিলাম, এ সময় কেউ একজন বলল পাহাড়ের উপর রাশিয়ান অফিসারের বিকৃত লাশ পড়ে আছে, কিছু সাথী সহ আমি মৃত রাশিয়ানের লাশ চাক্ষুস করার জন পাহাড়ের দিকে চললাম। অর্ধেক রাস্তা না পেরোতেই আমরা প্রচন্ড

তৃষ্ণা অনুভব করি, তৃষ্ণার কারণে কারো পক্ষেই এক পা সামনে অগ্রসর হওয়ার মতো শক্তি অবশিষ্ট ছিলো না। এক মুজাহিদ তো কান্নাই শুরু করে দিলো। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম জিহাদের ময়দানে এর চেয়েও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যদি এভাবে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় তাহলে ভয় পেয়ে লাভ কী? প্রতুত্তরে সে এবং অন্যান্য মুজাহিদ বলল, গুলী খেয়ে শহীদ হলে তো কোন দুঃখ ছিলো না, কিন্তু পানির অভাবে এভাবে ধুকে ধুকে মরবো?

তখন তাদের নিয়ে আমি আল্লাহর দরবারে পানির সমস্যা দূরকরার জন্য দোয়া করতে লাগলাম। দোয়া শেষ না হতেই এক খন্ড মেঘ আমাদের মাথার উপর উদয় হলো এবং ছোট ছোট বরফের টুকরা হয়ে পড়তে লাগলো। আমরা চাদর পেতে বরফ ধরলাম এবং তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। বরফ না হয়ে পানির ফোটা বৃষ্টি হলে হয়তো আমাদের একজনেরও তৃষ্ণা মেটানো সম্ভব হতো না।

দুশমনের উপর অদৃশ্য থেকে আঘাত

মুজাহিদ কমান্ডার মুহাম্মাদ উমর বলেন, আমরা ‘ইয়াঘাত' এলাকায় সরকারী সৈন্যদের উপর ত্রিমুখী হামলা চালালাম। দুদিক থেকে প্রচন্ডতার সাথে আক্রমণ পরিচালনা করলেও তৃতীয় পথ থেকে পিছু হটতে বাধ্য হলাম, কারণ সেখানে দুশমন ফৌজ সুবিধাজনক স্থানে পজিশন নিয়ে বসে ছিলো। পরবর্তীতে জানলাম যে, তৃতীয় পথে দুশমনের পাঁচশত সিপাহী মারা গিয়েছে। এবং

অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে, অথচ সেদিক দিয়ে আমরা জোরদার কোন আক্রমণ চালাইনি ।

মেঘের সাহায্যে মদদ

‘গোনাবাদ’ প্রদেশের প্রধান শহর ‘খেবাহ’ এর নিকটবর্তী সালামপুর এলাকায় ষাটজন মুজাহিদ দুশমন কনভয়ের উপর হামলা চালায়। দুশমন সংখ্যায় শুধু বেশী ছিলো তা নয় বরং তারা বিপুল অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিলো। তথাপি দুশমনের এক ব্রিগেডের ১৫০ ব্যক্তি মারা যায় ও ১০ জন গ্রেফতার হয়। এই যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা মেঘের সাহায্যে মুজাহিদদের মদদ করেন। এমনি আরেক ঘটনায় মাপল' নামকস্থানে গুটিকয় মুজাহিদ কনভয়ের উপর হামলা করে ৬০ দুশমনকে হত্যা করে তাদের ১টি ট্যাংক ও অন্যান্য সামান ছিনিয়ে নেয় ।

জীবিত মুজাহিদ

১৯৮১ সালের ঘটনা। লোগড় প্রদেশের বারকী বারাক এলাকায় রুশ আফগান যৌথ বাহিনী মুজাহিদদেরকে দশদিন যাবত ঘেরাও করে রাখে। মুজাহিদগণ সংখ্যায় সর্বমোট
৪০০। অপরদিকে যৌথ বাহিনী অন্তত ত্রিশ হাজার হবে। প্রায় ২০০ মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায়। রুশ-আফগান ফৌজের পাঁচ হাজারের মতো সেনা মারা যায়। কমিউনিস্টদের পক্ষে এই যুদ্ধে ২০টি হেলিকপ্টার ও ১৩টি মিগ জঙ্গী বিমান ও ৩০০ ট্যাংক অংশ নেয়। মুজাহিদরা ৩৬টি ট্যাংক ধ্বংস করে দেয়। বিমানের নির্বিচার বোমা বর্ষণে গণহারে সাধারণ

মানুষ মরতে থাকে। তারা এমন কঠিন ও দুর্ভেদ্য বেষ্টনী তৈরী করে যে, বাহিরের মুজাহিদগণ অবরুদ্ধদের বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দেয়। বর্ণনাকারী সায়্যিদুর রহমান বলেন, তারা মৃত ভেবে অন্যান্য মুজাহিদের পাশাপাশি আমার রূহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া করে। তারা কল্পনাও করেনি যে, কোন মুজাহিদ বেঁচে আছে। বেষ্টনী ভেদ করে বাহির হয়ে আমি এক মসজিদে ফজর নামায আদায়ের জন্য প্রবেশ করি। নামায শেষ করে শুনতে পাই মুসল্লীগণ দোয়া করছেন, ইয়া আল্লাহ! সায়্যিদুর রহমানকে জান্নাতে উঁচু স্থান দান করুন। এসব দেখে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। লোকদের ডেকে বললাম, আমি সায়্যিদুর রহমান। তারা বিশ্বাস করতে চাইলো না, উপস্থিত এক ব্যক্তি আমায় চিনতে পারলো। এবার লোকজন আমাকে জীবিত দেখে আল্লাহর কুদরতের গুণকীর্তন করতে লাগলো।

ইতোমধ্যে আল্লাহ মুজাহিদদের জন্য
তার রহমতের দুয়ার খুলে দেন। গুপ্তচর মারফত জানতে পারি যে, মুজাহিদদের সংখ্যা ৩০ হাজারের উপরে মনে করে দুশমন ঘেরাও উঠিয়ে নিজেদের অবস্থানে পথ ধরে।

আল্লাহর গায়েবী মদদ

আরগুন পাকতিয়ার মাওলানা আরসালানের চাচাতো ভাই মুহাম্মাদ শাদীম আমাকে বলেছেন যে, এক যুদ্ধে আমি দুশমনের বিরুদ্ধে পাঁচটি ম্যাগাজিনের গুলী শেষ করি। কিন্তু ম্যাগাজিনগুলো নিজে নিজেই গুলী পূর্ণ

হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারলাম না এটা কিভাবে সম্ভব হলো?

সেই যুদ্ধে দুশমন নিক্ষিপ্ত মিসাইল আমাদের দিকে এসে বিস্ফোরিত না হয়ে উল্টো ঘুরে দুশমনের উপর বিস্ফোরিত হয়। এমনিভাবে কামানের গোলাও তাদের দিকে ফিরে গিয়ে বিস্ফোরিত হচ্ছিলো।

এখানে মুহাম্মাদ শাদীমের বিস্তারিত পরিচিতি তুলে ধরছি। মুহাম্মাদ শাদীমের বয়স পয়ত্রিশ বছর। জিজ্ঞেস করলাম আপনি জিহাদ কবে থেকে শুরু করেছেন? তিনি উত্তরে জানালেন, নূর মুহাম্মাদ তারাকীর যুগে ১৯৭৯ সালে। আমি আবার জানতে চাইলাম, আপনি জিহাদ কেন করছেন? উত্তর দিলেন, আমি ইসলামের দুশমন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছি, তারা আল্লাহর নামনিশানা মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু আমাদের শরীরে এক ফোঁটা রক্ত অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমরা তাদের এই অপচেষ্টা সফলকাম হতে দেবো, আমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতেই থাকব। দৃঢ় সংকল্প ফুটে উঠে তার চোখে মুখে। পুনরায় প্রশ্ন করলাম, আপনার কি মনে হয় আপনারা এই যুদ্ধে সফলকাম হতে পারবেন? তিনি বললেন, যদি আমার রব চাহেন তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আমরা অবশ্যই সফল কাম হব। সেই কামিয়াবীর কোন নিদর্শন পেয়েছেন কি? আমি জানতে চাইলাম।

তার উত্তর ছিলো, আমরা অধিকাংশ যুদ্ধ ক্ষেত্রে এমন অভাবনীয় ও অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যে, আমরা এখন দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি এই যুদ্ধে খোদায়ী মদদ আমাদের জন্য নির্ধারিত এবং আমরাই শেষ

পর্যন্ত বিজয়ী হবো। আমি অনুরোধ জানালাম, আমাদেরকে কোন কারামত সম্পর্কে অবহিত করুন এবং সেই কারামতের সত্যতার ব্যাপারে কসম খেতে প্রস্তুত আছেন কিনা তাও বলুন। তিনি বলা শুরু করলেন; যার মুহাম্মাদ সকাল পাঁচটায় শাহাদাত বরণ করে এবং সাড়ে ৯টা পর্যন্ত জিহাদ করতে থাকে। অর্থাৎ, নিজের শাহাদাতের সাড়ে চার ঘন্টা পর্যন্ত তিনি জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। আমি বললাম, আপনি ব্যতীত অন্য কেউ কি তাকে যুদ্ধরত দেখেছেন? হ্যা, ভাই আব্দুল্লাহও শহীদ অবস্থায় তাকে লড়তে দেখেছেন।

আরেক যুদ্ধের ঘটনা শুনুন; দশ ঘন্টা যাবত দুশমন আমাদেরকে লক্ষ্য করে বোমা বর্ষণ করছিলো, কিন্তু আমাদের শরীরের কোথাও সামান্য বালুকণার আঘাতও লাগেনি। কালাশনিকভের ম্যাগাজিন দুশমনের বিরুদ্ধে গুলী চালাতে গিয়ে বারংবার শেষ হয়ে গেলো এবং বিস্ময়কর ভাবে তা নিজে নিজেই পূর্ণও হলো। দুশমন আমাদের উদ্দেশ্যে কামানের গোলা ছুড়লো, কিন্তু বুমেরাং হয়ে তা ঘুরে গিয়ে তাদের উপরেই বিস্ফোরিত হলো। এই অভাবনীয় দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন। আরেক যুদ্ধে দুশমন বাহিনীর মোট ২ ব্রিগেড সৈন্য আমাদের বিরুদ্ধে। হামলায় অংশ নেয়। এক ব্রিগেডে ১৮ হাজার সৈন্য থাকে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, সেখানে মুজাহিদরা সংখ্যায় ছিলো মাত্র ১২ জন। আমাদের ৭ সাথী লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যায়, অবশিষ্ট ৪ জন সহ আমি ২দিন তাদের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। আমাদের হামলায় তাদের দুটি ট্যাংক

ধ্বংস হয় এবং মাইন বিস্ফোরণে অন্য চারটি অকেজো হয়ে পড়ে। তৃতীয় দিন জালালুদ্দীন হাক্কানী ও আরসালানের বাহিনী আমাদের মদদে পৌছে যায়। জানতে চাইলাম; আপনারা দুশমনের এই বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা কীভাবে করলেন? বললেন, আল্লাহর মদদে প্রথম দিন আমরা ১০০০ দুশমনকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিই এবং আরো দুটি ট্যাংক হালাক করি। এবার আপনিই ধারণা করে নিন সেই যুদ্ধে দুশমনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিরূপ হতে পারে?

গায়েবী মদদ

এই ঘটনা আমি যদি সেই জানবাযদের মুখ থেকে ধারাবাহিক ভাবে না শুনতাম তাহলে তার বাস্তবতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা একটু দুরূহ ছিলো যে, চর্তুদিকে বিস্ফোরক ছড়ানো থাকা সত্বেও মুজাহিদগণ অবলীলায় তার উপর দিয়ে হেটে গিয়েছেন অথচ কোথাও সামান্যতম বিস্ফোরণও ঘটেনি। এই জানবাযদের মাঝে কমান্ডার যুবায়ের, মাওলানা আব্দুর রহমান, আদীল আহমদ এবং খালিদ আহমদ (করাচী) প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

লিকলিকে শরীরের অধিকারী আদীল আহমদ ফয়সালাবাদের বাসিন্দা, সে ১৯৮৫ সাল থেকে জিহাদে শরীক হয়েছে। তার ভাষায় আমাদের সাথে এক মুজাহিদ ভাই সরফরাখ ছিলেন, যিনি মাত্রই তাবলীগে এক চিল্লা লাগিয়ে এসেছেন। যুদ্ধের পূর্বে তিন দিন তিনি শুধু এই দোয়া করছিলেন যে, “হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমনভাবে সাহায্য করো, যেন আমরা

তা নিজ চোখে দেখতে পারি। ” বারুদের বিস্ফোরক বিছানো রাস্তায় চলার সময় আল্লাহ সত্যি সত্যি তার রহমতের দরজা আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। তার গায়েবী মদদের ফলে কোথাও আমরা সামান্য বিস্ফোরণের মুখোমুখি হইনি।

নাসরুল্লাহ বিষয়টি এভাবে খোলাসা করলেন যে, যেই রাস্তা ধরে তারা গিয়েছিলেন , পরবর্তী দিন আমি সেই রাস্তা চেক করে অসংখ্য বিস্ফোরক দূরে নিক্ষেপ করি এবং দ্বিতীয় দলও সেই পথ অতিক্রম করে যায়।

অবশিষ্ট সাথীদের মাঝে মাওলানা আরসালান রহমানীর প্রেরীত কতিপয় আফগান সাথীও ছিলেন , তারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে সেই মৃত্যু উপত্যকা অতিক্রম করেন। কমান্ডার যুবায়ের বলেন , আমি পেছনের সাথীদের মধ্য হতে ১৫ জনকে গুরুতররূপে যখমী দেখতে পাই।

এক ফরাসী সাংবাদিকের রিপোর্ট

আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী এক ফরাসী সাংবাদিক সরেজমিনে যুদ্ধের রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ ছয় মাস বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছুটে বেড়ান। মুজাহিদদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে তিনি এক বই লিখেন যা জনৈক ব্যক্তি আরবীতে **رأيت اللـــه في افغانســتان**(□□□□□□□□□□□□□ আমি আল্লাহকে দেখিছি) নামে অনুবাদ করেন। সেই ফরাসী লেখকের ভাষায় , আমি মুসলমানদের আল্লাহকে আফগানিস্তানে দেখেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে আল্লাহ আছেন। একবার

৩৫ জন মুজাহিদ স্রেফ কালাশনিকভ দিয়ে ১৫০ জন রুশ সেনাকে মিশিয়ে দেয়। দুশমন মুজাহিদদের মদদে কখনো আকাশ থেকে ঘোড় সওয়ার নেমে আসতে দেখে। রাশিয়ানরা বলে, তোমাদের আকাশচারী ঘোড় সওয়াররা আমাদের দিকে কি যেন ছুড়ে মারলো আর আমরা অন্ধ হয়ে গেলাম । কখনো এমন শহীদকে দেখলাম, যার দেহের রক্ত থেকে মনকাড়া সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিলো। কখনো কোন মুজাহিদ মৃত্যু শয্যায় বলছিলো, আমি জীবনের অন্তিম সময়ে তোমাদের অসিয়ত করছি যে, কখনো জিহাদ ত্যাগ করোনা, কারণ এখন আমি আমার জন্য অপেক্ষমান এমন জিনিস দেখতে পাচ্ছি তা তোমরাও লাভ করবে। এমন বিস্ময়করভাবে তোমাদের জন্য আল্লাহর মদদ আসবে যে, তার তুলনায় দুশমনের শক্তি অতি নগণ্য। তাদের কোন কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকবেনা। দুশমন সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়বে, কুরআনে সেই আয়াত তোমাদের সামনে সত্য হিসেবে ধরা দিবে যে, “এগুলো এজন্য যে আল্লাহ সেই লোকদের সাহায্যকারী যারা বিশ্বাস স্থাপন করে। আর যারা কাফের, তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।” -(সূরা মুহাম্মদ-১১)

ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুজাহিদদের মদদ; সাদা পোষাকধারী ফেরেশতা

পাগমানের ভাই ওয়াহীদুল্লাহ বললেন;
রুশ সেনারা পাগমানে অবস্থিত আমাদের মোর্চায় হামলা চালায়, কঠিন সংঘর্ষের পর কিছু সংখ্যক মুজাহিদ পিছু হটতে বাধ্য হয়। কারণ তাদের অনেক সাথী ইতোমধ্যে শহীদ হয়ে যায় অথবা মারাত্মকভাবে আঘাত

প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মুজাহিদগণ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাবার পরেও সারাদিন গোলাগুলী অব্যাহত থাকে। এরপরে কমিউনিষ্টরা গ্রামবাসীকে বলে যে, ওখানে সফেদ লেবাসধারী অসংখ্য মুজাহিদ বিদ্যমান, তাদের মাথায় কাফনের কাপড় পেছানো আছে, তারা দিনভর যুদ্ধ চালিয়ে আমাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে।

ওগুলো কী ছিলো?

সারখাবের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে জিবরান গুল বলেছেন যে, একরাতে রাশিয়ান জঙ্গী বিমান আমাদের মারকায লক্ষ্য করে প্রচন্ডবেগে বোমা বর্ষণ শুরু করে। তখন আমাদের নিকট বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র অথবা কামান কিছুই ছিলোনা। হঠাৎ আমি দেখতে পাই ক্ষেপণাস্ত্রের ন্যায় কি যেন আমাদের পার্শ্ববর্তী পাহাড় থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে কমিউনিষ্টদের অবস্থানের উপর গিয়ে বিস্ফোরিত হয়।

বিদ্যুতের ন্যায় পোষাকধারী কোথায় গেলো?

কান্দাহারের বোলদাক এলাকার দারুল হাদীস মাদ্রাসার মোল্লা মুহাম্মাদ এবং মাসউদ আমায় বলেছেন যে, ১৪০৫ হিজরীর ঈদুল ফিতরের ৫ দিন পর আমরা একদল কমিউনিস্ট সেনা আটক করি। কিছুক্ষণ পর তারা জানতে চায়, তোমাদের সেই সাথীরা কোথায় যারা বিদ্যুতের পোষাক পরিহিত ছিলো? মাসউদ

বলেন, এমন কেউ আমাদের সাথে ছিলোনা, এ নিশ্চয়ই খোদায়ী মদদ।

সফেদ লেবাসধারী ব্যক্তির বিস্ময়কর ঘটনা যার হাতে দুই রুশ সৈন্যের ছিন্ন মস্তক ঝুলছিলো

ইত্তেহাদে ইসলামীর এক নির্ভীক কামান চালক মুজাহিদ সায়্যেদ উমর বর্ণনা করেন যে, রাশিয়ান তাবেদার হুকুমতের কতিপয় সৈন্য পক্ষত্যাগ করে আমাদের সাথে যোগ দেয়, তাদের মাঝে একজন কান্দাহারের অধিবাসী ছিলো। সে আমাদেরকে এই বিস্ময়কর ঘটনাটি শোনায় যে, আমি একদিন রাশিয়ান সৈন্যদের ক্যাম্পে অবস্থান করছিলাম। আচমকা দেখলাম সফেদ লেবাসধারী এক ব্যক্তি ক্যাম্পে প্রবেশ করলো। তার কাঁধে আর পি. জি রকেট লাঞ্চার শোভা পাচ্ছিলো। তখন দুপুর প্রায় তিনটার মত হবে। সে ভাজোবাজির মতো চোখের পলকে আমাদের ৪টি ট্যাংক ধ্বংস করে যেভাবে ক্যাম্পে প্রবেশ করেছিলো সেভাবেই বের হয়ে যায়। রাশিয়ান সৈন্যরা শতশত রাইফেল দিয়ে তার উদ্দেশ্যে গুলী ছুড়লো, কিন্তু একটা ও তার দেহে আঘাত হানলোনা। এর দুই/তিন ঘন্টা না যেতেই সেই ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় দৃঢ় পদক্ষেপে ক্যাম্পে প্রবেশ করলো। সে ভেতরে পা রাখতেই তার উদ্দেশ্যে অসংখ্য মেশিনগান গর্জে উঠলো। কিন্তু কোন দিকে ভ্রক্ষেপ না করে আরো ২টি ট্যাংক ভস্মীভূত করে সে পূর্বের পথে বের হয়ে যায়। তৃতীয়বারও পূর্বের বেশে আবির্ভূত হলো, এবার তার হাতে চক চকে একটি ঘজর শোভা পাচ্ছিলো। সে সোজা

রাশিয়ান অফিসারদের কামরায় ঢুকে গেলো। স্থানুর মতো বিস্ময়ভরা চোখে দেখতে লাগলাম বেরিয়ে যাবার সময় তার দুই হাতে দুই রাশিয়ান অফিসারের কর্তিত মস্তক ঝুলছে।

ফেরেশতাদের ঘোড়া

প্রচন্ড সংঘর্ষের পর হাতে গোনা কতিপয় মুজাহিদ বিপুল সংখ্যক দুশমনের উপর বিজয়ী হলেন, পুরো উপত্যকায় আফগান সৈন্যদের লাশের স্তুপ দেখা যাচ্ছিলো, খোদার নাম নিশানা মিটিয়ে দেওয়া এবং মুসলমানদেরকে খড়কুটো ভেবে সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ও সংখ্যাধিক্যের মদমত্ত খোদার দুশমন বাহিনী নির্জীব পাথরের ন্যায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলো। মুজাহিদদের প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও গাম্ভীর্যবান আমীর জনৈক মুজাহিদকে ইশারায় ডেকে দুশমনের আটককৃত সৈন্যদের সংখ্যা জানতে চাইলেন। সে নেহায়েত আদব সহকারে সংখ্যা জানার জন্য সেখান থেকে বিদায় নিলো। কিছুক্ষণ পর সে উৎফুল্লমুখে আমীরের সামনে হাযির হলো। লম্বা ঘন দাড়ি মাথায় পাগড়ী হাতে কালাশনিকভ, কাঁধে গুলীর বেল্ট ইত্যাদি। তার পুরো অবয়বে ইসলামী শৌর্য বীর্যের ছাপ ফুটিয়ে তুলেছিলো। আমীর বললেন, কি খবর নিয়ে এলে? মুজাহিদ উত্তর দিলেন, দুশমনের পাঁচশত সেনা হালাক এবং ৮৩ জন গ্রেফতার হয়েছে। আমাদের সাথীদের মধ্য হতে একজনের শাহাদাত নসীব হয়েছে। এই বাক্য শেষে তার কণ্ঠ কিছুটা আর্দ্র মনে হলো, চোখে দুয়েক

ফোঁটা অশ্রুও ভীড় করলো। কিন্তু মুহূর্তের মাঝে সে নিজেকে সামলে নিলো। নিজের প্রিয়জনের প্রাণহানীতে মানুষের হৃদয়ে প্রচন্ড আঘাত লাগে। কিন্তু ইসলামের মর্যাদা বুলন্দ করতে প্রাণ বিলিয়ে দেওয়া এবং স্বহস্তে প্রিয় জনের শবদেহ দাফন করা মুসলিম মিল্লাতের নিকট বিশেষ গৌরব জনক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কওমের বাচ্চা নওজোয়ান এবং বৃদ্ধগণ এ ধরনের হাজারো ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন, কিন্তু তারা কোন বাতিল অপশক্তির সামনে মাথা নত করেননি। ইত্যবসরে আমীরের সামনে অনেক বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টারগণ জমা হলেন, যারা কিছুক্ষণ পূর্বে সংখ্যায় নগন্য মুজাহিদদের দেখে ধারণা করেছিলেন যে, এই যুদ্ধে একজন মুজাহিদের প্রাণে বেঁচে থাকাও অলৌকিক ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের হালত দেখে তাদের বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। তারা বারবার মুজাহিদদের এতো বড় সফলতার মূল উৎসের সন্ধান করছিলেন।

মুজাহিদদের আমীর অনুচ্চকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন যে গ্রেফতারকৃত দুশমন ফৌজকে এখানে হাযির করা হোক। একটু পর পৃথিবীর সর্বাধিক প্রতাপশালী রাষ্ট্রের সুপ্রশিক্ষিত সৈনিকেরা মুজাহিদদের সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো। তখনো পর্যন্ত তাদের চেহারায় ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা বিরাজ করছিলো। এবার তাদেরকে জেরা করা শুরু হলো। রিপোর্টারগণ তাদের নিকট জানতে চাইলেন। “ঠিক ভাবে বলো তো কীভাবে তোমরা এরকম বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হলে?

আর বিশৃংখল ও হাতে গোনা কিছু মুজাহিদের সামনে এতো দ্রুত অস্ত্রও বা কেন ফেলে দিলে ?” প্রশ্নবানে জর্জরিত রুশ সৈন্যরা নিজেদের পরাজয়ের জন্য বিভিন্ন অজুহাত দেখাচ্ছিলো। তাদের মুখে আল্লাহ তায়ালার গায়েবী মদদের অবিশ্বাস্য ঘটনা শুনে উপস্থিত সকল মুজাহিদের চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। কয়েদী রাশিয়ান বিরতিহীন বলে চলছিলো। “আমরা এতো কমযোর ছিলাম না যে, তোমাদের সামনে হাতিয়ার ফেলে দিবো। আমাদের নিকট অস্ত্র কম ছিলো এমনও নয়। কিন্তু যখনি তোমাদের ঘোড় সওয়ার ফৌজ আমাদের উপর হামলে পড়লো তাদের সেই আশ্চর্যজনক ঘোড়া দেখেই আমাদের মনে কম্পনের সৃষ্টি হলো। এই হামলা একদিক দিয়ে হলে হয়তো আমরা মোকাবেলা করতাম। কিন্তু এই ঘোড় সওয়াররা চতুর্দিক দিয়ে আমাদের উপর হামলা চালালো, তারা বিদ্যুৎবেগে আমাদের উপর আঘাত হানছিলো। ফলে আমাদের অধিকাংশ ফৌজ মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আমাদের সামনে বেঘোরে প্রাণ দেওয়া অথবা জান বাঁচিয়ে অস্ত্র ফেলে দেওয়া এই দুটো রাস্তা খোলা ছিলো। এখন আমরা সেই ঘোড়া দেখতে পাচ্ছিনা, না জানি তোমরা সেগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছো।” কয়েদী নিশ্চুপ হলে পুরো সমাবেশে পিন পতন নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো, মুজাহিদদের চোখে তখনো অশ্রু দেখা যাচ্ছিলো। আমীর জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষনা করলেন। “আমার নিরস্ত্র সাথীগণ! যদি তোমরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা এবং মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য এভাবে অবিচল থাকো, তাহলে রাব্বুল আলামীন

ফেরেশতাদের মাধ্যমে এভাবে তোমাদেরকে সব ক্ষেত্রে মদদ করবেন।”

গায়েব থেকে হেফাযত

মুজাহিদে আযম মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক শুকরী যিনি কাবুলের বাসিন্দা এবং মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন, কাবুলের উপকণ্ঠে মুজাহিদদের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে হামলা চালানোর যে সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন তা খুব কম মুজাহিদের ভাগ্যে জুটেছে। এমনকি আফগানিস্তানের সাবেক পুতুল সরকার প্রধান বারবাক কারমালের মহল, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনীর আবাসস্থল এবং রাশিয়ান অফিসারদের ক্যাম্পও মুহাম্মাদ সিদ্দীকের গেরিলা হামলার শিকারে পরিনত হয় ।

মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দীক বর্ণনা করেন যে, শুকরীতে অবস্থিত আমাদের ক্যাম্পকে হুকুমত হামলার বিশেষ টার্গেট হিসেবে চিহ্নিত করে। পরিকল্পনা মোতাবেক তিন মাস যাবত প্রতিদিন দুই তিনবার ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান গানশীপ হেলিকপ্টার ও ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত বিশেষ প্লেন আমাদের ঘাঁটির উপর হামলা চালাতে থাকে। পদাতিক বাহিনী কামান ও ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপ যোগ্য রকেট নিয়ে চতুর্মুখী আক্রমণ চালাতো। একদিন চিন্তা করলাম দুশমন যে অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে আমাদের উপর হামলা চালাচ্ছে তার একটু হিসাব নিকাশ সেরে আসি।

সুতরাং কিছুসাথী সহ সেদিকে অগ্রসর হলাম । চলতে চলতে যখন আমরা এক উন্মুক্ত ময়দানে উপস্থিত হলাম, আচমকা দুটি হেলিকপ্টার গানশীপ আমাদের সামনে উদয় হলো এবং ক্রমাগত মেশিনগানের গুলী ও রকেট ছুড়তে লাগলো। আধঘন্টা পর তাদের গোলা বারুদ শেষ হয়ে গেলে তারা ঘাঁটির দিকে ফিরে যায়। এবার পার্শ্ববর্তী পাহাড় থেকে আমাদেরকে লক্ষ্য করে কামান মর্টার এবং হালকা মেশিনগানের গোলা বর্ষণ হয়। যেখান থেকে গুলী বর্ষণ করা হচ্ছিলো সেখানে ইতোপূর্বে মুজাহিদগণ নিরাপত্তা চৌকী কায়েম করেছিলেন। সুতরাং আমি ভাবলাম, মুজাহিদগণ ভুলবশতঃ আমাদের উপর ফায়ারিং করছে। আমি জানতাম না যে, রাতের আঁধারে রাশিয়ানরা সেখান থেকে আমার সাথীদের হটিয়ে দখলদারী কায়েম করেছে।

আমি নিজের পরিচয় জানানোর উদ্দেশ্যে আস্তে আস্তে তাদের দিকে এগুতে থাকলাম, একশো গজের দূরত্বে পৌছার পর তারা আমার উদ্দেশ্যে কালাশনিকভের গুলী বর্ষণ করতে লাগলো। বুলন্দ আওয়াযে নিজের নাম শুনিয়ে তাদেরকে বলতে লাগলাম। আমি তোমাদের কমান্ডার, কেন আমাকে মারতে চাচ্ছো?তারা আমার কথা কানেই তুললো না। এভাবে তিন ঘন্টা যাবত বিরামহীন গুলী চালাতেই থাকলো। আমার পরিধেয় কাপড়ে চল্লিশের উপরে গুলীর আঘাত লাগলো, কিন্তু শরীরে সামান্যতম আচড় লাগেনি। এবার আমি পাহাড়ী পাথুরে টিলার দিকে ছুটলাম যা প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে ছিলো। ওদিকে পেছন থেকে দুশমন গুলী চালিয়েই যাচ্ছিলো। পাহাড়ী টিলার

আড়ালে পূর্বেই ৪০ জন দুশমন সেনা অবস্থান নিয়ে বসেছিলো। এবার তারা সামনের দিক থেকে গুলী করতে লাগলো। নিরুপায় হয়ে আমি জঙ্গলের দিকে ছুটলাম। এবার চতুর্দিক থেকে আমাকে লক্ষ্য করে গুলী বর্ষণ শুরু হলো। হাজারো গুলীর সামনে থেকে আমি সুস্থ শরীরে জঙ্গলে ঢুকে ভাবতে লাগলাম যে, ইসলামের ইতিহাসে কোন যুদ্ধে মাওলার পক্ষ থেকে এমন নিরাপত্তা আর কাউকে দেয়া হয়েছিলো কী?

রুশ সেনারা আমাদের নিকট ঘোড় সওয়ারদের কথা জানতে চায়

আমীরুল মুজাহিদীন মুহাম্মাদ সাইয়াফ মুজাহিদ মীর কীমত খানের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান যে, আমরা আটজন মুজাহিদ ছিলাম, দুশমন ৭০ ট্যাংক ও সাজোয়া যান নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করে। আমাদের নিকট শুধুমাত্র একটি ট্যাংক বিধ্বংসী রকেট লাঞ্চার ও তোপের দশটি গোলা মজুদ ছিলো। একটি গোলা নিক্ষেপ করে প্রথম ট্যাংকটি ধ্বংস করার পর দেখলাম যে, অবশিষ্ট গোলা নিক্ষেপের জন্য প্রয়াজোনীয় বারুদ নেই। উল্লেখ্য বারুদ বিস্ফোরণের মাধ্যমে তোপের গোলা নিক্ষেপ করা হয়। আচানক আমরা দেখতে পেলাম যে, দুশমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন শুরু করেছে যার কোন কারণ আমাদের জানা ছিলোনা। পলায়ন পর পাঁচ দুশমন সেনাকে আমরা আটক করি। পরে তারা আমাদের নিকট জানতে চায় যে সেই ঘোড় সওয়ার ফৌজ কোথায়? বললাম, আমাদের মধ্যে একজনও ঘোড় সওয়ার নয়, আমরা আটজন মুজাহিদ

ছিলাম এখনো সেই কজনই আছি। তারা আমাদের কথা মানতে অস্বীকার করে বলতে লাগলো, আমরা নিজের চোখে হাজার হাজার ঘোড় সওয়ার মুজাহিদ দেখেছি যারা চতুর্দিক থেকে আমাদের উপর বিদ্যুৎবেগে হামলা চালায়।

ফেরেশতাদের তাকবীর ধ্বনি

কান্টার প্রদেশের দুশাখীল নামক এলাকায় রুশ সেনাদের সাথে মুজাহিদদের ঘোরতর লড়াই চলছিলো। মুজাহিদগণ সংখ্যায় মাত্র ১৫ জন বিপরীতে রাশিয়ানরা প্রায় ৪ শত সশস্ত্র সেনা। তারা মুজাহিদদেরকে ঘেরাও করে ফেলে। আফগান কমিউনিস্ট কমান্ডার হ্যান্ডমাইকে আওয়ায দিলো, অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করো অন্যথায় সকলকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। কোন মুজাহিদ অস্ত্র ফেলতে ইচ্ছুক ছিলোনা। ঘেরাও ভেদ করে বের হবার কোন রাস্তা তাদের সামনে খোলা ছিলোনা। তারা নিরুপায় হয়ে আল্লাহর মদদ চাইতে লাগলো। সহসা নারায়ে তাকবীরের গগনবিদারী আওয়ায এলো। মুজাহিদগণ আশপাশে তাকিয়ে কাউকে না দেখলেও রুশ সেনা পড়িমরি করে পালানোর পথ ধরলো। এভাবে আল্লাহর গায়েবী মদদে অবরোধ উঠে গেলো এবং মুজাহিদগণ নিরাপদে স্থান ত্যাগ করলেন।

সাহায্যের ঘোড়া

মাওলানা আরসালান আমায় জানিয়েছেন
যে, আরগুনের এক স্থানে রাশিয়ানরা আমাদের

উপর আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে আমরা ৫০০ কমিউনিষ্ট সৈন্যকে খতম এবং ৮৩ জনকে জীবিত আটক করি। আটককৃতদের নিকট জানতে চাই যে, তোমাদের পরাজয়ের কারণ কী? কয়েদী উত্তর দিলো তোমরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমাদেরকে ঘেরাও করার পর যখনি আমরা তোমাদেরকে রাইফেলের গুলীর টার্গেট বানানোর ইচ্ছা করতাম তোমরা সঙ্গে সঙ্গে গায়েব হয়ে যেতে আর আমাদের অজস্র গুলীর নিশানা ব্যর্থ হয়ে যেতো। কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীত হয়েছে যে বদর যুদ্ধে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের মদদে নেমে এসেছিলেন। উল্লেখ্য সেই যুদ্ধে আমাদের একজন মাত্র মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। আমরা তার গ্রামে পদার্পণ করার পর তার তিন বছর বয়সী ছেলে ম্যাচের কাঠি নিয়ে ট্যাং জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের নিকট আসে। রুশ কমান্ডার তার হাতে দিয়াশলাই দেখে জানতে চায় তুমি এদিয়ে কী করবে? তখন ঐ মাসুম বাচ্চা জবাব দেয় আমি ট্যাংকে আগুন ধরিয়ে দিবো। একথা শুনে রাশিয়ান অফিসার বিস্ময়পূর্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারা পুরো ময়দানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছিলো

কর্ণেল আব্দুল ওয়াহীদ আমাকে বলেছেন
যে, আমি ৮৫ জন মুজাহিদ নিয়ে মীদান প্রদেশ সংলগ্ন কাবুল- কান্দাহার মহা সড়কে ওৎপেতে বসেছিলাম। এসময় কমিউনিস্ট সেনাদের এক কাফেলা সেই পথ অতিক্রম

করছিলো। তখন আমাদের নিকট অস্ত্র বলতে কালাশনিকভ ব্যতীত শুধুমাত্র তিনটি রকেট লাঞ্চার ছিলো। কাফেলার উপর হামলা চালিয়ে আমরা ১২১ জন দুশমন সেনা আটক করি। আমাদের হামলায় ৬৫টি সামরিক যান বিধ্বস্ত হয়।

কয়েদীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে, আমরা দ্রুত তাকে গ্রেফতার করি। তার নিকট প্রশ্ন করি; তুমি পালানোর রাস্তা ধরছো অথচ তুমি আমাদের উপর কোন গুলী চালাওনি? সে উত্তর দিলো; আমি গাড়ী থেকে নামার পর আমার আশপাশে সাদা পোশাক পরিহিত অসংখ্য লোক দেখতে পাই। তারা পুরো ময়দান এবং পাহাড়ে গিজগিজ করছিলো। তাদের চেহারা দেখে আমি ভীত হয়ে পালানোর চেষ্টা করি। তাদের দেখার পর ভুলেও আমার মনে গুলী চালানোর চিন্তা আসেনি।

জানাযায় সফেদ লেবাসধারীদের পরিচয় কী

মুজাহিদ মুহাম্মাদ যাহির এবং আব্দুয্যাহির বর্ণনা করেন যে, আমাদের উপর দুশমনের বোমারু বিমান প্রচন্ড বোমা বর্ষণ করে। তাদের নিক্ষিপ্ত অনেক বোমা অবিস্ফোরিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সেগুলো তুলে আমরা তাদের ট্যাংক ও সাজোয়া যান চলাচলের রাস্তায় মাটির নীচে বিছিয়ে দিই। মাটির নীচের বোমার বিস্ফোরণে দুশমনের ৪টি ট্যাংক ও ৭টি গাড়ী উড়ে যায়। এরপর লাইন ধরে ১৬টি ট্যাংক সামনে অগ্রসর হয় এবং গোলা নিক্ষেপ করে আমাদের ৫ সাথী ভাইকে শহীদ করে দেয়। তাদের লাশ তুলে

এনে জানাযা আদায়ের সময় দেখতে পাই জানাযার কাতারে সফেদ লেবাসধারী দীর্ঘকায় সাতগাযী এসে শরীক হয়েছেন। এর পূর্বে আমরা তাদেরকে কখনো দেখিনি। অবশ্য তাদের বেশ ভূষা আমাদের মতোই ছিলো। দাফনের সময়েও তারা আমাদের সঙ্গ দিলেন। এরপর তারা এমনভাবে হাওয়ায় মিশে গেলেন যে, আমরা বুঝতেই পারলামনা তারা কখন এবং কীভাবে গেলেন।

রাশিয়ানদের উদ্দেশ্যে কে গুলী ছুড়ছিলো?

দখলদার রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাঝামাঝি সময়ে উরুজগানের মারকাযে মাত্র ৫০ জন মুজাহিদ অবস্থান করছিলেন। তাদের ব্যাপারে অবগত হয়ে দুশমন বাহিনী মারকাযের উপর হামলা চালানোর জন্য অস্থির হয়ে যায়। তারা মারকায সমূলে ধ্বংস করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গোয়েন্দা বিমান দিয়ে মারকাযের চিত্র ধারণ করে, কমান্ডোদের মাধ্যমে ভেতরের যাবতীয় গোপন তথ্য সংগ্রহ করে। তাদের নড়াচড়া দেখে আমরা ধারণা করি যে, তারা বেশ বড় সড় হামলার প্লান করছে, এদিকে জানবায মুজাহিদগণ ঈমানী চেতনায় জ্বলজ্বল করছিলেন। তারা মনের মাঝে বিন্দুমাত্র ভীতিকে স্থান না দিয়ে ধৈৰ্য্য সহকারে দুশমনের পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এক রাতের অন্ধকারে দুশমন আমাদের চতুর্দিক দিয়ে বেষ্টন করে তীব্রবেগে

হামলা চালায়। মনে হচ্ছিলো, এ কেবল হামলা নয় বরং রুশআফগান অপশক্তি সম্মিলিতভাবে তাদের বিশাল শক্তির প্রদর্শনী চালাচ্ছে। আকাশ থেকে অত্যাধুনিক বিমানের সাহায্যে বৃষ্টির ন্যায় বোমা, ট্যাংক ও কামানের গোলা এবং মুহুর্মুহু ছোট ছোট ক্ষেপণাস্ত্র মারকায লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো।

একদিকে কেয়ামতের মহা প্রলয় চলছিলো, অপরদিকে খোদার রাহে নির্ভীক মুজাহিদগণ নির্বিকারভাবে শীষা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন, হিমালয় সম অবিচলতা প্রদর্শন করে তারা ২০জন সহযোদ্ধার লাশ নিজের হাতে দাফন করলেও একজনের মাঝে ও সামান্যতম শংকা বা জীবন নিয়ে দুর্ভাবনার ছাপ দেখা গেলোনা। বরং ঐ ২০ জনের পদাংক অনুসরণ করে তারাও নিজ রবের আহ্বানে সাড়া দিতে অধীর চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আসলে দুশমনের সর্বাধুনিক অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নাম নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা আমাদের সামনে খোলা ছিলোনা। ইতোমধ্যে তারা বিশেষ কমান্ডোদের সাহায্যে আমাদেরকে জীবিত গ্রেফতারের কোশেশ চালালো। কিন্তু সত্যি কথা হলো, শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে এমন একজনও ছিলো না যে, সামনে এসে “মাসিদাতুল আসার” এর অবশিষ্ট সিংহ শাবকদেরকে গ্রেফতারের দুঃসাহস প্রদর্শন করবে। নানা রকম চেষ্টা সত্বেও তারা আমাদেরকে পাকড়াও করতে ব্যর্থ হলো। এভাবে ১৮ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। আমাদের নিকট শুকনো খেজুর ব্যতীত

খাবার মতো অন্য কিছুই ছিলোনা। অস্ত্র না থাকার মতোই ছিলো। কিন্তু মাওলার উপর বিশ্বাস ও আস্থা, দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা ও শত্রু বিনাশের শপথ বরং পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেল।

অতঃপর আমীর মুহতারাম শাহাদাতের ফযীলত বর্ণনা করলেন, সাথীগণ অশ্রুভেজা চোখে পরস্পরের দিকে তাকালেন এবং সবশেষে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশায় অশ্রুবান বইয়ে দিলেন।

আল্লাহর সাথে মোলাকাতের ব্যাপারে সবার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, দোয়ার মাধ্যমে সবার মনে অভাবনীয় ও ভিন্নতর এক অনুভূতির উদ্রেক হলো, আচমকা প্রচন্ড গোলাগুলীর আওয়ায আসতে লাগলো। উপরের মোর্চায় অবস্থানকারী এক সাথী ওয়ারলেসে জানতে চাইলো, তোমাদের মধ্য হতে দুশমনের লক্ষ্যবস্তুতে কামানের গোলা নিক্ষেপ করছে কে? তার প্রশ্ন শুনে আমরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে উপরের মোর্চায় উঠে দুশমনদের হালত দেখতে লাগলাম। সেখানে তখন অন্য কিছু হচ্ছিলো, ইসলামের দুশমনদের উপর আকাশ থেকে অগ্নিবর্ষণ হচ্ছিলো। তাদের আশ পাশে ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। তাদের অস্ত্রগুলো স্বস্থানে বিস্ফোরিত হচ্ছিলো এবং বিপুল অস্ত্রশস্ত্রকে সাফল্যের একমাত্র উপায় ধারণাকারীগণ নিজ গোলাবারুদের বিস্ফোরণে বেঘোরে প্রাণ দিচ্ছিলো। দুশমনের উপর এরূপ কেয়ামতের বিভীষিকা তিন ঘন্টা যাবত অব্যাহত রইলো। দুশমনের সকল মোর্চা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। ভয়ার্ত দুশমন এলোপাথারী এদিক

সেদিক পলায়ন শুরু করলো। আমরা তাদের মধ্য হতে ১০০ জনকে বন্দী করলাম।

অগ্নিবর্ষণ বন্ধ হবার পর আমরা সেখানে পৌছে দেখলাম দুশমন বাহিনীর সকল অস্ত্র শস্ত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সাথীগণ একে আল্লাহর অপার কুদরতের সামান্য নিদর্শন মনে করে তাঁর দরবারে কাতারবদ্ধ ভাবে সিজদায় পড়ে গেলেন।

মুজাহিদগণ সংখ্যায় কম হওয়া সত্বেও দুশমনের উপর বিজয়ী হবার ঘটনা

শহীদ আব্দুর রশীদ হরকতুল মুজাহিদীনের কমান্ডার ছিলেন, যিনি আফগান জিহাদে কয়েক বছর যাবত ব্যস্ত থাকার পরে ১৯৯০ সালে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন। নিজের এক ঘটনা উল্লেখ করে তিনি আমায় জানালেন যে, আমি খোস্ত রণাঙ্গনে পদার্পণ করার প্রথমভাগে মনে সর্বদা এই আকাংখা বিরাজ করতো যে, বেশী বেশী যুদ্ধে অংশ নিবো। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরেও যুদ্ধে শরীক হবার সুযোগ মিলছিলো না । কখনো এমন হতো যে, আমি কোন কাজে বাহিরে যেতাম আর তখনি অভিযান শুরু হতো এবং আমার ফিরে আসার পূর্বে শেষ ও হয়ে যেতো। একবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম যে, যুদ্ধ শুরু না হওয়া পর্যন্ত মারকায ছেড়ে কোথাও যাবো না। ঠিক ঐ সময়ে কাছাকাছি কোথাও মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর দ্বীনি মাহফিল ছিলো। আমার সাথীগণ সবাই সেখানে রওয়ানা হলেন, আমাকে যাবার জন্য জোরাজুরি করলেও আমি তাদের সাথে গেলাম । আমার সাথে

পাকিস্তানী এক মুজাহিদও মারকাযে অবস্থান করলো। খোদার কী কুদরত! সাথীগণ যাবার একটু পরেই এক অভিযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলো, মাওলানা হাক্কানীর নায়েব সায়্যেদ হানীফ শাহ আল হুসাইনীর নির্দেশনা মোতাবেক আমরা কমান্ডার জামালের নেতৃত্বে অভিযানে অংশ নেবার জন্য অগ্রসর হলাম। আমরা নির্দিষ্টস্থানে পৌছার পূর্বেই হামলা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। বিলম্বে পৌছা সত্ত্বেও এটা দেখে ভাল লাগলো যে, দুশমনের কয়েকটি চৌকী লক্ষ্য করে মুজাহিদগণ হামলা চালাচ্ছিলেন। ইতোপূর্বে কিছু চৌকী তাদের দখলে এসেছে। বিজিত চৌকীগুলো ছেড়ে আমি একাই সামনে অগ্রসর হলাম এবং ছোট এক পানির নালার ভেতর ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। দুশমন শেষবারের মতো প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তুললো। হঠাৎ পাকিস্তানী মুজাহিদ সাথীও আমার নিকট এসে অবস্থান নেয়। সামনেই দুশনের এক গুরুত্বপূর্ণ চৌকী থেকে তারা বৃষ্টির ন্যায় গুলী বর্ষণ করছিলো। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, তখন আমার কালাশনিকভে কোন গুলী অবশিষ্ট ছিলো না। গুলীর ম্যাগাজিন আফগান সাথী মীর্যা খানের নিকট ভূলক্রমে ফেলে এসেছিলাম। আমার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিলো যে, মৃত্যুর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দিন নির্ধারণ করা আছে, নির্দিষ্ট সময়ের আহ্বানকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারেনা। আমি সঙ্গীকে বললাম, চলো আমরা ঐ চৌকীর উপর আক্রমণ করি, অবশ্য গুলীর তীব্রতার কারণে আমার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারলাম না। আমার মনের ভেতর তখন অন্যরকম এক অনুভূতি বাসা বেঁধেছিলো। আমি আল্লাহর নাম নিয়ে গুলী বৃষ্টির পরোয়া

করে সামনে চললাম। চৌকীর কাছে গিয়ে পুরো শক্তি দিয়ে আল্লাহু আকবারের তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলাম। আমার তাকবীর ধ্বনি চৌকীর সেনাদের মনে আতংক ছড়িয়ে দিলো। “নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার” বরাবরই তাদের মনে অজানা ভীতি ছড়িয়ে দিতো। যখন আমি দুশমনকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালাম, তখন সেখানে উপস্থিত ১৮ জন রুশ সেনা কালাশনিকভ মাটিতে রেখে হাত উঁচিয়ে দাড়িয়ে রইলো। এ এক বিস্ময়কর দৃশ্য ছিলো যে, গুলীশূন্য কালাশনিকভ হাতে একজন মুমীনের সামনে দুশমনের সুপ্রশিক্ষিত ১৮ জন সৈন্য শূন্যে হাত তুলে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছিলো।

সত্যিকার জিহাদের বরকতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফেরদের মনে সীমাহীন ভীতির সৃষ্টি করে দেন। আমি গলা উঁচিয়ে আমার একমাত্র সঙ্গীকে ডাক দিলাম, সে মোর্চায় এলো তার সাথে অবশ্য মীর্যা খান ও ছিলো। ১৮ জন সৈন্য ছাড়াও সেখানে একটি ট্যাংক দাঁড়ানো ছিলো, যার ড্রাইভার ও কামান চালক পূর্বেই পলায়ন করেছে। বন্দীদের নিকট জানতে চাইলাম, তোমাদের মধ্য হতে কেউ কি ট্যাংক চালাতে পারো? তারা না সূচক জবাব দিলে আমি নিজেই চালকের আসনে বসে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। বাধ্য হয়ে ট্যাংকটিকে জ্বালিয়ে দিলাম। এরপর ১৮ বন্দী নিয়ে দুশমন এলাকা ছেড়ে মুজাহিদদের নিকট এলাম।

মুজাহিদের নিক্ষিপ্ত পাথর দুশমনের উপর ট্যাংক বিধ্বংসী গোলা রূপে পতিত হলো

ডাক্তার আহসান উল্লাহ খান জালালুদ্দীন হক্কানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, দুশমন বাহিনী সিটি কান্ডাওর পথ ধরে যাদরান এলাকায় সাড়াশী অভিযান চালায়। সিটি কান্ডাও সেই স্থানের নাম যেখানে গারদে ও খোস্তের মহাসড়ক খোলা প্রান্তর ছেড়ে পাহাড়ী উপত্যকায় প্রবেশ করেছে। স্থানটি গারদেযের ৮০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত। খোস্ত গারদেয মহাসড়কের অনেকাংশ যমুনার উৎস মুখের তীর ধরে সামনে এগিয়ে একস্থানে ব্রীজ পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। (অনেকে ঐ জায়গাটিকে যাদরান নামেও অভিহিত করেন) দুশমনের অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে প্রচুর ট্যাংক ও সাজোয়া যান অন্তর্ভুক্ত ছিলো। হামলা খুব তীব্রতর হওয়ায় আমরা বেশীক্ষণ তাদের বাধা দিয়ে আটকে রাখতে ব্যর্থ হই।

যে সাথীদের অস্ত্রের গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলো তারা নিকটবর্তী গ্রামের পথ ধরলো। ৬০ জন মুজাহিদ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমার সাথে রইলো। আস্তে আস্তে আমাদের যুদ্ধোপকরণ ও শেষ হয়ে এলো। নদীর যেখানে ব্রীজ বানানো হয়েছে, তার খুব নিকটে আমরা আত্মগোপন করে বসে রইলাম। অন্যান্য মুজাহিদকে নিয়ে মাওলার দরবারে সাহায্যের প্রার্থনা করে হাতে পাথর তুলে মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ্! আমাদের সাহায্য করো এবং এই পাথর খন্ডকে আবাবীলের

ন্যায় দুশমনের বরবাদীর কারণ বানিয়ে দাও। ঠিক সেই পাথরের ন্যায় যা আবরাহার হস্তী বাহিনীকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলো। আজ হাতীর স্থলে ট্যাংক এসেছে, কিন্তু তুমি চাইলে এই পাথরকে ট্যাংক বিধ্বংসী গোলা বানাতে পারো। এই দোয়া করেই আমি পাথর খন্ড দুশমনের ট্যাংক লক্ষ্য করে ছুড়লাম। একই সময়ে উপরে অবস্থানকারী এক মুজাহিদ ব্রীজের উপর দিয়ে গমনকারী ট্যাংক লক্ষ্য করে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে মারলো, ঘটনা ক্রমে সেটি একটি সামরিক গাড়ীর সামনে পড়ে বিস্ফোরিত হলো। গাড়ীর ড্রাইভার মনে করলো ট্যাংক বিধ্বংসী বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে, দ্রুত ব্রেক কষতে গিয়ে সে গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো। ফলে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্যাংক ও গাড়ীর মাঝে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। প্রচন্ড আওয়াযে বিস্ফোরিত হয়ে ট্যাংক ও গাড়ী ব্রীজের রেলিং ভেঙ্গে নদীতে পড়ে গেলো। কনভয়ের অন্যান্য সামরিক যানের চালক ও সৈন্যগণ এই দৃশ্য দেখে মনে করলো, মুজাহিদদের বড় কোন সংঘবদ্ধ দল তাদের উপর হামলা চালিয়েছে। তারা অবিলম্বে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে এরচেয়ে প্রকাশ্য আর কোন মদদ হতে পারে যে, মাত্র ৬০ জন মুজাহিদের সামনে দুই হাজার দুশমন সেনা আত্মসমর্পণ করেছে?

শুধুমাত্র একগোলার আঘাতে ধ্বংস

মাওলানা আরসালান খান রহমানী বর্ণনা করেন; পাকতিয়া প্রদেশের আরগুন অঞ্চলে রুশ সেনারা আনুমানিক ২০০ ট্যাংক ও সামরিক যান নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করে, আমাদের নিকট ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র বলতে শুধুমাত্র একটি রকেট লাঞ্চার মজুদ ছিলো। মোকাবেলা অথবা পশ্চাদপসরণ উভয় রাস্তাই অসম্ভব মনে হচ্ছিলো। সুতরাং সবাই মিলে আল্লাহর দরবারে সিজদায় নিপতিত হয়ে অবিরাম কান্না শুরু করে দিলাম। সালাতে হাজত আদায় করে দোয়া করলাম, হে আল্লাহ! আমাদের নিকট রকেট লাঞ্চারের একটি মাত্র গোলা অবশিষ্ট আছে, এই এক গোলার আঘাতে দুশমনকে পরাজয় দান করুন। দোয়া শেষে গোলা নিক্ষেপ করলাম যা সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট লাঞ্চার এবং গোলাবারুদে ঠাসা গাড়ীতে আঘাত হানলো। গাড়ীতে আগুন লেগে ক্ষেপণাস্ত্র এবং রকেট লাঞ্চার গুলো উড়ে গিয়ে কমিউনিস্ট সৈন্যদের উপর পড়তে লাগলো। অসংখ্য ট্যাংক ও সামরিক গাড়ী ও অস্ত্রশস্ত্র মুহূর্তের মাঝে জ্বলে ছাই হয়ে গেলো। বাধ্য হয়ে দুশমন পিছে সরে গেলো আর আমরা গনীমত হিসেবে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ হস্তগত করলাম।

একমুঠি ধূলি কণা ট্যাংককে ছাই ভস্মে পরিণত করলো

মুজাহিদ কমান্ডার মাওলানা আব্দুল হামীদ, মাওলানা আরসালানের চাচাতো ভাই মাওলানা

শাহ মুহাম্মাদ এবং মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল হক বলেন যে, আরগুন বসে মুজাহিদ গুল মুহাম্মাদ আমাদেরকে এক বিস্ময়কর ঘটনা শুনিয়েছেন।

গুল মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন যে, আমরা বারো জন মুজাহিদ রাউন্ড লাগানোর উদ্দেশ্যে বাহিরে যাই এবং রাতের আঁধারে নিজেদের মারকাযে প্রত্যাবর্তনের পথ ধরি। কিন্তু রাস্তায় আমরা দুশমনের ফাঁদে আটকে যাই, আমি নিজেকে সহসা দুশমনের ঘেরাও এর মাঝে আবিষ্কার করি। তারা আমার নিকট জানতে চায়, “তুই কে”? আমি পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিলাম; আমি মাদ্রাসার ছাত্র এবং আল্লাহর রাহে মুজাহিদ, তোমাদেরকে কতল করার ইচ্ছায় অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি। তখন তারা আমাকে রুশ ফৌজী অফিসারের সামনে হাযির করলো। অফিসার আমার নিকট একই প্রশ্ন করলে আমি পূর্বের উত্তরের সাথে এটুকুও যোগ করলাম যে, রাশিয়ানরা আফগানিস্তান ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে।

এবার রুশ অফিসার বলল, “আমি এই বিষয় সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি যে, তোমরা আমাদের শক্তিশালী ট্যাংক সমূহ কীভাবে জ্বালিয়ে দাও, অর্থাৎ তোমাদের ফায়ারিং এর কারণে ট্যাংক গুলো কীভাবে ছাইকণায় পরিণত হয়?” আমি বললাম, আল্লাহর পবিত্র নামের অস্ত্রের জোরে, আর তা এই যে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার”। এই কালিমা উচ্চারণ করে আমরা যদি সামান্য পাথরও নিক্ষেপ করি তবু তোমাদের ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যাবে । সামনে সারিবদ্ধ ট্যাংক

দেখিয়ে রাশিয়ান অফিসার আমায় বলল, ট্যাংকের উপর তোমার কালিমার শক্তির বাস্তবতা প্রয়োগ করে দেখাও।” গুল মুহাম্মাদের ভাষায়, এবার আমি কঠিন সমস্যায় পড়ে গেলাম, কারণ নিজের ব্যাপারে আমার পুরোপুরি অবগতি আছে যে, আমি এমন আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান নই, কিন্তু এখন আমার সামনে বিকল্প কোন উপায়ও ছিলো । সুতরাং আমি তাদের নিকট অযুর পানী চাইলাম, ধীরস্থির চিত্তে অযু করে দীর্ঘ সময় নিয়ে দু রাকাত সালাতুল হাজত আদায় করে অত্যন্ত অসহায় কণ্ঠে মহান রবের দরবারে দোয়া করলাম; হে আল্লাহ! আমায় এই কাফিরদের সামনে শক্তিদান করুন, নিজের দ্বীন এবং কালিমার মর্যাদা সমুন্নত রাখুন, আপনার প্রিয় হাবীবের উম্মতের উপর দয়া করুন এভাবে অনেক সময় নিয়ে দোয়া শেষ করলাম। এরপর এক মুঠো ধূলি কণা হাতে নিয়ে ট্যাংকের উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারলাম। ধূলি কণা ট্যাংক স্পর্শ করার সাথে সাথে প্রচন্ড বিস্ফোরণে ট্যাংক দুমড়ে মুচড়ে গেলো। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে রুশ অফিসার আমাকে সসম্ভ্রমে স্যালুট করলো, কালাশনিকভ ফিরিয়ে দিয়ে অন্য সৈন্যের মাধ্যমে সসম্মানে মারকাযে পৌছে দিলো।

অস্ত্রাধিক্যের অহংকার মাটির সাথে মিশে গেলো

মাওলানা আব্দুস সামাদ সায়্যাল বলেন
যে, শিরবাত অঞ্চলে ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে আমরা বিশাল এক রাশিয়ান কনভয় বারুদের

বিস্ফোরণের সাহায্যে ধ্বংস করি, যে কনভয়ে সাতশত বড় ট্রাক, ট্যাংক ও সাজোয়া যান অন্তর্ভূক্ত ছিলো। অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারায়, অথচ মুজাহিদদের দেহে সামান্যতম আচড়ও লাগেনি। এই হামলায় অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ২০ জন ছিলো।

ইমাম মাহদীর যুগের আলামত

মাওলানা আরসালান রহমানী বলেন বিভিন্ন আলামত দৃষ্টে মনে হয় ইমাম মাহদীর যুগ খুব সন্নিকটে। আমি চাই যে, আপনারা তার সাহায্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান। এজন্য মিল্লাতে ইসলামকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন। এবং জিহাদী কর্মকান্ডকে সম্প্রসারিত করুন। শুধুমাত্র ওয়ায নসীহত, বক্তৃতা বিবৃতি এবং লেখা লেখির মাধ্যমে কোন ফলাফল আশা করা যায় না। যতক্ষণ না সত্যিকার জিহাদ শুরু করা হয় । আফগান জিহাদের সূচনা লগ্নে আমাদের নিকট বংশানুক্রমে প্রাপ্ত সেকেলে রাইফেল ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্র ছিলো না, আমরা পেট্রল ও গলিত সাবান বোতলে ভরে এক ধরণের বোমা বানিয়ে কমিউনিস্ট ফৌজের ট্যাংক লক্ষ্য করে ছুড়ে মারতাম, তাতেই ট্যাংকে আগুন ধরে যেতো। আমি গিরিপথের গোপন বাজার থেকে সর্ব প্রথম৩.৩ মিলিমিটারের একটি কামান ক্রয় করি। মুজাহিদগণ সেই ক্ষুদ্র কামানের সাহায্যে দুশমন ছাউনীর উদ্দেশ্যে গোলা নিক্ষেপ করতেন। একটু পরে তারা খুশীর সাথে দেখতে

পেতেন যে, ছাউনীতে আগুন ধরে গিয়েছে, তাদের দুর্গে আগুন ধরেছে। কখনো কখনো তাদের এই সরল বিশ্বাস বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট এতোই পছন্দনীয় হলো যে, তিনি একেক গোলার সাহায্যে দুশমনের অভাবনীয় ক্ষতি সাধন করলেন, শক্তিশালী দুশমন লেজ গুটিয়ে পালানোর রাস্তা ধরলো।

এ্যান্টিট্যাংক মেশিনগান ব্যতীত ট্যাংক বিধ্বস্ত

সায়্যেদ আহমদ শাহ আমায় জানিয়েছেন
যে, ১৯৭৮ সালে ‘জাদরান’ জেলার বারদাসীরি’ নামক এলাকায় অবস্থান করছিলাম, যা ‘সিটি কানডাও’ মহা সড়কের খুব নিকটে অবস্থিত। একদিন বিভিন্ন ধরণের গাড়ীতে সওয়ার হয়ে প্রায় ১৩০০ রুশ সেনা সেই পথে চললো। তাদের শক্তিমত্তা অনুমান করে অধিকাংশ মুজাহিদ পিছু হটলো। আমার সাথে ১৫ জন মুজাহিদ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে পজিশন নিলেন। আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আত্মসমর্পণ অথবা শত্রুর শক্তিমত্তা দেখে পশ্চাদপসরণের চেয়ে আমরা লড়াই করে জিহাদের ময়দানে খোদার রাহে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিবো। সুতরাং প্রাণ হাতে নিয়ে বেপরোয়া ভাবে দুশমনের উপর হামলা চালিয়ে নিমেষে তাদের ৮৫টি ট্যাংক, সামরিক গাড়ী এবং অস্ত্র সজ্জিত ট্রাক ধ্বংস করলাম। তখন আমাদের নিকট ট্যাংক বিধ্বংসী কোন ক্ষেপণাস্ত্র ছিলো না। দুশমনের একটি ট্যাংক জ্বলে গেলো একারণে যে, তার পার্শ্ববর্তী একটি গাড়ী আমাদের গুলীর টার্গেটে পরিণত হয়। আমাদের

তীব্র গোলা বর্ষণের মুখে অস্ত্র সজ্জিত ট্রাকটি তার পাশের ট্যাংক সহ বিস্ফোরিত হয়।

এই সামরিক কনভয় খোস্তের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলো, তাদের সাথে ৬ হাজার কালাশনিকভ রাইফেল ছিলো, সেগুলো আমরা গনীমত হিসেবে লাভ করি। কমিউনিস্ট ফৌজী অফিসারকে গ্রেফতার করে ইসলামী আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি প্রদান করে।

রাশিয়ানরা গ্রেফতার করতে পারবেনা

‘চিহারদীহা' এলাকার মুজাহিদ রেখা খান আমায় বললেন, ‘জুলকুল’ গিরিপথে রাশিয়ানদের সাথে সংঘর্ষে আব্দুর রউফ নামে এক মুজাহিদ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে পাহাড়ী নদীর কিনারে পড়ে থাকে এবং শারীরিক দুর্বলতার দরুন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্নে নিজের শহীদ কমান্ডার আব্দুল গনীকে দেখতে পায় তাকে বলে যে, রাশিয়ানরা তোমাকে গ্রেফতার করতে পারবেনা।

আব্দুর রউফ বলে যে, রাশিয়ান সৈন্যরা
এসে আমার পায়ের পাশ দিয়ে গ্যালনে পানি ভরে নিয়ে গেলেও তারা আমাকে গ্রেফতারের কোন চেষ্টাই করেনি, তাদের দেখে মনে হচ্ছিলো তারা সেখানে আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়।

গোলাবারুদ শেষ হবার পর আল্লাহর পক্ষ হতে মদদ

ওয়ারদাকের চুগতু এলাকার সর্দার মৌলবী পুরদিন বলেন যে, কমিউনিস্ট ফৌজের সাথে আমাদের প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় যা সাতদিন যাবত অব্যাহত থাকে। সপ্তম দিন আমাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসে। সে রাতে রাশিয়ানদের উপর তিন দিক থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। আমরা বুঝতে পারছিলাম না যে, দুশমনের উপর অবিরাম গোলা বর্ষণের উৎসমুখ কোথায়? তাদের উপর নিক্ষিপ্ত ভিন্নতর গোলাবারুদ দেখে দুশমনের বিস্ময়ের সীমা রইলো না, কেননা এর পূর্বে তারা এমন ধরণের গোলা কখনো দেখেনি। সেই সংঘর্ষে ৫০০ দুশমন মারা যায়, যাদের ২৩ জন মেজর পদমর্যাদার অফিসার ছিলো। অন্যরা পিছু হটে যায়। পরে তারা বিস্ময়কর সেই গুলী নিয়ে মুসলিম কয়েদীদের দেখিয়ে জানতে চায় যে, তোমরা এমন গুলী কোথায় পেয়েছো?

শূন্য হাতে জয়

হাজী মুহাম্মাদ নবী আমার সামনে বললেন যে, ১৪০৫ হিজরী ২৯ জ্বিলকদের ঘটনা, আমরা ১৮ জন মুজাহিদ একস্থানে সমবেত হলাম। হঠাৎ ৪০ টি ট্যাংক ও ২টি বোমারু বিমান আমাদেরকে ঘেরাও করে তীব্র গোলা ও বোমা বর্ষণ শুরু করলো, বোমার তীব্রতার কারণে চতুর্দিক ধোয়াচ্ছন্ন হয়ে গেলো।

আমরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম, হে আল্লাহ! যদি আমাদের কোন আমল আপনার নিকট

পছন্দনীয় হয়ে থাকে তাহলে তার উসীলায় আমাদের সাহায্য করুন।

কিছুক্ষণ পর কীভাবে যেন দুটি ট্যাংক ভস্মীভূত হলো এবং ৭৫ জন দুশমন সেনা মারা পড়লো। অন্য ট্যাংক গুলো দ্রুত সেস্থান ত্যাগ করে চলে যায়। আমাদের মধ্যে দুই মুজাহিদ শহীদ হন। কিন্তু শূন্য হাতে কীভাবে এতোবড় বিজয় এলো আমরা বলতে পারবো না।

আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, একবার আমি হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ছিলাম। আমার গুলী শেষ হয়ে যায় এবং ৫টি বিচ্ছিন্ন গুলী বাকী থাকে, যা সাধারণত আমরা ব্যবহার করতামনা। সাথী ভাইকে বললাম, ঐ গুলিই নিয়ে এসো, অতঃপর আমি **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى** (হে নবী আপনি মাটির কণা নিক্ষেপ করেননি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন) তিলাওয়াত করে সেই গুলী গুলো নিক্ষেপ করলাম। খোদায়ী মদদে রুশ হেলিকপ্টারের গায়ে সেগুলো আঘাত হানে এবং তারা দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পলায়ন করে।

আল্লাহর মদদ

১৯৮০ সালের ঘটনা, আমরা সংখ্যায় মাত্র ২৪জন মুজাহিদ ছিলাম, দুশমনের বিশাল এক কনভয় বাড়াহবার' সড়ক ধরে সামনে যাচ্ছিলো। কনভয়ের অসংখ্য ট্যাংকের মোকাবেলায় আমাদের নিকট সাধারণ রাইফেল ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা। প্রায় নিরস্ত্র

হওয়া সত্ত্বেও আমরা রহমতের প্রত্যাশায় কনভয়ের উপর হামলার সিদ্ধান্ত নিলাম। কান্টার নদীর পশ্চিম তীর ধরে কনভয় অগ্রসর হচ্ছিলো, আমরা পূর্বতীরে তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সমান্তরালে চলতে লাগলাম। নৌকার মাঝি আমাদেরকে পাড় করতে অস্বীকার করলে আমরা তার নৌকা ছিনিয়ে নিয়ে আসরের ওয়াক্তে নদী পাড়ি দিয়ে দুশমনের উপর হামলা করলাম। প্রথম হামলায় তাদের তিনটি ট্যাংক ও দুটি সামরিক যান হালাক হলো। ঘন্টাখানেক লড়ার পর যখন তারা পলায়ন শুরু করলো ততোক্ষণে আমরা তাদের ৭৫ জনকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে ৫০ জনকে জীবিত বন্দী করলাম। এ শুধুমাত্র আল্লাহর সাহায্যের কারণেই সম্ভব হলো যে, এতো বিশাল এক বাহিনী মাত্র ২৪ জন মুজাহিদের হাতে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করলো।

২ হাজার রাশিয়ানের বিরুদ্ধে ১৫ মুজাহিদের বিজয়

মাওলানা আরসালান রহমানী এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, শাতুরীর দুর্গম পার্বত্য এলাকায় আমি সহ ১৫ জন মুজাহিদ ২ হাজার রাশিয়ান সেনার বিরুদ্ধে ঘোরতর লড়াইতে লিপ্ত হই। চার ঘন্টা ব্যাপী যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, অতঃপর দুশমন পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। ৭০/৮০ জন রুশ সৈন্য প্রাণ হারায় এবং ২৬ জনকে গ্রেফতার করি। গ্রেফতারকৃতদের নিকট জানতে চাই, এত বিপুল সংখ্যক সেনার উপস্থিতি সত্বেও কেন তোমরা পরাজিত হলে? তারা উত্তর দিলো, চতুর্দিক

দিয়ে আমাদের উপর কামান এবং মেশিনগানের গোলা বর্ষণ করা হচ্ছিলো যার সামনে দাঁড়ানোর মতো সাহস কিংবা শক্তি কোনটাই আমাদের ছিলো না।” আরসালান বলেন, বাস্তবতা হলো আমাদের নিকট কোন কামান কিংবা মেশিনগান ছিলোনা।

দুটি ট্যাংক ও ২২জন রুশ সেনা পাঁচজন মুজাহিদ কর্তৃক আটক

ইসলামাবাদস্থ ইসলামী সেন্টারের ডাইরেক্টর আসলাম শেরওয়ানী এই ঘটনাটি শুনালেন; ‘ চিক্রী’ গ্রামের বাসিন্দা মুহাম্মাদ সিদ্দীক তাকে বলেছেন যে, একবার দুশমনের সাথে আমাদের মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। সে সময় আমরা পাঁচ জন মুজাহিদ সেখানে ছিলাম। আর দুশমনের সংখ্যা সম্পর্কে পরে জানতে পারি যে, তারা ২২ জন যোদ্ধা দুটি ট্যাংক সহ আমাদের মোকাবেলা করে। আমাদের নিকট নামে মাত্র অস্ত্র ছিলো। কিন্তু যখন আমাদের এক সাথী হাতে একটি গ্রেণেড নিয়ে দুশমনের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লো যে, অস্ত্র ফেলে দাও অন্যথায় একজনও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবেনা। রাব্বুল আলামীন তার এই এক আওয়াযের মাধ্যমে দুশমনের মনে এমন ভীতির সঞ্চার করলেন যে, তারা অকল্পনীয় ভাবে আত্মসমর্পণ করে বসলো। এভাবে দুটি ট্যাংক সহ ২২জন রুশ সেনাকে আমরা গ্রেফতার করি। উল্লেখ্য এর পূর্বে তারা আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানিয়েছিলো, অথচ একই বাক্য আমরা একবার

উচ্চারণ করার সাথে সাথে তারা ভয়ার্তভাবে অসহায় আত্মসমর্পণ করে বসে।

অল্প সংখ্যক মুজাহিদ দুশমনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালেন

ঈদুল আযহার পবিত্র রাত। অধিকাংশ মুজাহিদ সুন্নতে ইব্রাহীম পালনের উদ্দেশ্যে বাড়িতে চলে গিয়েছেন। দখলকৃত ছাউনীতে অল্পসংখ্যক মুজাহিদ অবস্থান করছিলেন। গুপ্তচর মারফত এই সংবাদ অবগত হয়ে রাশিয়ানরা সুবর্ণ সুযোেগ ভেবে বিপুল সংখ্যক বোমারু বিমান, ট্যাংক ও সাজোয়া যান নিয়ে অতর্কিতে ছাউনীর উপর হামলা শুরু করলো, বিমান থেকে মুহুর্মুহু বোমা নিক্ষেপ করে তারা মুজাহিদদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে চাইলো। মুজাহিদগণ ধৈৰ্য্য ও দৃঢ়তার সাথে দুশমনের মোকাবেলা করতে লাগলেন। সকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চললো, অবশেষে অসংখ্য সৈন্য ও সবধরণের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে হামলাকারী রাশিয়ানরা অল্প সংখ্যক মুজাহিদের হাতে চরমভাবে মারখেয়ে পিছু হটলো। মুজাহিদগণ প্রচুর পরিমাণ কামান, মেশিনগান ও ৫০টি বিভিন্ন ধরণের গাড়ী গণীমত হিসেবে লাভ করেন। দুইশত চল্লিশজন সেনাকে তারা হাতে নাতে গ্রেফতারও করেন।

প্রথম আক্রমণেই ধরাশায়ী

মুজাহিদ আবু উবাইদাহ আমায় বললেন যে, ১৪০৩ হিজরীর ঈদুল আযহার তিন দিন পূর্বে

আমরা এক পাহাড়ী উপত্যকায় বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলা নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম। আচমকা ৩/৪টি রাশিয়ান প্লেন এসে আমাদের উপর বোমা বর্ষণ শুরু করে। আমি কামানের একটি গোলা প্লেনের উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারি, আল্লাহর অসীম দয়ায় আমার নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে একটি মিগ-২৫ জঙ্গী বিমান আমাদের সামনে বিধ্বস্ত হয়ে অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়।

রাইফেল তাদের পায়ের সামনে পরে ছিলো
আবু উবাইদাহ এই ঘটনাটিও আমায় বললেন
যে, আমরা একটি ট্যাংক নিয়ে আরগুনে অবস্থিত কমিউনিস্ট ছাউনীর উপর হামলা চালালাম। তাদের নিকট তখন ১২০ মিলি মিটার কামান, আর পি-জি রকেট লাঞ্চার ও ৬০টি ১০৬ মিলি মিটার ট্যাংক বিধ্বংসী কামান মজুদ ছিলো। তথাপি আমরা তাদের তিনটি ছাউনী দখল করে ফেলি। এক ছাউনীর এক কামরায় ১৭ জন রুশ সেনা অস্ত্র হাতে ঘাপটি মেরে বসে ছিলো। আবু উবাইদাহ বলেন, সেই ১৭ জনকেও আমরা জীবিত কয়েদ করলাম, অথচ তখন গুলীতে পূর্ণ রাইফেল গুলো তাদের হাতেই ছিলো। তারা ভীত সন্ত্রস্তভাবে সেগুলো পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে অবুজ শিশুর মতো কান্না জুড়ে দিলো।

গৌরবময় সাফল্য

খোস্ত-পাকতিয়ার পীর মুহাম্মাদ রূহানী আমায় বলেছেন যে, দুটি জঙ্গী বিমান ও ৫০টি ট্যাংক সামরিক যান আমাদের উপর আক্রমণ করে । আমাদের ১৩ মুজাহিদের মধ্য

হতে দুজন শাহাদাত বরণ করেন। পীর মুহাম্মাদ কসম খেয়ে বলেন যে, সেই যুদ্ধে আমরা রাশিয়ানদের ৮টি ট্যাংক জ্বালিয়ে দিই এবং ৮৫ জনকে জাহান্নামে পাঠাই। আর তারা সীমাহীন ক্ষতি স্বীকার করে যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যায়।

নয় বছর বয়সী ট্যাংক শিকারী মুজাহিদ

জমিয়তে ইসলামী আফগানিস্তানের নায়েবে আমীর নুরুল্লাহ ইমাদ বর্ণনা করেন যে, আমাকে এই ঘটনা বিশ্বস্ত ও নির্ভর যোগ্য এক মুজাহিদ শুনিয়েছেন। নয় বছর বয়সী এক বালক দুশমনের রাস্তায় ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন বিছিয়ে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই দুশমনের ট্যাংক সেই রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়। ট্যাংকের সৈন্যরা বাচ্চার রহস্যপূর্ণ চাহনী দেখে তাকে ধরে জানতে চায়, তুমি কে এবং এখানে কি করছো? বালক জবাব দেয়, আমি রাখাল। তারা আবার জানতে চায়, তোমার পালিত পশুগুলো কোথায়? এর উত্তরে বালক কিছুই বলতে না পেরে নীরব রইলো। তারা সন্দেহবশতঃ এবার বালককে ট্যাংকে উঠিয়ে নিলো। মাইন লুকানো স্থানে ট্যাংক পৌছার সাথে সাথে বালক বুঝতে পারলো যে, এবার ট্যাংক বিধ্বস্ত হবে এবং আমি শহীদ হয়ে যাবো, এই ভেবে সে তীব্র কণ্ঠে ‘আল্লাহু আকবারের, তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলো। ইতোমধ্যে প্রচন্ড বিস্ফোরণে ট্যাংক বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু আল্লাহর অসীম কুদরতে বালক সুস্থ শরীরে নিরাপদ দূরত্বে ছিটকে পড়ে, অথচ ট্যাংকের

অন্যান্য আরোহীরা ততাক্ষণে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

১২০ জন মুজাহিদ ১০ হাজার রাশিয়ানের মোকাবেলায় অটল রইলেন

উত্তর কাবুলের এই ঘটনা রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তানে দখলদারীত্ব কায়েমের প্রথম দিকের। সেই যুদ্ধে ১০ হাজার রাশিয়ানের মোকাবেলায় মাত্র ১২০ জন মুজাহিদ সিনা টান করে দাঁড়িয়ে যান। রাশিয়ানদের সাহায্যার্থে ৮০০ ট্যাংক এবং ২৫টি জঙ্গী বিমান সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিলো। যুদ্ধে চারশত রুশ সেনা ও ১৩০ মিলিশিয়া মারা যায়। ১৫০ টি ট্যাংক ধ্বংস হয় এবং গণীমত হিসেবে মুজাহিদগণ বিপুল অস্ত্র সজ্জিত ১১টি ট্রাক লাভ করেন।

রাশিয়ানদের লাশের দুর্গন্ধ

মুজাহিদ কমান্ডার মুহাম্মাদগুল আমায় জানিয়েছেন যে, কাবুলের কাছাকাছি এলাকায় সংঘটিত এক যুদ্ধে আমরা ৫০০ শত মুজাহিদ এবং বিপক্ষে রাশিয়ানদের কমপক্ষে দশ হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিলো। তারা ট্যাংক এবং বিমানের সাহায্যে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। সেই যুদ্ধে ১হাজার রুশ সেনা মারা যায়। দীর্ঘ এক মাস যাবত তাদের লাশের পচা দুর্গন্ধের কারণে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কয়েক মাইলের ভেতর হাটা চলা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

খাদ্য দ্রব্যের প্রয়াজোনীয়তা পূরণে গায়েবী মদদ

২৪ রমজান মোতাবেক ১লা মে ১৯৮৯ তারিখ
কোন এক প্রয়াজোনে আমি আফগানিস্তান যাচ্ছিলাম। আমাদের কাফেলায় দুই মোটর গাড়ীতে পূর্ব সিন্ধু, পান্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামগণ শামিল ছিলেন। তারা সকলে হরকতুল জিহাদিল ইসলামী পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

পিকআপে আমার সহযাত্রী হায়দ্রাবাদের বাসিন্দা মাওঃ সাআদাতুল্লাহ করাচী নিউটাউন মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। মাওলানা সাআদাত সুবিজ্ঞ আলিম এবং দুর্ধর্ষ মুজাহিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। আমি তার নিকট কথাচ্ছলে জানতে চাইলাম এই জিহাদে আপনি এমন কোন ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন কি, যা আপনার নিকট গায়েবী মদদ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেনঃআমি ১৯৮২ সাল থেকে জিহাদে শরীক হয়ে অদ্যাবধি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জিহাদে লিপ্ত রয়েছি। যদিও এই সাত বছরে আমি এমন অগণিত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু প্রথম বছরের কিছু ঘটনা চাক্ষুস করার পর আমার মনে জিহাদে আফগানিস্তান পুরোপরি দ্বীনের উপর পরিচালিত হবার ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কখনো সংশয় জাগেনি, জিহাদের বিরুদ্ধবাদীদের শত অপপ্রচারণাও আমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। একবার পাকতিয়া প্রদেশের আরগুন ছাউনীতে হামলা চালানোর পরিকল্পনা

মোতাবেক ছাউনী সংলগ্ন পাহাড়ে দূর পাল্লার মেশিনগান সহ অবস্থান নিলাম।

এই মেশিনগানের সাহায্যে উড়ন্ত জঙ্গী বিমান লক্ষ্য করেও গুলী নিক্ষেপ করা যেতো। আমাদের অবস্থান থেকে আরগুন ছাউনী এবং তার আশপাশের দুশমন সেনাকে সহজ নিশানা বানানো সম্ভব ছিলো। রাতে মাত্র ৪ জন মুজাহিদ পাহাড়ী ঘাটি পাহারা দিতেন। মুজাহিদ দলে শামিল গোয়েন্দা মারফত খবর পেয়ে কমিউনিস্ট বাহিনী রাতের আঁধারে ট্যাংক, সাজোয়া যান ও পদাতিক ফৌজ নিয়ে ৪ মুজাহিদকে ঘেরাও করে ফেলে, রুশ কমান্ডারের নেতৃত্বে তারা চুপিসারে মুজাহিদদের মোর্চার খুব কাছাকাছি শক্তভাবে পজিশন নেয়। মাওলানা সাআদাত বলেন, আমাদের অস্থায়ী মারকায কিছুটা দূরে থাকায় আমরা এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। ভোরের আবছা আলোয় রুশ সেনাদের উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্র প্রহরারত ৪ মুজাহিদ তাদের উদ্দেশ্যে ফায়ারিং শুরু করে।

গুলীর আওয়ায শোনামাত্র অস্ত্রহাতে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে ছুট দিই। কিন্তু প্রত্যেক পাহাড়ে দুশমনের কামান, মর্টার ও মেশীনগানের উপস্থিতির কারণে আমরা সতর্কতার খাতিরে পাহাড়ী খরস্রোতা নালা ধরে সাথীদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হই। বিশ্বাস করুন, বৃষ্টির ন্যায় অবিরাম গুলী আমাদের কিছুই করতে পারছিলো না। এরপর আমরাও প্রবল বিক্রমে দুশমনের উপর হামলা চালাই।

আসাদুল্লাহ , ফারুক এবং সামীউল্লাহ এ প্রসঙ্গে আমায় বলেছেন যে , কমিউনিস্টদের মধ্যভাগে হামলা চালাই। এই হামলায় ৭০ জন মুজাহিদ অংশ গ্রহণ করে এবং সফলতার সাথে অপারেশন শেষ করে নিরাপদ গন্তব্যে রওয়ানা হয়ে যায়। আমাদের কোন সাথী সামান্য আঘাত প্রাপ্ত না হওয়া সত্বেও ফেরার পথে ক্ষুধার তীব্রতায় আমাদের শরীর ভেঙ্গে পড়তে চাইলো। কারণ পূর্বের দুই দিন যাবত আমরা প্রায় অভুক্ত ছিলাম। মনে হচ্ছিলো , মারকায পর্যন্ত পৌছতে পারবোনা। আমরা আল্লাহর দরগাহে দোয়া শুরু করলাম ; হে আল্লাহ ! আমাদেরকে খাবার দান করুন। কিছুক্ষণ পর মাওলানা গুল মুহাম্মাদ পানি পান করার জন্য নালার উদ্দেশ্যে চলতে গিয়ে একস্থানে মুখ বন্ধ অবস্থায় একটি কৌটা পড়ে থাকতে দেখে তা উঠিয়ে আমাদের নিকট নিয়ে আসেন। চাকুর সাহায্যে কৌটার ঢাকনা তুলে দেখলাম , ভেতরে দুধের মাখন রয়েছে। আমরা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় ভাবতে লাগলাম এর সাথে বিষ তো মিশ্রন করা হয়নি ? মুজাহিদ হাশিম বলল , দাও সর্ব প্রথম আমি খেয়ে দেখি , যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে তোমরা সকলে প্রাণে বেঁচে যাবে। এই বলে সে খাওয়া শুরু করলো , তার মাঝে কোন ভাবান্তর না দেখে আমরা ও মাখন মুখে দিলাম। খাওয়া শেষে সেই রবের শুকরিয়া আদায় করলাম যিনি এমন স্থানে রিযিকের ব্যবস্থা করেন, যেখানে আমরা ভুলেও রিযিকের কল্পনা করিনা

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তা বের করে দিবেন। আর তাকে এমনভাবে রিযিক দান করবেন যে বিষয়ে সে কল্পনা ও করেনি।”

পানি চায়ে রূপান্তরিত হলো

যেয়ারত খান বর্ণনা করেন যে, জিহাদ চলাকালীন রমযান মাসে ইফতারীর পূর্বমুহূর্তে চায়ের কেতলীতে পানি ভরে আগুনের উপর রাখার পর স্মরণ হলো যে, চায়ের পাতি একদম শেষ হয়ে গিয়েছে। কেতলী চুলা থেকে নামানোর পর তা থেকে চায়ের সুমিষ্ট ঘ্রাণ ছড়াতে লাগলো। ঢাকনা তুলে দেখলাম পানি চায়ে পরিণত হয়েছে। আমাদের বিস্মিত চোখমুখ দেখে মাওলানা জালালুদ্দীন আফগানী বললেনঃ এ কেবলমাত্র জিহাদের বরকতের কারণে সম্ভব হয়েছে। ইতোপূর্বে রাশিয়ানরা তাদের ফৌজ ভেবে হেলিকপ্টার থেকে আমাদের মারকাযে খাদ্য দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। আসাদুল্লাহ আবু সাঈদ বলেন যে, আমরা মাজার-ই-শরীফে দুশমনকে অবরোধ করে রাখি, এক পর্যায়ে তাদের রসদে ঘাটতি দেখা দেয়। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে রুশ হেলিকপ্টার রসদ সরবরাহ করতে আসে। তাদের নিক্ষিপ্ত ৮০টি খাদ্য দ্রব্য ও ঔষধ পত্রের বস্তা আমাদের সামনে পড়ে। আর ১২টি বস্তা তাদের রুশ সহযোদ্ধাদের হাতে যায়।

নির্জন এলাকায় হঠাৎ তাবু পরিলক্ষিত হলো

সায়্যেদ করীম লশকরী বর্ণনা করেন যে, আমরা ১১ জন মুজাহিদ এক দিকে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ রাশিয়ান মিগ ২৫ আমাদের উপর বোমা বর্ষণ শুরু করে। বিষাক্ত গ্যাস মিশ্রিত বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায়। অভুক্ত অবস্থায় আমরা তিনদিন কাটিয়ে দিলাম। সেখান থেকে মারকাযে পৌঁছতে হলে সুদীর্ঘ নির্জন উপত্যকা পাড়ি দিয়ে যেতে হবে, একজনের শরীরেও অতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার মতো শক্তি অবশিষ্ট ছিলো না। কিন্তু হতোদ্যম না হয়ে আমরা কচ্ছপ গতিতে মারকায লক্ষ্য করে রওয়ানা হলাম, হঠাৎ বিরান ভূমিতে একটি তাবু পেলাম যেখানে এক নারী অবস্থান করছিলেন। আমরা মানুষের অস্থিত্ব টের পেয়ে প্রফুল্লচিত্তে তার নিকট হাযির হয়ে তীব্র ক্ষুধার কথা বললাম। মহিলা আমাদেরকে গরম রুটি ও হালুয়া খেতে দিলো। খাবার শেষে নতুন প্রাণশক্তি লাভ করে আমরা মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পূর্বের পথে অগ্রসর হলাম। কয়েক কদম চলার পর পেছনে ফিরে কোন তাবু কিংবা মহিলার চিহ্ন দেখলাম না, ভাজোবাজির ন্যায় কোথায় যে তাবুসহ তিনি উধাও হলেন তা আল্লাহই ভাল জানেন। পরে বুঝলাম যে, এই বিরান মরুভূমিতে আমাদের সাহায্যের জন্যই রাব্বুল আলামীন তাবু এবং মহিলা পাঠিয়েছিলেন।

আটা শেষ হলো না

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আলী বলেছেন
যে, আমি আমার ঘরের জন্য আফগান ওজনে ৩৫ সের অথবা ২৪৫ কেজি আটা খরিদ করলাম। আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৬জন, এই আটা তাদের দুই মাসের প্রয়াজোন পূরণ করতে পারতো। আমার ঘরে প্রায় দিন কোন না কোন মুজাহিদ হাযির হতো। তথাপি সেই আটার সাহায্যে নয় মাস যাবত আমার পরিবারের খাবারের প্রয়াজোন মিটেছে, এবং পরিবারের সদস্যরা সেই স্থান ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে দ্বিতীয়বার আটার ব্যবস্থা করতে হয়নি। মজার ব্যাপার হলো তারা হিজরত করার পর অবশিষ্ট আটা প্রতিবেশীকে দিয়েছি। তখনো পর্যন্ত এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৮৪ কেজি আটা অবশিষ্ট ছিলো। আমি জানি, মুজাহিদগণ আমার ঘরে মেহমান হবার বরকতেই কেবল মনটা সম্ভব হয়েছিলো।

মরুভূমিতে আঙ্গুর

কাবুলে মৌলবী ইউনুস খালিসের এক কমান্ডার আব্দুল জব্বার বলেন যে, আমরা কাবুলের উপকণ্ঠে এক অভিযান চালাই। অভিযানের সময় আমরা প্রচন্ড ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভব করি। সামান্য পানি ও রুটির জন্য আমরা অস্থির হয়ে উঠি, এসময় মরুভূমিতে একস্থানে আঙ্গুর পড়ে থাকতে দেখি। অথচ সেখানে কোন মানুষ অথবা বৃক্ষের নাম নিশানাও ছিলো না।

হেলিকপ্টারের মোকাবিলায় যুবক নাসরুল্লাহ

সাইফুল ইসলাম বললেন তার ভাই নাসরুল্লাহ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, সে মুলতান তালীমুল কুরআন মাদ্রাসায় শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। ১৯৮২ সালে নাসরুল্লাহ জিহাদে যোগ দেয়। ১৯৮৬ সালের ৪ঠা মে একটি গাড়িতে সওয়ার হয়ে সে পাকতিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিছু গুরত্বপূর্ণ জিনিস পৌছানোর দায়িত্ব নিয়ে নাসরুল্লাহ পাকতিয়া যাচ্ছিলো। সে সাপীদা নারী’ নামকস্থানে পৌঁছার পর রুশ জঙ্গী বিমানের আওয়ায শুনে সামান্য সময়ের জন্য থমকে দাঁড়ায়। সে নিজের ভাই হুসাইন আহমদ ও মুহাম্মাদ মাজীদকে পাহাড়ের দিকে পাঠিয়ে দেয়। তারা উভয়ে কুরআনে কারীমের হাফেয ছিলো। তারা পাহাড় চূড়ায় আরোহন করে দেখতে পায় সামনের উপত্যকায় কয়েকটি হেলিকপ্টার মাটিতে নামছে। দুটি হেলিকপ্টার মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে তার ভেতর থেকে বিশেষ কমান্ডো বাহিনী লাফিয়ে বাহিরে পা রাখলো। অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে নাসরুল্লাহ কালবিলম্ব না করে আক্রমণ করে বসলো। তার নিকট তখন কালাশনিকভ রাইফেল ছাড়াও একটি আর, পি, জি রকেট লাঞ্চার ছিলো।

নাসরুল্লাহ কমান্ডোদের উপর ফায়ারিংয়ের পাশাপাশি হেলিকপ্টারের উদ্দেশ্যে রকেট লাঞ্চার নিক্ষেপ করলো। রকেট লাঞ্চার টার্গেটের উপর ঠিকভাবে আঘাত হানলেও তার পূর্বেই দুশমন বাহিনী

নাসরুল্লাহর উপর জওয়াবী হামলা চালালো। কালাশনিকভের একটি গুলী তার চোখের নীচ দিয়ে ঢুকে কানের পাশ দিয়ে ছিটকে বের হলো। দ্বিতীয় গুলী তার রানের হাড্ডি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো, এবং গ্রেনেডের এক ছোট্ট টুকরো কোমরে আঘাত করলো। রাশিয়ানরা যে কোন মূল্যে তাকে জীবিত গ্রেফতার করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু মারাত্মক রকমের যখমী অবস্থায়ও নাসরুল্লাহ চার রুশ শ্বেত ভলুককে জাহান্নামের পথ ধরিয়ে দেয়। ইত্যবসরে অন্য মুজাহিদগণ তার সাহায্যে পৌছে দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং আল্লাহর দয়ায় সে সুস্থ হয়ে ওঠে।

দস্তরখান এবং হাতের প্রদীপ

জাভেদ এবং মুহাম্মাদ কবীর আমায় বলেছেন যে আমরা জাজী মারকায থেকে সায়্যেদ খানের দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে মনে পড়লো যে, কতিপয় আরব সাথী আমাদেরকে দস্তরখান এবং ছোট্ট লাইট নিয়ে যাবার জন্য বলেছিলেন। আমরা সেখানে বসে কী করনীয় সে সম্পর্কে পরামর্শ শুরু করলাম। নির্দিষ্টস্থানের উদ্দেশ্যে পুনরায় রওয়ানা করবো যেন বন্ধুদের সামনে লজ্জা না পেতে হয়। কিন্তু তা সংগ্রহ করে দ্বিতীয়বার ফিরতি পথ ধরা অসম্ভব কাজ ছিলো। সুতরাং পেছনে না ঘুরে সোজা সামনে চলতে লাগলাম। আচমকা সামনের রাস্তায় কিছুদূর অগ্রসর হবার পর একদম নতুন একটি দস্তরখান ও লাইট পড়ে থাকতে দেখলাম।

আল্লাহু আকবার! কতোইনা মহীয়ান সেই সত্ত্বা যিনি মানব মনের ভেদ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন। এবং যিনি আমাদের চাহিদাগুলো পূর্ণ করে দেন।

আমার নিকট যদি একটি রুটি খরিদ করার পয়সা থাকতো

মুজাহিদ সায়্যাফ এক গরীব মাদ্রাসা ছাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার সামনে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন। “আমি অত্যন্ত গরীব এক মাদ্রাসা ছাত্র, কাবুলের বাজার দিয়ে চলার সময় ক্ষুধার তীব্রতায় কাতর হয়ে মনে মনে বললাম, আমার নিকট যদি একটি রুটি খরিদ করার পয়সা থকতো! আল্লাহর নিকট এই কামনা শেষে তিন/চার কদম সামনে না যেতেই কাবুল পুলিশ বিভাগের এক শীর্ষ কর্মকর্তার গাড়ী আমার পাশে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে দাড়ালো। সে দোকানে রুটিন মাফিক চেকিং করতে এসে দেখে যে, রুটির ওযনে সামান্য কম আছে। এ অবস্থা দেখে অফিসার সকল রুটি বাজারে উপস্থিত লোকদের মাঝে বন্টন শুরু করে, যার একটি আমিও লাভ করি । আমি ভাবলাম, আরেকটি রুটি নিবো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এলো যে, আমি রবের নিকট একটি রুটিই চেয়েছিলাম এবং তিনি তা আমাকে দিয়েছেনও। সুতরাং মাওলার শোকর আদায় করে ধীর পায়ে বাজার ত্যাগ করলাম।

পাথরের সাহায্যে ক্ষুধা নিবারণ

ডাক্তার মুহাম্মাদ সাঈদ বর্তমানে পাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। ছাত্রাবস্থায় যিনি দীর্ঘদিন আফগান মুজাহিদদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। তিনি অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আমি অসুস্থ মুজাহিদদের শুশ্রুষা করছিলাম, এসময় এক মুজাহিদ আমার নিকট এসে জানালো যে, অধিকাংশ সময় আমার পেট খারাপ থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি খাওয়া দাওয়া কি করেন? তিনি যে গুলোর নাম বললেন তার মাঝে আপত্তিকর কিছু ছিলো না। এরপর আমি তাকে বারংবার অন্য কিছু খেয়েছেন কিনা প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আরো কতিপয় মুজাহিদ সহ আমি দুশমনের ঘেরাওয়ের মাঝে পড়ে যাই। আমাদের খাবার দাবার তেমন কিছুই ছিলোনা। কিছু কচি ঘাস খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করলাম। ঘাস শেষ হলে ছোট ছোট পাথর খাওয়া শুরু করলাম। জানতে চাইলাম, পাথর কীভাবে খেতেন? তখন তিনি আমার সামনে পাথর মুখে দিয়ে চিবানো শুরু করলেন, অতঃপর বিনা বাক্যে কামরা থেকে চলে গেলেন। আমি বুঝলাম, এই পাথরের কণাই তার পেট খারাপ করে দিয়েছে।

গাযীদের কারামতী

লোগড়ের বাসিন্দা মুহাম্মাদ ইয়াসীন বর্ণনা করেন, আমরা ৩১ জন মুজাহিদ দুহান্দী নামক স্থানে গেলাম, তখন আমাদের

নিকট কোন খাদ্য দ্রব্য ছিলো না। লোকালয়ে খাবারের সন্ধানে গেলাম, কিন্তু সেখানকার লোকজন আমাদেরকে খাবার দিয়ে সাহায্য করতে অস্বীকার করলো। তারা আমাদেরকে হুকুমতের মিলিশিয়া মনে করেছে। যদিও কাছ থেকে খাবার সংগ্রহ করার শক্তি আমাদের ছিলো। কিন্তু আমরা এমন না করে ক্ষুধার্ত থাকাকে শ্রেয়তর মনে করে পিচ্ছিল বরফের রাস্তা ধরে ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে গেলাম, কেননা পূর্বের ৩৬ ঘন্টা যাবত আমাদের পেটে কোন দানা পানি পড়েনি। চলতে চলতে আমরা একস্থানে সবুজ থলি পড়ে থাকতে দেখে হাতে তুলে তার ভেতর ১ কেজির সমপরিমাণ গোশত পেলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না। বুঝতে পারলাম, মাওলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রয়াজোন মিটানো হচ্ছে। কিন্তু ৩১ জন ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য ১ কেজি সামান্যই মনে হলো। আল্লাহর নাম নিয়ে রান্না শেষে খাওয়া শুরু করতেই গোশত শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা গেলোনা। আমরা সবাই পূর্ণ পরিতৃপ্ত হলেও গোশতের মাঝে সামান্যতম কমতি হলোনা। পথিমধ্যে পক্ষত্যাগী ৬ আফগান সেনা আমাদের সাথে যোগ দিলো। তাদের সহ আরো অনেক লোককে অবশিষ্ট গোশত খেতে দিলাম, কিন্তু তা পূর্বের মতোই রইলো। পরবর্তী তিনদিন সেই গোশতই আমাদের খাদ্যের অভাব মিটিয়েছে। মুহাম্মাদ ইয়াসীনের বিবৃত এই ঘটনা ১৯৮৫ সালের।

ক্ষুধার্ত মুজাহিদদের জন্য গায়েবী মদদ

পাকতিয়ার বিখ্যাত কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী বিবৃত এই ঘটনা জিহাদের প্রথম দিকের। সর্বত্র মুজাহিদগণ শোচনীয় অবস্থার মুখোমুখি হলেন। অস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্যের যোগান ছিলোনা। কমিউনিস্ট হুকুমত অধিকাংশ মুজাহিদের স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি জব্দ করে নেয় এবং বাড়ী ঘরও তাদের আগুনে ভস্মীভুত হয়। পাকিস্তান তখনো মুজাহিদদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। মাওলানা জালালুদ্দীন বলেন, মুজাহিদগণ কয়েকদিন যাবত ক্ষুধাপিপাসায় কাহিল হয়ে পড়েন। আমি উদ্ভ্রান্ত হয়ে ভাবতে লাগলাম খোরাকীর কী ব্যবস্থা করবো? ফজর নামায শেষে জায়নামাযে বসে রইলাম। এরূপ চরম মুসীবতের মুহূর্তে আমি সেখানে বসেই গভীর ঘুমে অচেতন হলাম। স্বপ্নের মাঝে রাগী চেহারার এক বুজুর্গ ব্যক্তিকে আমার সামনে দেখতে পেলাম। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, জালালুদ্দীন! তুমি পেরেশান হয়ে আছো কেন? জিহাদে শরীক হবার পূর্বে তোমাদেরকে কে রিযিক দান করতেন? তোমরা ত্রিশ বছর জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলে তথাপি আল্লাহ তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। আজ যখন তোমরা তাঁর রাহে জিহাদ করছো তখন নিজেদের রিযিকদাতার উপর এই আস্থাটুকু কেন রইলোনা যে, এখনো তিনি তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে রিযিক দিতে পারেন? আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখো। তার ব্যাপারে নিজের মনের মাঝে সামান্য ভুল ধারণাকে স্থান দিওনা। তোমরা আল্লাহর

রাস্তায় অবিচল থাকলে তিনি কখনো তোমাদের রিযিক সংকীর্ণ করবেননা। অতঃপর তিনি নিকটস্থ গাছের দিকে ইশারা করে বললেন, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত থাকলে এরূপ গাছের ডালে গোশত ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। এরপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আমিও বিনিদ্র হলাম। স্বপ্নের ঘটনা আমার মনোবল বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিলো এবং দুর্ভাবনা দূরীভূত হলো। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম, দুই হাতে দুটি জবাই করা বকরী নিয়ে এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে বলতে লাগলো আল্লাহর রাহের মুজাহিদদের জন্য সামান্য তোহফা কবুল করুন। আগন্তুক বকরী দুটিকে স্বপ্নে নির্দেশিত গাছে ঝুলিয়ে চামড়া ছাড়া করতে লাগলেন। এই স্বপ্নের মাধ্যমে আমি জীবনের তরে বাস্তব শিক্ষা লাভ করলাম যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর আস্থা রেখে তার রাহে জিহাদে লিপ্ত হবে আল্লাহ তার মদদে প্রয়াজোনীয় সবকিছু করবেন। শর্তহলো অবিচলতা প্রদর্শন করতে হবে।

পানির পিপাসা অনুভূত হলে খর মৌসুমে বরফপাত হলো

গুল মুহাম্মাদ আমায় শুনালেন যে, একদা বিশাল দুশমন বাহিনী আমাদের উপর হামলা করে। দুশমনের প্রচন্ড হামলার মুখে আমরা সুলতান সাইফ পর্বত শ্রেণীর দিকে পিছপা হতে বাধ্য হলাম। পাহাড়ী খানা খন্দক অতিক্রম করার সময় তীব্র পিপাসা অনুভূত হলে আমাদের বুযুর্গ সাথী মৌলভী

বাহরাম আকাশের দিকে হাত তুলে দীর্ঘ সময় যাবত দোয়া করতে লাগলো; হে আল্লাহ! আমরা তোমার অসহায় বান্দা, তোমার রাস্তায় পা রেখেছি শুধু মাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের এরাদায়, আমাদের পিপাসা লেগেছে এখন তুমি পানির ইন্তেযাম করে দাও। তার দোয়া শেষ না হতেই আকাশ থেকে বরফপাত শুরু হলো। আমরা সেই বরফের সাহায্যে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম।

বরকতময় আপেল

গুল মুহাম্মাদের ভাষায় আরেকটি ঘটনাঃএকবার আমরা ৫০জন মুজাহিদ রুশ সেনাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমাদের তুলনায় দুশমনের সংখ্যা অনেক বেশী ছিলো, আমাদের খাদ্যবস্তু নিঃশেষ হয়ে গেলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়ায় দুশমনের মনে আমাদের ব্যাপারে অজানা ভীতি দেখা দিলো, ফলে তারা আমাদের উপর হামলার দুঃসাহস করলোনা, অবশ্য হঠাৎ দুয়েকটি গুলী বিনিময় চলছিলো। কিন্তু দুশমন ধীরে ধীরে তাদের ঘেরাও সংকীর্ণ করে ফেলছিলো। খাদ্য দ্রব্য নিঃশেষ অবস্থায় আমরা চারদিন অতিবাহিত করলাম, ক্ষুধার্ত মুজাহিদগণ ফল অথবা এ জাতীয় অন্য কোন খাদ্যের সন্ধানে বের হলেন। কিছুক্ষণ পর এক নির্জন বাড়ীতে তারা আপেল পূর্ণ একটি গাছের খোঁজ পেলেন। আমরা ৫০ জন মুজাহিদ ২৫ দিন যাবত ঐ গাছের আপেল দ্বারা আমাদের খাদ্যের প্রয়াজোন মিটালাম। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় এই

যে, গাছটিতে প্রতিদিন আপেল হাস না পেয়ে পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেতো।

আফগান মুজাহিদদের উপর দুশমন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত গুলী ও বোমা কার্যকর না হবার ঘটনাবলী ১৯৮৮ সালে কমান্ডার জালালুদ্দীন হক্কানী আমায় এই ঘটনাটি শুনালেন

খোস্তের যুদ্ধক্ষেত্রে দুশমন বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র এবং রকেট লাঞ্চারের সাহায্যে বোমা নিক্ষেপ করছিলো। নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুর দিকে এই রকেট অথবা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে মারার পর সেটি কিছু সময় শূন্যে স্থির থেকে সোজা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। রাশিয়ানরা তাদের জঙ্গী বিমান বিপদমুক্ত রাখার জন্য এই প্রযুক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। এই যুদ্ধে আমি নিজেও শরীক ছিলাম। আচমকা দুশমন নিক্ষিপ্ত বোমা আমাদের মাথার উপর শূন্যে এসে স্থির রইলো, আমরা যমীনে শুয়ে পড়ে শাহাদাতের অপেক্ষা করতে লাগলাম। সহসা নীচের যমীনে কম্পন অনুভব করলাম। দুশমন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বোমা আমাদের কিছুদূরে প্রচন্ডরূপে বিস্ফোরিত হলো, কিন্তু আমরা সামান্য বালু কণার স্পর্শও পেলাম না। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিলাম, এসময় দুশমন নিক্ষিপ্ত রকেট আমাদের একদম নিকটে এসে স্থির হলো। এটি এতো কাছাকাছি এসে বিস্ফোরিত হলো যে, ধূলা বালু ও পাথর কণা আমাদেরকে ঢেকে ফেললেও মাওলার দয়ায় কেউ যখমী হলাম না। একটুপর তৃতীয় রকেট

বোমা আমাদের মাথার উপর উদয় হলো। এবার আমরা মৃত্যুকে সুনিশ্চিত মনে করে কালিমা পড়া শুরু করলাম। কিন্তু বোমাটি কয়েক গজ দূরে পড়ে মাটির ভেতর ঢুকে গেলো, এটি বিস্ফোরিত হলে শাহাদাত ব্যতীত দ্বিতীয় কোন রাস্তা আমাদের সামনে খোলা ছিলোনা।

গুলী বৃষ্টির ভেতর দিয়ে বের হয়ে আসা

খলীফা সুবহান বলেন, এক রুশ অফিসারকে হত্যা করার মানসে আমি বেশ বদলে মটর সাইকেলে চড়ে তার এলাকায় প্রবেশ করলাম। আমি কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই প্রায় শ'খানেক রুশ সেনা আমায় আটকানোর চেষ্টা করলো। অবস্থা দৃষ্টে আমি পলায়নের রাস্তা ধরলাম। তারা সবাই আমার উদ্দেশ্যে বৃষ্টির ন্যায় গুলী বর্ষণ শুরু করলো, কিন্তু একটিও আমি অথবা আমার সাইকেলে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়। আমি আজ অবধি হয়রান হয়ে ভাবি যে হাজার হাজার গুলীর মুখে আমি কীভাবে নিরাপদে বের হয়ে এলাম?

মুজাহিদদের সাথে ক্ষেপণাস্ত্রের বন্ধুসুলভ আচরণ

জালালুদ্দীন হক্কানীর মুজাহিদ বাহিনীর পাকতিয়া নিবাসী বিখ্যাত কমান্ডার উমরখান বর্ণনা করেন, ১৯৮৫ সালের প্রথমদিকে আমরা তাবুর ভিতরে অবস্থান করছিলাম, এ সময় একটি ক্ষেপণাস্ত্র তাবুর উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে সকল আসবাব পত্র

জ্বালিয়ে ছারখার করে দিলেও মুজাহিদদের কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি।

একই রকম আরেকটি ঘটনা যাওর’ মারকাযের মুজাহিদগণ শুনিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খিমাও আমায় দেখিয়েছেন।

এক মুজাহিদ কর্তৃক গুলি শূন্য রাইফেলের সাহায্যে সশস্ত্র ৮ দুশমন সেনা আটক

হরকতের গেরিলা মুজাহিদ করাচীর বাসিন্দা ভাই খালিদ মাহমুদ বললেন, বারুদ বিছানো উপত্যকা অতিক্রম করার সময় আমাদের যে সকল সাথী ভাই গুরুতররূপে যখমী হলেন তারা সেখানেই রইলেন। আর হালকা যখমীগণ যখমের থোড়াই পরোয়া করে পোষ্টের দিকে অগ্রসর হলেন। দুশমন বাহিনী উপরভাগে মোর্চা বানিয়ে পূর্বেই মযবুতভাবে অবস্থান নিয়ে বসেছিলো। তারা মোর্চা থেকে আমাদের লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ারিং করতে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক মুজাহিদ নির্ভীকচিত্তে দৃঢ় পদে মোর্চা অভিমুখে চলতে লাগলেন। সম্মুখে ঝুলন্ত মোটা রশি দেখতে পেয়ে আমি তার সাহায্যে উপরে উঠতে থাকি। এবার আমি বিস্ফোরকের বিপজ্জনক এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে উঠে এলাম। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে ডানদিকের মোর্চায় তিনজন রাশিয়ান সৈন্যকে বসে থাকতে দেখি, তারা আমার সাথীদের লক্ষ্য করে কালাশনিকভের গুলি বর্ষণ করছিলো। আমি তাদের এত কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম যে, আমার পক্ষে আত্মগোপনের মতো কোন মওকা ছিলো না। কিন্তু অন্ধকারের কারণে তারা আমাকে তাদের

সহযোদ্ধা মনে করলো। তারা অগ্রসরমান মুজাহিদদের দেখিয়ে আমাকে বলতে লাগলো, ভাই,দ্রুত এসে আমাদের সাথে হাত চালাও, ওরা সামনে চলে যাচ্ছে। তাদের কথা শুনে নিঃশব্দে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে পা চালিয়ে একটু সামনে ভগ্নপ্রায় এক কামরা দেখতে পেলাম, দ্রুত কামরার আড়ালে পজিশন নিয়ে মোর্চার সৈন্যদের উদেশ্যে গুলি ছোড়া শুরু করলাম। পেছনদিক থেকে গুলি আসতে দেখে তারা ভীত হয়ে মোর্চা ছেড়ে বাহিরে পলায়ন করলো। আমি জানতাম যে, পশ্চিম দিকে তাদের কামান গুলো হামলার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় আছে। সেগুলো দখলে নেবার জন্য তড়িৎ গতিতে সেদিকে অগ্রসর হলাম। অন্ধকারের সুযোগে কামানের খুব কাছাকাছি পৌছে গেলাম। সেখানে ৪জন সশস্ত্র ফৌজ পাহারা দিচ্ছিলো। গুলী চালাতে উদ্যত হবার মুহূর্তে দেখলাম আমার রাইফেল গুলী শূন্য হয়ে গেছে। আমি রুশ সেনাদের এতো কাছাকাছি ছিলাম যে, গুলীর ম্যাগাজিন পাল্টানোর সামান্য আওয়াযও তাদেরকে খবরদার করে দিতে পারে। আমার উপস্থিতি টের পেলে আমি গুলী শূন্য ম্যাগাজিন পূর্ণ করার পূর্বেই হয়তো তারা আমায় গুলীর আঘাতে উড়িয়ে দিবে। সহসা আমার মাথায় অন্য ভাবনা আসতেই আমি সন্তর্পনে তাদের মোর্চায় প্রবেশ করে কঠিন স্বরে আওয়ায দিলাম, “অস্ত্র ফেলে দাও।”

খোদার কী বিস্ময়কর কুদরত আমার সামান্য আওয়াযে তাদের মনে এমন ভীতির সঞ্চার হলো যে, তারা সমস্বরে বলে উঠলো; “তাসলীম তাসলীম” (আমরা অস্ত্র ফেলে দিলাম)

আমি এবার নির্দেশ দিলাম “তোমরা সবাই উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ো এবং নিজ নিজ অস্ত্র পাশে রাখো।” তারা যান্ত্রিকভাবে আমার নির্দেশ পালন করলো।

আমি মওকা পেয়ে মূহুর্তের মধ্যে গুলী শূন্য ম্যাগাজিন পূর্ণ করে তাদের মনে আরো বেশী ভীতি সৃষ্টির জন্য আকাশে কয়েকটি গুলী ছুড়লাম। এরপর পকেট থেকে লাইলনের রশি বের করে বললাম, এর দ্বারা একে অপরের হাত বেঁধে ফেলো। তারা বিনা বাক্যে আমার হুকুম তামীল করলো। এবার আমি তাদের রাইফেলের ম্যাগাজিন গুলো খুলে নিয়ে তাদেরকে অস্ত্রের মুখে সামনে চলার নির্দেশ দিলাম। ইত্যবসরে আমার অন্য সাথীগণ এসে হাযির হলে আমি তাদেরকে অন্য কয়েদীদের অন্তর্ভূক্ত করে দিলাম।

রকেট লাঞ্চারের আঘাতে মুজাহিদের পাগড়ি ছিদ্র হলো

১৫ জুলাই ১৯৮৫ এর এক বিকেলে খোস্তের পাগরাম এলাকায় ১৬জন মুজাহিদ বসে পরামর্শ করছিলেন। তাদের মাঝে ইয়ারখান নামে এক নওজোয়ান মুজাহিদও ছিলো। আচানক দুশমন নিক্ষিপ্ত একটি রকেট তার মাথার পাগড়িকে উড়িয়ে নিয়ে আনুমানিক দুই মিটার দূরে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু আল্লাহর রহমতে সকল মুজাহিদ অক্ষত থাকেন। আমি ইয়ার খানের পাগড়িতে রকেট লাঞ্চারের ছিদ্রের চিহ্ন নিজের চোখে দেখেছি।

অতুলনীয় বীরত্ব

কমান্ডার কারী নিয়ামতুল্লাহ বলেন, অগ্রসর হতে হতে যখন আমরা দুশমনের অবস্থানের নিকটে পৌঁছে গেলাম, তখন সামনে এমন একটি পাহাড় প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়ালো যার উপর রাশিয়ানরা অত্যাধুনিক মেশিনগান দিয়ে সৈন্যদের পাহারায় নিযুক্ত করেছিলো, দুশমন সেনা সেখান থেকে বৃষ্টির ন্যায় গোলা বর্ষণ শুরু করলে সাথীদের বললাম আল্লাহর নাম নিয়ে দ্রুত সামনে চলতে থাকো, গুলীর আঘাতে কেউ যখমী হলে তার পরোয়া না করে অন্যরা যে কোন মূল্যে পাহাড়ের অপর দিকে পৌছার চেষ্টা করবে।

প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার গুলী ছুটে আসছিলো, তাছাড়া সেখানে লুকানো মাইন উপস্থিতির ভয়ও ছিলো। কাশ্মিরের মুজাহিদ ওয়াকার আহমদ আমার বলা নির্দেশ শোনামাত্র সামনে অগ্রসর হয়ে “নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার” এর বুলন্দ আওয়ায দিয়ে মেশিন গানের গুলী এবং মাইনের ভয়কে উপেক্ষা করে পাহাড় অভিমুখে দৌড়াচ্ছিলো। তার দেখা দেখি অন্যরাও ছুটতে লাগলো এবং আল্লাহর অসীম দয়ায় নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে গেলো। এভাবে সেই পাহাড় অতিক্রম করে আমরা দুশনের আবাসস্থলের কাছে হাযির হলাম।

গোলা অবিস্ফোরিত থেকে গেলো

নাসরুল্লাহ বর্ণনা করেন, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, আমার দায়িত্ব ছিলো মর্টার সামলানো। আমি মর্টারের সাহায্যে দুশমনের পোস্ট লক্ষ্য করে শতাধিক গোলা নিক্ষেপ করি। গোলা নিক্ষেপের প্রথম দিকে লক্ষ্যস্থির করতে সামান্য সমস্যা হওয়ায় দুটি গোলা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছতে ব্যর্থ হলেও এরপর এই সমস্যা মিটে যায়। মর্টার সেট করতে আমার কিছুটা বিলম্ব হয়। মাগরিবের ওয়াক্তে আমি ছাউনীর উপর গোলা ছুড়তে থাকি এবং দুরবীন দিয়ে সতর্কতার সাথে দেখতে থাকি যেন ভুলবশতঃ আমার সাথীদের উপর আঘাত না হানে। খুব দ্রুত ৬৪ তম গোলা নিক্ষেপ শেষে পরবর্তী গোলা মর্টারে সেট করলেও বারুদ কম থাকার কারণে সেটি আমাদের সাথীদের মাঝে গিয়ে পতিত হয়। আমি দুরবীন দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে নিজের অলক্ষ্যে “আলহামদুল্লিাহ” বললাম, কারণ গোলাটি বিস্ফোরিত হয়নি, যদি গোলা বিস্ফোরিত হতো তাহলে আল্লাহই ভাল জানেন যে, কতো জন শহীদ এবং যখমী হতেন।

ট্রলির গোলার আঘাতে দুশমনের পলায়ন

পাকতিয়ার রাস্তায় আমরা ট্রলিতে সওয়ার হয়ে খোলা ময়দানের মধ্যবর্তী রাস্তা ধরে কোথাও যাচ্ছিলাম। ট্রলিতে রকেট লাঞ্চার এবং অন্যান্য হালকা অস্ত্র ও গোলা বারুদ ছিলো। ময়দানের আশপাশে লুকায়িত দুশমন আচানক আমাদের উপর গুলী

বর্ষণ শুরু করে। তাদের অভাবিত হামলা সত্ত্বেও আমরা সকলে চৌকিতে ট্রলি থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়তে সক্ষম হই। ইতোমধ্যে ট্রলিতে মজুদ গোলা বারুদে আগুন লেগে যায়। রকেট লাঞ্চার গুলো নিজে নিজেই নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে সেগুলো দুশমনের অবস্থানের উপর বিস্ফোরিত হয়। অবস্থা দৃষ্টে দুশমন কালবিলম্ব না করে এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে এবং আমরাও সুরক্ষিত থাকি।

এই ঘটনা হরকতুল মুজাহিদীনের আমীর মাওলানা ফযলুর রহমান খলীল ১৯৮৭ সালের মে মাসে আমাকে শুনিয়েছেন।

বিষাক্ত গ্যাসের কার্যকারীতা বিনষ্ট হলো

গাযী আব্দুল গাফফার খান বর্ণনা করেন
এক সংঘর্ষে আমাদের ৯ মুজাহিদের মোকাবেলায় দুশমনের হাজার খানেক সৈন্য হাযির হয়। তাদের সাহায্যে ট্যাংক ও অন্যান্য ভারী অস্ত্র শস্ত্র পৌছে যায়। আমরা যখন দুশমনকে পরাজয়ের কিনারে পৌঁছে দিয়েছি ঠিক তখন তাদের জঙ্গী বিমান আমাদের উপর হলুদ বর্ণের বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপ করে। এই বিষের সংক্রমণে মানুষ তৎক্ষণাত বেহুশ হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরেই দক্ষিণ দিক থেকে খোদায়ী মদদ হিসেবে প্রচন্ড বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে, বাতাসের তীব্রতায় মূহুর্তের মধ্যে গ্যাস উধাও হয়ে যায়।

কুরআনের সামনে ব্যর্থ গুলী মুজাহিদ গাউছুল্লাহর ভাষ্য

যুদ্ধাবস্থায় গাযী মুহাম্মাদ ফাতাহ এর সিনায় গুলী বিদ্ধ হয়। আমরা তার নিকট উপস্থিত হয়ে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখতে পাই। এক মুজাহিদ যখম দেখার ইচ্ছায় জামার ভেতরে হাত দিয়ে ভারী পকেট দেখতে পেলেন। তিনি পকেটে হাত দিয়ে কুরআনে করীম বের করে আনলেন, তাঁর উপরে গুলী আঘাত হেনেছে, কিন্তু কুরআনের কোথাও সামান্য ছিদ্র হয়নি।

জীবন্ত অলৌকিকতা

ডাক্তার আব্দুল হামীদ বর্ণনা করেন,
আমি শফীক নামে জনৈক যখমী মুজাহিদকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসি। তার সিনায় গুলী বিদ্ধ হয়ে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। গুলীর আঘাতে পিঠে ১৫ সেন্টিমিটার গভীর ক্ষত তৈরী হয়। অপারেশন করার সময় বুঝতে পারি যে, পাকস্থলী ও কলিজার কিছু অংশ গুলীর তোড়ে ছিন্ন হয়ে গেছে। সুস্থ্য হওয়া অসম্ভব জেনেও আমি তার অপারেশন সম্পন্ন করি। যখমী মুজাহিদ অপারেশন শেষে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলো। এক্সরে রিপোর্টে তার শরীরের অভ্যন্তরভাগে কোন যখমের চিহ্ন না দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইলো না।

৩০ গুলী পাজরে আঘাত হেনে বেরিয়ে গেলো

কমান্ডার জানদাদ খান নিজের ব্যাপারে অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটি শুনালেন; একবার রাশিয়ানরা আমাদের সাথে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। আমি গণীমতের মাল সগ্রহ করতে এক কামরায় প্রবেশ করলাম, সেখানে দুজন সশস্ত্র রুশ সৈন্য ওৎপেতে ছিলো। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে। তাদের রাইফেলের নল চেপে ধরি। তাদের কালাশনিকভের ত্রিশটি গুলী আমার পাঁজরে আঘাত হেনে ছিটকে বেরিয়ে যায়। আমার হাতও মারাত্মকভাবে যখমী হয়। তথাপি আমি হিম্মত না হারিয়ে উভয়ের রাইফেল কেড়ে নিয়ে তাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিই। মুজাহিদ জানদাদ খান কাপড় সরিয়ে আমাকে তার পাঁজরে অসংখ্য গুলীর দাগ দেখিয়েছে।

গুলীর আঘাতে কাপড় ঝাঝড়া হওয়া সত্বেও অক্ষত মুজাহিদ

লাহোরের সাংবাদিক ও সাহিত্য জগতের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব মিনহাজুদ্দীন ইসলাহী বর্ণনা করেন, আমি পেশোয়ারস্থ হিযবে ইসলামীর দফতরে বসেছিলাম, এমতাবস্থায় সেখানে এক মুজাহিদ উপস্থিত হয়। তার শরীরে গুলীর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন পোষাক শোভা পাচ্ছিলো, কিন্তু সে পুরোপুরি অক্ষত ছিলো। আমার প্রশ্নের উত্তরে মুজাহিদ বলল, এসব কিছু আল্লাহর মদদের কারণে হয়েছে, অন্যথায় কখনো কল্পনা করা

যায় যে, গুলীর আঘাতে পোষাক ছিন্ন ভিন্ন হবে অথচ শরীরে সামান্য আঁচড়ও লাগবেনা?

গুলী নিকটে এসে উল্টো পথে ফিরে যাচ্ছিলো

মাওঃ সাআদাতুল্লা আরেকটি ঘটনা শুনালেন, মাওলানা আরসালান রহমানী আরগুন ছাউনীর উপর অভিযান চালাবার জন্য মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, মেশিনগানের সাহায্যে প্রথমে ফায়ারিং করা হবে। রাতের বেলা ফায়ারিং এর উত্তম সময় বিবেচনা করে আমি পাহারাদারদের তালিকায় আমার নাম শামিল করলাম। দুশমন যে কোন উপায়ে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে নির্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করে বৃষ্টির ন্যায় গোলা বর্ষণ শুরু করে। রাতের আঁধারে গুলী অভিষ্টলক্ষ্যে আঘাত হানছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্য বিশেষ ধরণের আলোক মশাল শূন্যে নিক্ষেপ করা হয়। তখন আমার বিস্ময়ের শেষ রইলোনা যখন দেখলাম, দুশমনের গোলা আমাদের মোর্চার সামনে এসে উল্টো পথে ফিরে যাচ্ছে। সকালে অন্য সাথীদের এসম্পর্কে বললে তারা আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইলো না এবং রাতে নিজেরা প্রত্যক্ষ্য করার সিদ্ধান্ত নিলো। রাতের বেলা তারা আমার কথার সত্যতা যাচাই করা সত্বেও দুয়েকজন সাথী বলল, সামনে নিশ্চয়ই বড় কোন পাথর আছে যার সাথে টক্কর খেয়ে গুলী দিক পরিবর্তন করে। বাস্তবতা হলো, যদি সেখানে কোন পাথরের অস্তিত্ব থাকতো তাহলে অবশ্যই গুলীর আঘাতের তীব্র শব্দ শোনা যেতো এবং

সকল গুলী গতিপথ পরিবর্তন করে এক দিকে যেতো। সিদ্ধান্ত হলো সকালে ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করা হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকালে মোর্চার চতুর্দিকে অনুসন্ধানী চোখ লাগিয়ে কোন পাথরের অস্তিত্ব পাওয়া গেলোনা। এবার আমার সাথীদের মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মালো যে, এসব আল্লাহর মদদের নমুনা।

সেই মুজাহিদের ঘটনা যার শরীর বোমার আঘাতে দ্বিখন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সে দুই ঘন্টা জীবিত ছিলো

পাকতিয়া প্রদেশের যাওরান এলাকায় ফখরী নামক গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পাহাড়ের উপরে শহীদদের কবরস্থান রয়েছে। সেখানে ত্রিশ বছর বয়সী কমান্ডার শহীদ মৌলবী মুহাঃযারীফকে দাফন করা হয়েছে। মৌলবী যারীফের দুঃসাহসীকতা ও বাহাদুরীর ঘটনা এখনো পর্যন্ত মুজাহিদগণ মানুষের কাছে বর্ণনা করেন। তার জীবনের শেষ যুদ্ধের ঘটনা পড়লে আপনারাও বুঝবেন যে, তিনি কেমন ধরণের বীর মুজাহিদ ছিলেন। সেই যুদ্ধে যখন তিনি দুশমনের ট্যাংকবাহী কনভয়ের মোকাবিলা করছিলেন, তখন দুশমনের কামানের গোলার আঘাতে তার কোমরের নিম্নাংশ বাকী দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়। শরীর দ্বিখন্ডিত হবার পরেও মুহাম্মাদ যারীফ দু'ঘন্টা জীবিত ছিলেন। এই দু'ঘন্টাও তিনি মুজাহিদদেরকে নির্দেশনা দান করেন। দু'ঘন্টা শেষে দুশমন বাহিনী পরাজয় স্বীকার করতেই মৌলবী যারীফও শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করেন। বর্তমান যুগে দ্বিখন্ডিত শরীরে দুঘন্টা জীবিত থাকা অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা এজন্যই প্রকাশ পেয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একদিকে মুজাহিদদেরকে বিজয় দানে ধন্য করতে চান, অপরদিকে তিনি তাঁর মুসলিম বান্দাদেরকে তাঁর সাথীদের বিজয় প্রত্যক্ষ করাতে চান।

মাইনের উপর শুয়ে পড়া সত্ত্বেও তা বিস্ফোরিত হলো না

ফয়সালাবাদের বাসিন্দা আদীল আহমদ দীর্ঘদিন যাবত হরকতের নির্ভীক যোদ্ধা হিসেবে জিহাদে লিপ্ত রয়েছেন। আদীল আহমদ বললেন, সন্ধ্যা বেলায় যখন আমরা দুশমন পোস্টের উপর হামলা চালাচ্ছিলাম, তখন দুশমন জবাবী হামলায় আমাদের উপর প্রচন্ড বেগে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ শুরু করে। কমান্ডার খালিদ যুবায়ের সামনে চলছিলেন, অবস্থা বেগতিক দেখে যমীনের উপর শুয়ে পড়েন, দেখাদেখি আমরাও তাঁর অনুসরণ করি। এরইমধ্যে তাঁর ওয়ারলেসসেট হারিয়ে যায়। পরেরদিন ওয়ারলেসের সন্ধানে পূর্বের স্থানে পৌছে দেখতে পাই, যেখানে খালিদ যুবায়ের শুয়েছিলেন ঠিক সেখানে মাইন লুকানো রয়েছে। আল্লাহর সীমাহীন কুদরত দেখুন, কমান্ডার খালিদ সেই মাইনের উপর শরীরের পূর্ণ ওযনে শুয়ে পড়লেও সেটি বিস্ফোরিত হয়নি। বিস্ফোরণ ঘটলে কমান্ডার যুবায়েরের শাহাদাত অবধারিত ছিলো।

বারুদ থাকা সত্ত্বেও গোলা বিস্ফোরিত হলো না, বারুদ না থাকা সত্ত্বেও বিস্ফোরিত হলো

হরকতুল জিহাদিল ইসলামীর ৪র্থ শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার নাসরুল্লাহ বলেন, ১৯৮৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর দুশমন আচানক এক মর্টারের গোলা আমাদের মোর্চার উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারে, কিন্তু তা অবিস্ফোরিত অবস্থায় পড়ে থাকে। গোলাটি বিস্ফোরিত না হবার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, গোলার মুখে বারুদের রশি পুড়ে গিয়েছে, যার অর্থ গোলা অবশ্যই বিস্ফোরিত হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাযত করবেন সে জন্যই গোলাটি নিস্ক্রিয় করে দেন। হরকতের সাথীগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই গোলার উপর আমাদের সিকার এবং কিছু কথা লিখে দুশমন ছাউনীর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা হবে। যেন দুশমন বুঝতে পারে যে, আমাদের জন্য আল্লাহর মদদ রয়েছে। সুতরাং স্টিকার ও হরকতের শ্লোগান লিখে মর্টার তোপের সাহায্যে সেই গোলা দুশমন অবস্থান লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলাম। দুরবীনের সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাকিয়ে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলা। বারুদের ফিতা জ্বলে যাওয়া সত্ত্বেও যে গোলা মুজাহিদ ক্যাম্পে বিস্ফোরিত হয়নি, তা ই এবার আল্লার দুশমনের উপর প্রচন্ডরূপে বিস্ফোরিত হলো।

কুরআন অনুসারীদের বীরত্ব এবং গায়েব থেকে হেফাযত

উসামা বিন যায়েদ ক্যাম্পের কমান্ডার আসাদুল্লাহ এবং মুহাঃ ফারুক বর্ণনা করেন, মুজাহিদদের রাহবার ও আমীর মুহাম্মদ আমীন ইয়াত’ নামক গ্রামের নিকটবর্তী কান্টার নদীর তীরে বসেছিলেন। হঠাৎ দুশমন তার উদ্দেশ্যে মর্টারতোপের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। শায়খ আমীনের সাথে উপস্থিত নওজোয়ান মুজাহিদগণ চক্ষু লজ্জার কারণে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে ইতস্তত করছিলেন। গোলা খুব নিকটে পড়তে লাগলে তারা সবাই নিজ নিজ জানের খাতিরে ছুটলেন। কিন্তু শায়খ আমীন ধীরস্থিরভাবে সেখানে বসে সুললিত কণ্ঠে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করতে লাগলেন, যেভাবে হামলার পূর্বে করছিলেন। অথচ তিনি এমন খোলা ময়দানে অবস্থান করছিলেন যেখানে আত্মরক্ষার জন্য কোন নিরাপদ জায়গা ছিলোনা। মুহাম্মাদ আমীনের কাছাকাছি ১১টি গোলা পতিত হয়। একটি গোলা তার আধা মিটার দূরে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের ফলে বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়। শায়খ গর্তের বালির নীচে চাপা পড়েন। দূর থেকে শায়খের এই হালত দেখে নিরাপত্তার সন্ধানে ছুটে চলা মুজাহিদগণ চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেন। কিন্তু ধূলা বালি সরে যাবার পর দেখা যায় তিনি পূর্বের ন্যায় সহী সালামতে বসে কালামে পাকের তিলাওয়াতে মশগুল আছেন। পরবর্তীতে মুজাহিদগণ তার নিকট জানতে চাইলেন, আপনি কেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটলেন না? তিনি উত্তর দিলেন আমি

এই ভেবে লজ্জা পাচ্ছিলাম যে, আমার পলায়নপর অবস্থা দেখে ফেরেশতারা আল্লাহর নিকট অভিযোগ করতে পারে, “আপনার অমুক বান্দা কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত রেখে নিজের জানের খাতিরে পলায়নের রাস্তা এখতিয়ার করেছে”।

যেন তারা মিথ্যা না মনে করে

‘পারওয়ান' অঞ্চলের মুজাহিদ কমান্ডার আহমদী আমায় বলেছেন, আমরা দুইশত মুজাহিদ রাশিয়ানদের ৫শতাধিক ট্যাংক ও সাজোয়া যানের বহরে হামলা করে ২৭টি সামরিক যান ধ্বংস করলাম। ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র, ১২২ মিলিমিটার কামানে পূর্ন দুইটি ট্রাক, প্রচুর পরিমান হালকা যুদ্ধাস্ত্র আমাদের দখলে আসে । মারকাযের মুজাহিদগণ ভেবেছিলেন আমরা শহীদ হয়ে গিয়েছি। পরিচিতজন যখন দেখলো যে আমরা জীবিত আছি তাদের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। কিছুদিন পর গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার আমাদের পরিবারের জন্য সাহায্য স্বরূপ কিছু অর্থ প্রেরণ করেন। অর্থ হাতে পেয়ে আমরা হাসতে থাকি। অর্থ বাহকগণ হাসির কারণ জানতে চাইলে বললাম, আমাদের মধ্য হতে একজনও শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোট রাখেনি।

তোমরা আমাকে পাথর মারছো কেন

মুহাম্মাদ আকবর বললেন, জঙ্গী বিমানের আওয়াজ শুনে আমি মাটিতে শুয়ে

পড়লাম। আমার সাথী মারজান অবশ্য দাঁড়িয়ে ছিলো, হঠাৎ একটি বোমা তার কাঁধ ছুয়ে সামান্য দূরে গিয়ে পড়লো কিন্তু বিস্ফোরিত হলো না। মারজান মুখ ঘুরিয়ে সাথীদেরকে গালমন্দ করে বলল, তোমরা আমায় পাথর কেন মারছো? আমরা তাকে বোমার কথা বললে সে বড় বড় চোখে অবিস্ফোরিত বোমার দিকে তাকিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে লাগলো।

বিস্ফোরণ হলো কিন্তু-

কান্দাহারের আরগুস্তান বোলদাক এবং শিগাম এলাকার বিখ্যাত কমান্ডার গোলাম মুহাম্মাদ গরীব বর্ণনা করেন, আমরা ৭৫জন মুজাহিদ আরগুস্তানের এক দুর্গম উপত্যকায় গোপন কুঠুরীতে বসে পরামর্শ করছিলাম আচমকা রাত নয়টার দিকে দুশমনের জঙ্গী বিমান আমাদের উপর বোমা বর্ষণ শুরু করে। আমি সাথীদেরকে দ্রুত স্থান ত্যাগের নির্দেশ দিলাম। আমরা বের হবার পাঁচ মিনিট পরেই দুশমন নিক্ষিপ্ত বোমা সেই কামরার উপর পতিত হয় এবং সব জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়।

মুহাম্মদ মাহবুব নামের সহকারী কমান্ডার কোন এক কারণে কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বোমার ধাক্কায় তিনি হাওয়ায় ভেসে অনেকটা দূরে মাটির উপর নিক্ষিপ্ত হলেন,কিন্তু যখমী হওয়াতো দূরের কথা তার শরীরে সামান্য ব্যথাও লাগেনি। দশ/এগারজন মুজাহিদ একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ

করছিলেন। আমি উচ্চস্বরে তাদেরকে আমার নিকট আসতে বললাম। তারা আমার নিকট পৌছার সাথে সাথেই সেই গাছের গোঁড়ায় একটি বোমা এসে পড়লো। বোমার প্রচন্ড বিস্ফোরণে আশপাশের ৪৫টি গাছ তৎক্ষণাত বরবাদ হলো। কোন কোন গাছ প্রায় পাঁচ শত মিটার দূরত্বে উড়ে গেলো।

সর্বশেষ ব্যক্তি বের হওয়ামাত্র ঘর ধ্বসে পড়লো

মুজাহিদ দাউদ আমার সামনে বলেছেন, আমরা হাশেমখীল জাজীর এক গৃহে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ বিরতিহীনভাবে ১১টি ক্ষেপণাস্ত্র এসে ঐ ঘরে আঘাত হানে। আমরা চকিতে ঘরের বাইরে পা রাখি, কিন্তু তাড়াহুড়ার কারণে রাইফেল আনতে ভুলে যাই। মনে আসা মাত্র নিজ নিজ অস্ত্র হাতে নেবার জন্য সবাই ঘরে প্রবেশ করি এবং অস্ত্র নিয়ে বাইরে চলে আসি। আমাদের মধ্য হতে সর্বশেষ ব্যক্তি বাইরে পা রাখা মাত্র ঘরটি হুড়মুড় করে ধ্বসে যায়। এই ভীতিপ্রদ অবস্থায় আমাদের সর্বশেষ মুজাহিদ ভাইর পায়ে সামান্য আঘাত ব্যতীত অন্য কারো কিছুই হয়নি।

কাপড় পুড়ে গেলেও শরীর অক্ষত রইলো

মুআল্লিম আব্দুল গণী আমায় বলেছেন, আমরা পাগমানের পাহাড়ী উপত্যকা ধরে চলছিলাম। এমন সময় রুশ বোমারু বিমান আমাদের উপর এলোপাথারী বোমা বর্ষণ করে

ঘাঁটিতে ফিরে যায়। এবার আমি আমার বিচ্ছিন্ন সাথীদের সন্ধানে বের হই। হঠাৎ একজনকে বেহুশ অবস্থায় খুঁজে পাই। বোমার আঘাতে তার লেবাস পুড়ে ছারখার হলেও শরীরের কোথাও সামান্য তাপও লাগেনি।

তাকে উঠিয়ে মারকাযে নিয়ে এলাম। দুঘন্টা পরে হুশ ফিরে এলে তার নিকট জানতে চাই এটা কীভাবে সম্ভব হলো যে, পোষাক পুড়ে ছাই হওয়া সত্বেও তোমার শরীরের কোথাও সামান্য যখম হলো না? সে উত্তর দিলো, আমি তো স্রেফ এটুকু জানি যে, আমার খুব নিকটে পতিত বোমার তাপে আমার কাপড়ে আগুন ধরে যায়। তারপরের কিছু আমি বলতে পারবো না।

একটি মুরগী ব্যতীত অন্য কারো কোন ক্ষতি হয়নি

মুআল্লিম তূর আমায় বলেছেন, সারখাবের লোগড় এলাকার এক ছোট জনপদে আমরা ১১টি পরিবার বাস করতাম। একদিন রুশ জঙ্গী বিমান সেই জনপদের উপর বিশাল এক বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু বোমা বিস্ফোরণে একটি মুরগীর প্রাণহানী ব্যতীত অন্য কারো ক্ষতি হয়নি।

বোমা বিস্ফোরিত হওয়া সত্বেও আঘাত না লাগা

পাগমানের বাসিন্দা শের আলম বর্ণনা করেন, রুশ বিমান হামলা চালিয়ে আমার এক সাথী মুজাহিদকে যখমী করে দেয়। অন্য এক

সাথীকে নিয়ে তার ঔষধ ও খাবার সংগ্রহের জন্য আমি নিকটস্থ লোকালয়ের উদ্দেশ্যে হাটা দিলাম। লোকালয়ে প্রবেশের মুহুর্তে আরেকবার দুশমনের বিমান আমাদেরকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলো। বিস্ফোরণের ধাক্কায় আমরা বহুদূরে ধূলা বালির মাঝে ছিটকে পড়লাম। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য এই যে, বহুদূরে ছিটকে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের শরীরে সামান্যতম চোট লাগেনি।

খোদার শোকর গুলি বিদ্ধ হয়নি

আব্দুল্লাহ আযযাম আনন্দ গুলজান নামক মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, কালাশনিকভের একটি গুলি লেগে আমার হাত ছিদ্র হয়। এরপর দুশমনের আরেক টি গুলি আমার বেল্টে লাগে এবং বেল্টের পাঁচটি বুলেট সেখান থেকে খসে পড়ে। কিন্তু তাদের একটি গুলিও আমার দেহে বিন্দুমাত্র আচড় কাটতে পারেনি। ডক্টর আযম নিজের চোখে আনন্দ গুলজানের ফুটো হয়ে যাওয়া হাত এবং গুলির বেল্ট দেখেছেন।

ক্ষেপণাস্ত্র কোথায় গেলো

পাকতিয়ার কমান্ডার মুহাম্মাদ আফযাল আমায় জানিয়েছেন;“আমরা ‘রাকায়ান জাজী’তে অবস্থান করছিলাম, এসময় আমাদের উপর গুলি বর্ষণ শুরু হলো। আমি আমার তিন সহযোদ্ধাকে কামরার বাইরে বের হবার নির্দেশ দিলাম। তারা বলল, আমরা নামায আদায় করে বের হবো। তারা ভেতরে নামায

আদায়রত অবস্থায় তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র কামরার বাইরে আঘাত হানে। আমি তাদের অবস্থা আন্দাজ করার জন্য দৌড়ে কামরায় প্রবেশ করে দেখলাম,কামরার ছাদে তিনটি ছিদ্র দেখা যাচ্ছে ঠিকই ভেতরে বিস্ফোরণ তো দূরের কথা ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর নাম নিশানাও নেই।

গুলি হৃদপিন্ড ভেদ করতে পারলো না

শায়খ সায়্যাফের এক কমান্ডার মূসাখানের ভাষ্য; মুজাহিদ আলী খানকে লক্ষ্য করে বিশ মিটার দূর থেকে দশটির অধিক গুলি নিক্ষেপ করা হয়। একটি গুলি তার সিনায় বিদ্ধ হয়ে হৃদপিন্ডের কাছাকাছি গিয়ে থেমে যায়। অস্ত্রোপাচারের সাহায্যে সেই গুলি অপসারণ করে। খালীখান এখন পর্যন্ত সুস্থ সবল দেহে বেঁচে রয়েছেন।

আমরা জীবিত বের হলাম

আরগুন শহরের আব্দুল জব্বার বর্ণনা করেছে, ১৪০৫ হিজরীর রমযান মাসে কুতুবখীলের পথে অগ্রসরমান এক দুশমন কাফেলার উপর আমরা ৬০জন মুজাহিদ হামলা চালাই। হামলার শুরুতে আমরা এক গুহায় ওৎপেতে ছিলাম। হঠাৎ একটি ক্ষেপণাস্ত্র সেই গুহায় নিক্ষিপ্ত হয়। গুহার সাথীদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুহাম্মাদ শাহাদাত বরণ করেন, এছাড়া বাকী সকলে অক্ষত দেহে গুহা থেকে বেরিয়ে যাই।

আমি সামান্যতম কষ্ট অনুভব করিনি

পাগমানের মুজাহিদ মুহাম্মাদ সালেহ কান্দাহারী আমায় শুনিয়েছেন, আমার দেহে ১৪টি গুলি বিদ্ধ হলেও আমি সামান্যতম কষ্ট অনুভব করিনি। তিনি আমাকে গুলির দাগও দেখিয়েছেন। সালেহ আরো বলেন, রাশিয়ানরা আমাকে গ্রেফতার করে আমার হাত ও পায়ের ১১টি নখ উপড়ে ফেলে, কিন্তু আমি কোন যন্ত্রণা অনুভব করিনি। হাফীযুল্লাহ আমীনের শাসনামলে আমাকে জেলখানায় বিদ্যুতের শক দিলেও আমি কিছু অনুভব করিনি।

তিনি অন্য মুজাহিদের ব্যাপারে বলেন,
এক যুদ্ধে গুলজানের মুখে গুলি বিদ্ধ হয়ে ঘাড় দিয়ে বের হলেও সে কোন কষ্ট বুঝতে পারেনি। আরেক মুজাহিদ আদিলের মুখে গুলি ঢুকে ঘাড় দিয়ে বের হলেও সে কোন ব্যথা অনুভব করেনি।

অন্য এক সংঘর্ষে আনারগুলের এক হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে অন্য হাতে তার রাইফেল ও ছিন্ন হাত নিয়ে মারকাযে ফিরে আসে।

পাগমানের ওয়ায খানের পেটে গুলি বিদ্ধ হয়ে পিঠ দিয়ে বের হলেও সে কোন ব্যথা অনুভব করেনি। (এই ঘটনাগুলি শহীদ আব্দুল্লাহ আয্যামের কাছ থেকে সংগৃহীত)

ক্ষেপণাস্ত্র বিলম্বে বিস্ফোরিত হলো

লোগড়ের মুহাম্মাদ হাশিম ১৯৮৬ সালের
৩১ জুলাই সারখাবে বসে যোহর নামায শেষে আমায় বললেন, জাজী ক্যাম্পে মাহমুদ নামক এক মুজাহিদ জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় শুয়েছিলেন। এদিকে দুশমন বাহিনী ক্রমাগত ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে চলছে। আমি তাকে বললাম, তুমি এখান থেকে চলে যাও, কারণ হঠাৎ কোন ক্ষেপণাস্ত্র এখানে আঘাত হানতে পারে। সে বলল, দুর্বলতার দরুন আমি সামান্য নড়চড়ও করতে পারছিনা। কিছুক্ষণ পর একটি ক্ষেপণাস্ত্র তার পায়ের আধা মিটার দূরে এসে পতিত হয়। এতো নিকটে ক্ষেপণাস্ত্র দেখে মাহমুদ পড়িমরি করে সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে ছুট দেয়। সে আনুমানিক ৫০ গজ যাবার পর সেটি প্রচন্ডরূপে বিস্ফোরিত হয়। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্ষেপণাস্ত্র লক্ষ্যবস্তু অথবা মাটিতে আঘাত করার সাথে সাথে বিস্ফোরিত হবে। কিন্তু জাজী ক্যাম্পে সেটি বিলম্বে বিস্ফোরিত হওয়া বিরাট এক বিস্ময়কর ঘটনা।

মুজাহিদ নাসরুল্লাহর দেহে গুলি বিদ্ধ না হয়ে পকেটে জমা হলো

মুহাম্মাদ মঙ্গল মুজাহিদ নাসরুল্লাহর উদ্ধৃতিতে আমার সামনে বর্ণনা করেন যে, নাসরুল্লাহ গযনীতে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আচমকা দুটি গুলি তার দিকে ছুটে আসে,কিন্তু সেগুলি দেহে বিদ্ধ

না হয়ে তার পকেটে গিয়ে জমা হয়। নাসরুল্লাহ পকেট থেকে গুলি বের করে উপস্থিত সাথীদের চোখের সামনে তুলে ধরেন।

ওয়ারদাকের কমান্ডার পুরদুল বললেন, আমি এক গ্রাম থেকে দশ কিলোমিটার দূরবর্তী আরেক গ্রামে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দুশমনের ৮টি জঙ্গী গানশীপ হেলিকপ্টার আমাকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ শুরু করে, কিন্তু তাদের একটি গুলিও আমাকে স্পর্শ করেনি। অথচ সেগুলো এতো নীচে নেমে এসেছিলো যে, সেগুলোর পাখার বাতাসের ঝাপটা আমায় স্পর্শ করছিলো।

৭২টি বেয়নেটের নির্মম খোচা সত্ত্বেও প্রাণে রক্ষা

পাগমানের সাইফুল্লাহ আমায় বলেছেন
যে, কোন এক যুদ্ধে একজন মুজাহিদ কমিউনিস্ট সৈন্যদের ঘেরাও এর মুখে আটকা পড়েন। তার একার পক্ষে দুশমন বাহিনীর মোকাবিলা অসম্ভব মনে করে তিনি পেছনে এসে শহীদদের সাথে কাতারবন্দী হয়ে শুয়ে পড়েন।

কিছুক্ষণ পর রাশিয়ানরা সেখানে উপস্থিত হয়। তারা শহীদদের দেহে বেয়নেট চার্জ করে নিজেদের মনের ক্ষোভ প্রশমিত করতে থাকে। এক সময় তারা শহীদদের মাঝে আত্মগোপনকারী জীবিত মুজাহিদের দেহে বেয়নেট দিয়ে আঘাত শুরু করে এবং ৭২টি আঘাত করে ক্ষান্ত হয়। তথাপি আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে থাকেন। রাশিয়ানরা স্থানত্যাগ করার পর উদ্ধারকারীগণ

শহীদদের লাশ উঠানোর সময় গোঙ্গানীর আওয়ায শুনে তাকে নিয়ে দ্রুত চিকিৎসকের সামনে হাযির করে। কিছুদিন পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে সেই মুজাহিদ আবারো জিহাদে যোগ দেন।

শরীরে ধাক্কা খেয়ে বুলেট ছিটকে গেলো

আবু খুবাইব নামক এক আরব মুজাহিদ আমায় বললেন,আমি এক আফগান মুজাহিদের সাথে কান্দাহার মহাসড়কের পাশে ওৎপেতে ছিলাম। হঠাৎ দূর থেকে একটি গুলি আমার সাথীর পিঠে আঘাত হানে। আমি স্বচক্ষে দেখলাম, গুলিটি এমনভাবে তার পিঠ থেকে পিছলে নীচে পড়লো যেমনভাবে বুলেট প্রুফ গাড়ীতে আঘাত করে পিছলে যায়। সেইগুলিটি আমি অদ্যাবধি সযত্নে রেখে দিয়েছি।

বোমা পেটে আঘাত হানলো

আমি মুজাহিদ জাফরের পেটে বোমার চিহ্ন দেখেছি। কিন্তু তা স্রেফ চিহ্নই ছিলো, গভীর কোন ক্ষত নয়। এটি অবিশ্বাস্য ঘটনা যে, বোমা বিস্ফোরিত হওয়া সত্বেও তার খুব বেশী আঘাত লাগেনি।

জাফর বলল, একটি বোমা আমার পেটের উপর পড়ে বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু আল্লাহর শোকর সামান্য চামড়া পুড়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন সমস্যা হয়নি।

বোমার ধাক্কা তাকে গাছে উঠিয়ে দিলো

পাগমানের কমান্ডার আব্দুল বাকী ১৯৮৬ সালের ২৪ এপ্রিলের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, সরকারী বাহিনী বোমারু বিমান নিয়ে মুজাহিদদের উপর হামলা করলো। হামলা চলাকালীন হঠাৎ একটি বোমা মুজাহিদ মুহাম্মাদ আমানুল্লাহর একদম নিকটে এসে বিস্ফোরিত হয়। প্রচন্ড বোমা বিস্ফোরণে আমানুল্লাহর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবার কথা। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য যে বোমার ধাক্কায় তার কোন ক্ষতিই হয়নি, বরং কীভাবে যেন সে অস্ত্রসহ পাশের এক গাছের উপর উড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর কমিউনিস্ট বাহিনী আমাদের ক্যাম্প দখল করে নিতে সফলকাম হয়। ওদিকে আমানুল্লাহ তখন বেহুশ অবস্থায় গাছে ঝুলে আছেন । কমিউনিস্টরা চলে যাবার পর কতিপয় মহিলা সেখানে এসে তাকে গাছ থেকে নীচে নামায়, নীচে নামার পর তার চেতনা ফিরে আসে। সে মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে, অন্য মুজাহিদগণ কোথায়? মহিলাগণ তাকে পথ দেখিয়ে কমিউনিস্টদের ঘেরাও হতে মুজাহিদদের নিরাপদ ঠিকানায় পৌছে দেয়।

বোমা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলো

আব্দুল মান্নান বর্ণনা করেন যে, এক ছাউনীতে আমরা তিন হাজার মুজাহিদ অবস্থান করছিলাম। রাশিয়ান বোমারু বিমান সেই ছাউনী লক্ষ্য করে প্রায় তিনশত নাপাম

বোমা নিক্ষেপ করে, কিন্তু খোদার ফযলে তার একটিও বিস্ফোরিত হয়নি।

শায়খ আহমদ শরীফ এই ঘটনাটি শুনালেন, আমার একপুত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলো। বোমার তাপে তার লেবাস পুড়ে গেলেও শরীরের কোথাও কোন যখম হয়নি। ইত্তেহাদের সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মাদ নাসরুল্লাহ মানসুর এই অবিশ্বাস্য ঘটনা বর্ণনা করেন, ১৯৮৫ সালের ১লা এপ্রিল আমার সামনে এক মুজাহিদকে হাযির করা হয়, যার মাথায় দশটি এবং বায়ুতে ১৫টি গুলি বিদ্ধ হয়েছে। আল্লাহর অসীম দয়ায় সেই মুজাহিদ চিকিৎসকের সাহায্যে পূর্ণ সুস্থতা লাভ করেন।

মাওলানা পীর মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন, পাকতিয়ার এক রণাঙ্গনে আমার সাথে স্রেফ ১২জন মুজাহিদ ছিলেন। ১০৮টি জঙ্গী বিমান নিয়ে বিশাল দুশমন বাহিনী আমাদের উপর হামলা চালায় এবং এক খোলা ময়দানে আমরা তাদের বেষ্টনীতে আটকে যাই। এবার খাঁচায় বন্দী বাঘের ন্যায় আমাদের উপর সর্ববিধ আক্রমণ চলতে থাকে। তাদের গোলাগুলি ও বোমা বর্ষণ শেষে দেখা গেলো আমাদের সবার পোষাক জ্বলে গেলেও শরীরে কোন আঘাত লাগেনি।

আমরা ১৬০জন রুশ সেনাকে মুত্যুর দুয়ারে পৌছে দিলাম এবং দুটি ট্যাংক ধ্বংস করলাম। আমাদের দুই সাথী লুকানো মাইন বিস্ফোরণে শাহাদাত বরণ করেন।

মাওলানা আরসালাম বলেন, দুইবার দুশমনের গুলি আমার পায়ে আঘাত হানে,

কিন্তু আল্লাহর রহমতে সেখানে সামান্যতম যখম হয়নি।

ট্যাংকের নীচে চাপা পড়া সত্বেও কিছুই হলো না

লোগড় মুজাহিদ বাহিনীর নায়েব কমান্ডার মুহাম্মাদ ইউসুফ আমায় শুনালেন, আমাদের এক মুজাহিদ ভাইর উপর দিয়ে দুশমনের ট্যাংক অতিবাহিত হলেও তার শরীরের কোথাও এতোটুকু আঘাত লাগেনি।

শাহাদাত বরণের পর আফগান মুজাহিদদের তরতাজা লাশ: আফগান জিহাদে কারামতের প্রকাশ

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম আরবের বাসিন্দা। কুরআন,ফিক্বাহও ভাষার ব্যাপারে উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি তিনি একজন দরবেশ প্রকৃতির মানুষ। সেই সাথে বিখ্যাত একজন মুজাহিদও বটে। তিনি আফগান জিহাদে শুধুমাত্র অর্থ দিয়েই সাহায্য করেননি বরং, যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে স্বশরীরে উপস্থিত থেকেছেন। তিনি নিজের অসাধারণ বাগ্মীতা ও লেখনী শক্তিকে জিহাদের কাজে ব্যয় করেছেন। এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি কিতাবও লিখেছেন। ‘আয়াতুর রাহমান ফি জিহাদিল আফগান কিতাবের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “আর আমি জিহাদ বিষয়ক ঘটনাবলী এমন সব মুজাহিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি যারা নিজেরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। যিনি নিজেই আশ্চর্যজনক

ঘটনার নায়ক অথবা প্রত্যক্ষ করেছেন এমন মুজাহিদের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছি। বিভিন্ন সূত্র মারফত কোন ঘটনা অবগত হবার পর আমি সেই সূত্রের মূলে পৌছার চেষ্টা করেছি। কোন কোন ঘটনার ব্যাপারে আমি বর্ণনাকারীর কাছ থেকে হলফনামা নিয়েছি। এভাবে মুজাহিদদের মাধ্যমে অসংখ্য অবিশ্বাস্য ঘটনা সংগ্রহ করেছি। কিন্তু এ বিষয়ে সবসময় আমার সতর্ক দৃষ্টি ছিলো যে, কোন ভিত্তিহীন ঘটনা যেন আমার লেখনীতে স্থান না পায়।”(আলোচ্য অধ্যায়ের ঘটনাগুলোর অধিকাংশ শায়খ আযমের নিকট থেকে সংগৃহীত)

শহীদদের লাশের প্রত্যক্ষ বর্ণনা:

১। আমি অদ্যাবধি কোন শহীদের লাশে কোন
রকম বিকৃতি দেখিনি এবং দুর্গন্ধও।

২। শহীদদের পড়ে থাকা লাশ হিংস্র জানোয়ারের খাদ্যবস্তু হয়েছে। এরূপ কখনো আমার চোখে পড়েনি। অথচ রাশিয়ান ও আফগান সৈন্যদের লাশ নিয়ে শিয়াল-কুকুর-শকুন টানাটানি করতে দেখেছি অসংখ্য স্থানে। যদিও দুই পক্ষের লাশ একইস্থানে পড়ে থাকতো।

৩। আমার সামনে শরীয়ত স্বীকৃত পন্থায় ১২জন মুজাহিদের কবর দাফনের তিন বছর পর খনন করা হয়েছে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, লাশ দেখে মনে হয়েছে এই মাত্র তাদেরকে কবরে রাখা হয়েছে।

৪। দাফন করার ১ বছর পর কবর খনন করে শহীদকে সঠিকভাবে কবরস্থ করার সময় তাদের

দেহের যখম থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখেছি।

মসজিদের ইমামের বর্ণনা

আব্দুল্লাহ আযযাম এক মসজিদের ইমামের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, আমি শহীদ আব্দুল মজীদ মুহাম্মাদকে দাফনের তিনমাস পর তার খননকৃত কবরে ঠিক তিন মাস পূর্বের ন্যায় সজীব তরতাজা দেখতে পাই। তখনো তার দেহ থেকে মেশক আম্বরের সুঘ্রাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো। হাজী আব্দুল মজীদ বর্ণনা করেন, লাইকী গাঁয়ের মসজিদের শহীদ ইমাম সাহেবকে দাফনের সাত মাস পর কবর খনন করা হলে ঠিক পূর্বের ন্যায় অবিকৃত ও আলোকদ্বীপ্তময় দেখতে পাই।

মুয়াযযিন

জিহাদ কমিটির সদস্য এক মসজিদের মুয়াযযিন বর্ণনা করেন, শহীদ নেছার আহমদ শাহাদাতের পর সাত মাস পর্যন্ত মাটির নীচে চাপা পড়েছিলেন (তাকে রাশিয়ানরা বুলডোজার দিয়ে চাপা দিয়েছিলো)যখন তার লাশ বের করা হলো (সঠিকভাবে দাফনের উদ্দেশ্যে) মনে হলো তিনি এই মাত্র শাহাদাত বরণ করেছেন।

আব্দুল জব্বার নিয়াযী

আব্দুল জব্বার নিয়াযী বলেন, আমি ৪জন শহীদকে দেখেছি। দাফন করার ৪মাস পর কবর খনন করা হলে দেখতে পাই তাদের নখও দাড়ি পূর্বের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। অবশ্য তাদের মুখের একাংশ কিছুটা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। আমার আপন ভাইকে দাফনের দুসপ্তাহ পর কবর খনন করে দেখি যে, তার লাশ একদম তরতাজা অবস্থায় রয়েছে।

শহীদের দেহের দুর্লভ সুঘ্রাণ

মাওলানা আরসালান বর্ণনা করেন, আমাদের সহযোদ্ধা মাদ্রাসা ছাত্র আব্দুল বাসীর রাতের আঁধারে শহীদ হয়। সংঘর্ষ বন্ধ হতেই আমরা তার সন্ধানে বের হই। আমার সাথে মুজাহিদ ফাতহুল্লাহও ছিলেন। ফাতহুল্লাহ অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে বললেন,শহীদের লাশ আমাদের নিকটেই কোথাও আছে। কারণ আমি অন্য এক সুগন্ধ অনুভব করছি,যা পৃথিবীর সুগন্ধী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর বলে আমার মনে হচ্ছে। ইত্যবসরে আমিও সেই সুগন্ধ অনুভব করলাম। অতঃপর রাতের নিকষ অন্ধকারেই আমরা সুগন্ধের উৎস অনুসরণ করে আব্দুল বাসীরের সন্ধান পেলাম।

মাওলানা আরসালান বলেন, শহীদ আব্দুল বাসীরের যখম থেকে এমন অদ্ভুত ধরনের আলোকরশ্মি বের হচ্ছিল যে, তার কিরণ প্রভায় রক্তের লাল রংও ভিন্ন বর্ণ ধারণ করলো ।

শাহাদাত বরণের পর স্বপ্নের মাধ্যমে শহীদ মুজাহিদ নিজের লাশের সন্ধান দিলেন

একদল মুজাহিদ খালি হাতে সশস্ত্র রাশিয়ান সৈন্যদের তীব্র হামলার মোকাবেলা করছিলেন। মুজাহিদদেরকে এই সংঘর্ষে সাহসিকতা এবং ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছিল। সংঘাত বন্ধ হলে যখন মুজাহিদগণ ছাউনীতে ফিরে পরস্পর হালত সম্পর্কে খবর নিচ্ছিলেন, তারা একমাত্র বিসমিল্লাহ খান ব্যতীত বাকী সকলকে মোটামুটি সহি সালামতে উপস্থিত পেলেন। সাথীগণ ভাবলেন, হয়তো সে রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছে অথবা শাহাদাতের অমিয় সুধাপানে ধন্য হয়েছে। সকল মুজাহিদ মিলে সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজ করেও তার সন্ধান পেলেন না। তারা হতাশ হয়ে ভাবছিলেন, দুশমন সম্ভবত তাকে আটক করেছে অথবা তার লাশ গুম করে ফেলেছে। কিন্তু আল্লাহর অসীম কুদরত বোঝে সেই সাধ্য কার আছে? তৃতীয় রাতে বিসমিল্লাহ খানের মা তার নয়নমনিকে স্বপ্নে দেখেন যে, সে বলতে থাকে,“আম্মিজান! তোমার কলিজার টুকরার দাফনের ব্যাপারে তুমি চুপচাপ বসে আছো কেন”? মা অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে জবাব দিলেন, “প্রিয় বেটা! আমরাতো সাধ্যের শেষ সীমা অনুযায়ী তোমার খোজে সময় ব্যয় করলাম, কিন্তু তোমার যে কোন হদিসই পেলাম না। আমাকে এটুকু বলো যে, তুমি কোথায় আছো? বিসমিল্লাহ খান মাকে নিজের লাশের অবস্থানের সঠিক বর্ণনা দেয়। সকালে তার মা মুজাহিদদের আমীরের সাথে কথা বলেন। মুজাহিদগণ নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট

স্থানে পৌছে মায়ের বর্ণনানুযায়ী শহীদ বিসমিল্লাহর লাশ পড়ে থাকতে দেখেন।

শাহাদাতের তিনদিন পরেও শহীদের লাশ
এতো নরম, মোলায়েম ও তরতাজা ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো এই মাত্র মহান রবের ইশারায় তার জান জান্নাতে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

বিবাহের দিন শাহাদাত বরণ

গনীর নওজোয়ান মুজাহিদ মুহাম্মাদ যাহির নিজের শৌর্য-বীর্য ও অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্টের কারণে পরিচিত মহলে বিশেষ সম্মানও ভালোবাসার আসনে অধিষ্ঠিত হন।তিনি দীর্ঘদিন যাবত যালেম শাহী ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সামনের কাতারে থেকে জিহাদ করেন। তার বিবাহ সন্নিকটে ছিলো, বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ আসরের ওয়াক্তে নিজেদের অতিপ্রিয় সহযোদ্ধার বরযাত্রায় শামিল হবার ইচ্ছায় নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হলেন। ইতোমধ্যে গুপ্তচর মারফত খবর পেয়ে উপযুক্ত মওকা ভেবে দুশমন বাহিনী তাদের উপর তীব্র হামলা শুরু করলো। সহযোদ্ধাদের পাশাপাশি মুহাম্মাদ যাহিরও জবাবী হামলার জন্য ব্যঘ্ৰ হুংকার দিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। বন্ধুগণ তাকে নিবৃত্ত করার যাবতীয় কোশেশ চালিয়ে বললেন, আজ তোমার বিবাহের দিন। সময়ের দাবী হলো, তুমি এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকো। কিন্তু মুজাহিদ যাহিরের ভেতরে ঈমানী চেতনা,বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার খুন প্রবাহীত হচ্ছিল পূর্ণোদ্যমে। আল্লাহর দুশমনদের চিরতরে

মিটিয়ে দেয়া এবং মুসলিম জাতির মর্যাদা সমুন্নত রাখা ছিলো তার জীবনের প্রধানতম মাকসাদ। ইসলাম ও মুসলমানের খাতিরে তিনি নিজের যে কোন খুশী ও চাওয়াকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন। সুতরাং তিনি অন্য মুজাহিদদের শত বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাল্টা হামলা চালালেন। আল্লাহ ভাল জানেন যে, কতাজোন রুশ সেনাকে জাহান্নামের রাস্তা ধরিয়ে তিনি নিজেও কখন শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোট রাখলেন।

এক মুজাহিদ তার রক্তে রঞ্জিত নিথর
দেহ বাড়ির আঙ্গিনায় নিয়ে এলে মনে হচ্ছিল, নতুন বর খুন রাঙ্গা লেবাসে শাদীর উদ্দেশ্যে হাযির হয়েছেন। কাকতালীয় হলেও সত্য যে, ঠিক যে মুহূর্তে শহীদ মুহাম্মাদ যাহিরের লাশ বাড়ির সামনে হাযির করা হয়, একই মুহূর্তে বধূ সাজে দুলহানও সেখানে পৌছে যায়। যাহির শহীদি রক্তে লাল বেশ ধারণ করে আর নববধূ এমনিতেই লাল পোষাকে সজ্জিত হয়। পৃথিবীর জীবন সাথীর স্থলে যাহির হয়তো ততক্ষণে জান্নাতী হুরদের নিকট পৌছে গিয়েছেন।

আমি তোমার পার্শ্বেই দাফন হবো

উপস্থিত মুজাহিদগণ শোকার্ত ও ভগ্নহৃদয়ে শহীদ গুল রহমানের লাশ কাঁধে উঠিয়ে ধীর পদক্ষেপে কবরস্থানের দিকে চলছিলেন। মুজাহিদ মুহাম্মাদ হাশিম ঘোষণার স্বরে বললেন,“গুল রহমান! আমি তোমার পাশেই সমাহিত হবো”। কয়েক ঘন্টা পর রুশ জঙ্গী বিমান এই লোকালয়ের উপর নাপাম বোমা

বর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে মুহাম্মাদ হাশিম শহীদ হন। তাকে গুল রহমানের ডান পাশে দাফন করা হয়। গুল রহমান বিখ্যাত ও নির্ভীক এক কমান্ডার ছিলেন।

শহীদ হবার পরে মুজাহিদের যবানে আল্লাহর যিকির

জিলহজ্জের ১২ তারিখ মুজাহিদ হাবীব নূরের লাশ তার ঘরের সামনে হাযির করা হলো। আজ তার শাহাদাত লাভের তৃতীয় দিন চলছে। আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সহ অসংখ্য মুমিন নর-নারী শেষবারের মতো হাবীব নূরের লাশ দেখে নিচ্ছিলেন। উপস্থিত শতশত লোককে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে হঠাৎ তার ঠোটে নড়াচড়া দেখা দিলো। স্তব্ধ বিস্ময়ে দর্শকগণ দেখতে লাগলেন মুদিত চোখ, প্রাণহীন নিথর দেহ হওয়া সত্বেও তার ঠোট দ্রুত নড়াচড়া করছে। মনে হচ্ছিল তিনি কিছু পাঠ করছেন। আমীরুল মুজাহিদীন শহীদের মুখের কাছে কান নিয়ে স্পস্টভাবে শুনতে পেলেন মরহুম হাবীব নূর আল্লাহর নামের যিকির করছেন। অতঃপর উপস্থিত সবাই প্রত্যক্ষ করলেন যে, “আল্লাহর রাহে প্রাণোৎসর্গকারীগণ সর্বদা আল্লাহর নামের যিকির করেন দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়” এই আয়াতের বাস্তব আমলে লিপ্ত থাকেন। কখনো কখনো এমনও হয় যে, রাব্বুল আলামীনের অপার কৃপায় মৃত্যুর পরেও তাদের যবানে যিকরে ইলাহী অব্যাহত থাকে। এর মাধ্যমে পৃথিবী বাসীর জন্য অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় জীবন্ত কারামতের নমুনা স্থাপিত হয়েছে। সত্য

হলো, শহীদগণের প্রসঙ্গেই“তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না”আয়াতে আলোকপাত করা হয়েছে। এই আয়াত দ্বারা তারা তাদের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

মুজাহিদ হাবীবুল্লাহ রাশিয়ানদের মোকাবিলায় হাসতে হাসতে খোদার রাহে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন। তার অন্তত বিশজন সহযোদ্ধা বর্ণনা করেন যে, শাহাদাতের পূর্বে হাবীবুল্লাহ কসম খেয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো,“বন্ধুগণ! ঐ দেখো সামনেই জান্নাত”। সাথীদের বিস্মিত করে সে আবার বলল, “আশ্চর্য কেন হচ্ছো? জান্নাত আমার সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর কসম! আমি জান্নাতের একদম সন্নিকটে উপনীত হয়েছি”। চোখের সামনে জান্নাত নিয়ে হাবীবুল্লাহ রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পর মেশিনগানের এক পশলা গুলি তাকে জান্নাতের পথে পৌছে দিলো।

শহীদের দেহের প্রাণকাড়া সুগন্ধ

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরের ঘটনা। আমি ৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের হিরো অবসর প্রাপ্ত এয়ার কমোডর এম,এম,আলমকে সাথে নিয়ে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় পারওয়ান সংলগ্ন এলাকায় একদল মুজাহিদের সাথে সফর করছিলাম। দুর্গম পাহাড়ী উপত্যকায় অবস্থিত মুজাহিদ ক্যাম্প ‘আল ফাতাহ’থেকে আমাদের সফর শুরু হয়। পথিমধ্যে শুনলাম, কয়েক কিলোমিটার সামনে

জাজী ছাউনীর উপর ক্যাপ্টেন গণী খানের নেতৃত্বে মুজাহিদগণ হামলা করেছেন। দিনভর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শেষে মুজাহিদগণ দুশমনের উপর আংশিক প্রাধান্য বিস্তার করে ছাউনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। চুড়ান্ত বিজয়ের কাছাকাছি পৌছে হঠাৎ তাদের গুলি ফুরিয়ে আসে। সামান্য কিছু গোলা বারুদ তারা হিসাব করে দুশমনের উপর নিক্ষেপ করতে থাকেন। অপর দিকে দুশমন বাহিনী অসংখ্য কামান, ট্যাংক এবং ভারী মেশিনগানের বিরামহীন গোলা নিক্ষেপের পাশাপাশি নিকটস্থ ঘাটির সৈন্যরাও মুজাহিদদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে ১৪জন মুজাহিদ অকাতরে শহীদ হয়ে গিয়েছেন, আরো দ্বিগুণ মারাত্মকভাবে যখমী হয়েছেন। নিরুপায় হয়ে কামান্ডার গণী খান সহযোদ্ধাদের পিছু হটার নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদগণ শহীদ, যখমী ও অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে নিজেদের ঘাটিতে ফিরে এলেন।

আমরা পূর্বেই মারকাযে ফিরে এসে কমান্ডারের রুমে প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে থাকি। শহীদ এবং যখমী সাথীদের রক্তের দাগ সারা দেহে মাখামাখি অবস্থায় ক্যাপ্টেন গণী খান কামরায় পা রাখলেন। তার অনুসরণ করে আরো অনেকে কামরায় এলেন। তাদের মধ্য হতে এমন এক নওজোয়ানকে দেখলাম, যে শাহাদাত বরণকারী ছোটভাইকে কাঁধে বহন করে এনেছে।

আমাদের সামনে এই মুজাহিদ বারংবার ক্যাপ্টেনের নিকট বিনীত ভাবে দরখাস্ত করছিলো,“এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে প্রয়াজোনীয় গোলাবারুদ নিয়ে দুশমনের উপর হামলা করা জরুরী। তার বাক্য শেষ না

হতেই খবর এলো যে, তার ভাইর লাশ মসজিদের সামনে রাখা হয়েছে। এম,এম আলম সহ আমি মসজিদের কাছাকাছি যাওয়া মাত্র প্রাণ কাড়া এক সুগন্ধ এসে আমাদের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে দিলো। সামনের খাটিয়ায় ১৮/১৯ বছর বয়সী এক জান্নাতী নওজোয়ান চোখে মুখে ফুলেল হাসি নিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত ছিলো। এই মুজাহিদের দেহ থেকেই প্রাণকাড়া সুগন্ধ পুরো প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে পড়ছিলো। সত্যিই সুগন্ধ আসছে কিনা নিশ্চিত হতে আমার সম্মানিত সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনিও আমার ন্যায় ঘ্রাণ অনুভব করেছেন কি? তিনি উত্তর দিলেন,“আমিও এ কথাই ভাবছি যে, এই ঘ্রাণ আমার অনুভূতিকেই শুধু আচ্ছন্ন করছে না আপনিও তাতে শরীকদার”।

এবার শহীদের শিয়রে দন্ডায়মান এক মুজাহিদের নিকট জানতে চাইলাম, এই ঘ্রাণ আপনারা ছিটিয়ে দেননি তো? তিনি জবাবে বললেন, “আমরা এইমাত্র শহীদকে ময়দানে জঙ্গ থেকে নিয়ে এসেছি, তাকে দু'চোখ ভরে সবাই দেখতে পারেননি, সুগন্ধ ছিটাবেন কখন?

প্রিয় ভাই আমার সাথে কথা বলো

মোল্লা মুহাম্মাদ মাসউদ এবং আব্দুল মজীদ আমায় বলেছেন, আমাদের এক তালিবে ইলম সহযোদ্ধা মুহাম্মাদ হানীফ শহীদ হয়ে গেলে তাকে দাফন করার সময় তার এক সহপাঠী আমানুল্লাহ আবেগ ভরা স্বরে বলতে লাগলো,“প্রিয় ভাই! আমার সাথে কথা বলো”। তার কথা শেষ হবার পর উপস্থিত সকলকে

বিস্ময়াভিভূত করে শহীদ মুহাম্মাদ হানীফ হাত উঁচু করলো। আমানুল্লাহ বলল, ঠিক আছে এবার তোমার হাত নামিয়ে নাও, সাথে সাথে মুহাম্মাদ হানীফের হাত নীচে নেমে গেলো।

রাইফেল দাও আমি তাদের সকলকে খতম করে ফেলবো

শহীদ মিয়াগুলের অবিশ্বাস্য ঘটনা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বাগলান এবং কুন্দুযের সাধারণ মানুষকে জিহাদের দিকে পথ প্রদর্শন করবে। মিয়াগুল শৈশব কালেই তাহরীকে ইসলামী দলের সাথে নিজের জীবন জুড়ে দেয়। যখন এই সংগঠনের যোদ্ধারা দাউদ খানের হুকুমতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে তখন মিয়াগুল প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সম্মুখ সারিতে ছিলেন। নূর মুহাম্মাদ তারাকীর যুগে লোকেরা তাকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দেয়। নেতৃত্ব লাভের পর মিয়াগুলের প্রতিভা ও বিচক্ষণতা প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে এমনসব অভিযান পরিচালনা করেন যে, তারা তার নাম শুনলেই ভীত হয়ে পড়তো।

একদিন তিনি নিজ দলের এক শহীদ মুজাহিদকে দেখার জন্য হাতে গোনা কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে গোপন আস্তানা থেকে বের হন। কমিউনিস্ট সৈন্য বাহিনী গুপ্তচর মারফত তার আত্মপ্রকাশের খবর পেয়ে পুরো শক্তি নিয়ে এই ছোট্ট কাফেলার উপর হামলা চালায়। মিয়াগুল সিংহবিক্রমে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান।

তার সহকারী কমান্ডার মুহাম্মাদ নাঈম বর্ণনা করেছেন,তার শাহাদাতের সংবাদে কমিউনিস্টরা প্রবল উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করলো যে, তারা মদে মাতাল হয়ে তার লাশের চতুর্দিকে নৃত্যের আসর বসাবে। রাশিয়ানরা পুরো বাগলান এবং কুন্দুযে এই সংবাদ প্রচার করে মিয়াগুলের লাশের নিকট কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুললো।

পাহারাদারদের কয়েকজন পরবর্তীতে পক্ষত্যাগ করে আমাদের নিকট এসে জানায়, মিয়াগুল শহীদ হয়ে যাবার পরেও বারবার চিৎকার করে বলছিলেন, আমার রাইফেল ফিরিয়ে দাও, আমি সকলকে খতম করে ফেলবো।

ঐ এলাকার এক কমিউনিস্ট নিজের কলিজা ঠান্ডা করার জন্য মিয়াগুলের লাশের নিকট এসে তাকে লাথি মারার অপচেষ্টা চালায়। তৎক্ষণাত তার পা পক্ষাঘাত গ্রস্তের ন্যায় শক্ত হয়ে যায়। এই ঘটনা বিদ্যুতগতিতে আশপাশের মানুষের মুখে ছড়িয়ে পড়ে। উপস্থিত কমিউনিস্ট সেনারা এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে দ্বিতীয়বার তার লাশের কাছাকাছি যাবার দুঃসাহস দেখায়নি। তারা কাফনের কাপড় এনে শহীদ মিয়াগুলকে স্থানীয় লোকদের হাতে ছেড়ে বলতে লাগলো, যদ্দিন পর্যন্ত তোমাদের মাঝে এমন মানুষ আছে তোমরা পরাজিত হবে না।

মিয়াগুলকে দাফন করার পর তার কবর থেকে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং “নারায়ে তাকবীরের” উচ্চকিত শ্লোগান ভেসে আসে। তার জবাবে অদৃশ্য থেকে“আল্লাহু আকবারের” বুলন্দ ধ্বনি পুরো এলাকায়

কম্পনের সৃষ্টি করে। কারা তাকবীর দিচ্ছে? তারা দেখতে কেমন? এটা বুঝে আসছিলো না।

পেশোয়ারের বাসিন্দা মিয়াগুলের এক নিকটাত্মীয় তার জন্য আফসোস করছিলেন, তার বিধবা স্ত্রী ও ভাইর উপর বিষন্নতা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো। তার ভাই এক রাতে এশার নামায শেষে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেটে দোয়া করতে লাগলেন,“হে আল্লাহ! মিয়াগুলের শাহাদাত যে কবুল হয়েছে তার কোন প্রমাণ দেখিয়ে দাও এবং আমাদের মনের কষ্ট লাঘব করো। রাতে তিনি ঘুমের মাঝে দেখতে পেলেন আকাশ থেকে ছোট্ট এক গুচ্ছ ফুল তাদের ঘরে নেমে এসেছে, সেই ফুলের দুর্লভ সুঘ্রাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। জান্নাতী সুঘ্রাণে তার নিদ্রা টুটে গেলো, তিনি দৌড়ে গিয়ে তার বোনকেও ঘুম থেকে জাগালেন। তারা পুষ্প গুচ্ছকে কুরআনে কারীমের পার্শ্বে রেখে দিলেন। ভোরে তারা শত তালাশ করেও সেই ফুলের সন্ধান পেলেন না।

এই ঘটনা ইত্তেহাদে ইসলামীর রাজনৈতিক কমিটির প্রধান মুহাম্মাদ ইয়াসির শুনিয়েছেন,

মিয়াগুলের শাহাদাতের পর তার অল্প বয়সী স্ত্রী নিজ জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে শীঘ্র তার নিকট চলে যাবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। তার ঘরের লোকজন যখনই তাকে বলতো,“তুমি পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও” তখন উত্তরে বলে,“আমি জান্নাতে মিয়াগুলের বিবি হতে চাই, অন্য কারো বিবি হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার। রাজো সে স্বপ্নে মিয়াগুলের সাক্ষাত লাভ করতে

থাকে। এরপর সে দিনরাত সর্বক্ষণ কুরআনে কারীম হিফয করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

শহীদের দেহ থেকে নূরানী আলোকরশ্মি

হেলমন্দ-পশ্চিম কান্দাহারের শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান বর্ণনা করেন,

আমরা সংখ্যায় ছয়শত মুজাহিদ ছিলাম, বিপরীত দিকে রাশিয়ানরা সংখ্যায় প্রায় ছয় হাজার। তাদের সাথে ছয় শত ট্যাংক ও৪৫টি মিগ জঙ্গী বিমান ছিলো। এগুলোর সাহায্যে তারা আমাদের উপর প্রচন্ড বেগে হামলা চালায়। ১৮দিন ব্যাপী অব্যাহত থাকা এই যুদ্ধের ফলাফল দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ

আমাদের ৩৩ সহযোদ্ধা ভাই শহীদ হয়ে যায়, দুশমনের ৪৫০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ৩৬জনকে জীবিত অবস্থায় আটক করি, ৩০টি ট্যাংক ও দুটি মিগ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। প্রচন্ড গরমের দিনে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু গরম সত্ত্বেও কোন শহীদের লাশ এতোটুকু বিকৃত হয়নি এবং কোন দুর্গন্ধেরও সৃষ্টি হয়নি। শহীদদের মধ্য হতে একজন আব্দুল গফুর ইবনে দ্বীন মুহাম্মাদ। প্রতিরাতে তার লাশ থেকে নূরানী আলোকরশ্মি বের হয়ে আকাশের দিকে উঠে যেতো, এই আলোকরশ্মি প্রায় তিনমিটার পর্যন্ত দেখা যেতো। এরপর ধীরে ধীরে সেই আলো শহীদ আব্দুল গফুরের সিনার ভিতর গায়েব হতো, যা উপস্থিত সকল মুজাহিদ প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করতেন।

উমর হানীফ আমায় বলেছেন, ১৯৮৬ সালের শা'বান মাসে এশার পর প্রতি রাতে আকাশ থেকে উজ্জল আলোরধারা মুজাহিদদের ঘর সমূহের উপর এসে পড়ত। ঘন্টা খানেক স্থির থাকার পর আলোর ধারা অদৃশ্য হতো।

মাওলানা আরসালান বলেন, শাহী কোটে তুমুল এক সংঘর্ষ চলাকালীন আনুমানিক দশ মিনেটের মতো আমার ভেতর তন্দ্রাভাব আসে, যখন চতুর্দিক থেকে দুশমন নানা ধরণের অস্ত্র দিয়ে বিরামহীন গোলা বর্ষণ করে চলছিলো। এই দশ মিনিট খোলা ময়দানে থাকা সত্ত্বেও তার দেহে সামান্য বালুকণার আঘাতও লাগেনি।

শহীদ উমর ইয়াকুব এবং তার রাইফেলের গুলি

উমর হানীফ বর্ণনা করলেন, মুজাহিদদের মধ্যে একজনের নাম উমর ইয়াকুব,তার মনে জিহাদের প্রতি সীমাহীন আন্তরিকতা ছিলো। সে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। আমরা কাছে গিয়ে দেখলাম নিথর দেহের শহীদ ইয়াকুব শক্ত হাতে তার গুলির ম্যাগাজিন ধরে রেখেছে। আমরা ম্যাগাজিন আলাদা করতে চাইলাম, কিন্তু সেগুলো শক্তভাবে তার হাতে জমে গিয়েছিলো। তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম,“ভাই ইয়াকুব! আমরা তোমার সহযোদ্ধা বন্ধু”, সাথে সাথে গুলির ম্যাগাজিন নীচে পড়ে গেলো।

শহীদদের কারামত

শহীদদের দেহ নিঃসৃত রক্তের দুর্লভ সুবাস মুজাহিদদের নিকট সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ সময় যাবত মুজাহিদগণ সেই সুঘ্রাণ অনুভব করেছেন।

মাওলানা নাসরুল্লাহ মানসুর হাবীবুল্লাহ ইয়াকুতের সূত্রে আমার সামনে বর্ণনা করেন যে, আমার ভাই শহীদ হয়ে যান। তার শাহাদাতের তিনমাস পর আমার মা স্বপ্নে দেখেন যে, সে আম্মাকে বলছে, আমার সকল যখম ভাল হয়ে গিয়েছে। মাথার একটি যখম ভাল হয়নি। স্বপ্ন দেখে মা বারংবার জোরাজুরি শুরু করলেন যে, তোমার ভাইর কবর খনন করো। আমার ভাইর কবর সংলগ্ন অন্য একটি কবরও ছিলো। প্রথমে সেই কবর খননের পর ভেতরে গর্তের মধ্যে আরেকটি কবরের অস্তিত্ব আবিস্কার করলাম। সেখানে মানুষের বহু পুরনো কংকালের উপর বিচ্ছ জাতীয় কিছু একটা দেখে আম্মা ভাইর কবর খনন করতে নিষেধ করলেন। আমি তাকে বললাম, আমার ভাই খোদার রাহে শহীদ হয়েছে, এটা অসম্ভব ব্যাপার তার কবরে বিচ্ছু পৌছবে। ভাইর শরীর খুঁজে পাবার সাথে সাথে তার লাশ থেকে নির্গত মন কাড়া সুঘ্রাণ উপস্থিত সবার অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করলো। ভাইর মাথায় তাজা যখমের চিহ্ন দেখতে পেলাম। সেখান থেকে ফোটা ফোটা রক্ত মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। আমার মা নিজের আঙ্গুল ভাইর যখমের রক্তের উপর রাখলেন, তার হাত বিস্ময়কর সুগন্ধযুক্ত হলো। পরবর্তী তিনমাস যাবত তার হাত থেকে

জান্নাতী সুঘ্রাণ নেবার জন্য অনেকেই আমাদের ঘরে এসেছে।

মুহাম্মাদ শীরীন বর্ণনা করেন, বোরাক এলাকায় আমাদের চারজন মুজাহিদ সাথী শাহাদাত বরণ করেন। চারমাস যাবত আমরা তাদের কবর থেকে মেশক জাতীয় ঘ্রাণ অনুভব করেছি। মুহাম্মাদ শীরীন অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ গিয়াস শহীদ হবার তিনমাস পর তাকে এক গুহার পাশে সোজাসুজি বসে থাকতে দেখি তিনমাস যাবত তার কোন সংবাদ না পেয়ে আমাদের হয়রানী চূড়ান্ত সীমায় পৌছেছিলো। আমি জীবিত মনে করে তাকে স্পর্শ করা মাত্র সে আস্তে শুয়ে পড়ে। তাকে দাফন করার সময় বুঝতে পারি যে, সে শহীদ হবার পর জীবন্ত হিসাবে কোন রকম পচন বা বিকৃতি ছাড়াই রাব্বুল আলামীন তাকে এভাবে বসিয়ে রেখেছেন।

তার বর্ণনায় আরেকটি ঘটনা, মুজাহিদ মুহাম্মাদ ইসমাঈল এবং গোলাম হযরত শহীদ হবার পরেও আমরা তাদের হাত থেকে রাইফেল ছাড়িয়ে নিতে পারিনি।

শহীদের মুচকি হাসি

মাওলানা আরসালান বর্ণনা করেন, মুজাহিদ আব্দুল জলীল একজন উত্তম চরিত্রের তালিবে ইলম হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এক সংঘর্ষে দুশমন জঙ্গী বিমানের বোমার আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। জানাযা শেষে আসরের ওয়াক্তে শহীদ আব্দুল জলীলের লাশ তার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

পরবর্তী সকাল পর্যন্ত শহীদের লাশ সেখানেই থাকে। বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ রাতের বেলায় লাশের পাশে অবস্থান কালীন কিছুক্ষণ পরপর দেখতে পান শহীদ আব্দুল জলীলের ঠোটে মুচকি হাসি ফুটে উঠছে। সকালে তারা মাওলানা আরসালানের নিকট এসে স্বচক্ষে দেখা ঘটনা শুনিয়ে বলতে থাকেন, আব্দুল জলীল মৃত্যুবরণ করেনি। উত্তরে মাওলানা আরসালান বলেন, হা সে মৃত্যুবরণ করেনি বরং শহীদ হয়েছে।

মুজাহিদগণ বললেন, মৃত্যুর ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হবার পূর্বে তাকে দাফন করা ঠিক হবে না এবং পূর্ণবার তার জানাযা পড়তে হবে। মাওলানা আরসালান তাদের বুঝালেন, সেতো গতকালই শহীদ হয়েছে কিন্তু তার মুচকি হাসি খোদার পক্ষ থেকে আমাদের সামনে কারামত স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। বাগমানের নেতৃস্থানীয় কমান্ডার মুহাম্মাদ উমর আমায় শুনিয়েছেন, আমাদের সাথী মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ শাহাদাত লাভের মাধ্যমে জান্নাতের বাসিন্দাদের মাঝে নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করেন, দাফন করার সময় তার ঠোটে মৃদু হাসির ঝলক দেখতে পাই। মুহাম্মাদ পুরদিল এবং তার সহকারী মুহাম্মাদ করীম বর্ণনা করেন, মুজাহিদ মুহাম্মাদ মঙ্গলের বিবি এবং অল্প বয়সী সন্তান শহীদ হয়ে যায়। শাহাদাতের মুহূর্তে ছোট্টবাচ্চা তার মায়ের দুধ পান করছিলো। লোকেরা দাফনের পূর্বে মায়ের কোল থেকে সন্তানকে আলাদা করতে চাইলো, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের সাথে আঠার মতো লেগেছিলো, ফলে লোকদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হলো। হানাফী মাযহাবে দুই মৃতকে একসাথে দাফন করা নিষিদ্ধ। বিশেষ কোন ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞায় শিথিলতা রয়েছে। এর ভিত্তিতে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিয়ে মা-পুত্রকে একই কবরে দাফন করা হলো।

কর্তিত মস্তক উধাও

জাজীর কমান্ডার সারওয়াল মুহাম্মাদ (যিনি গারদেযের বাসিন্দা) আমায় বললেন, এক সংঘর্ষ চলাকালে আমাদের এক সাথী মুজাহিদ লাপাত্তা হয়ে যায়। ব্যাপক খোঁজাখুঁজির পরেও তার কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না। রাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম,সে আমায় বলছিলো,আমি অমুক স্থানে আছি। দিনের বেলা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে আমরা তার ছিন্ন মস্তক পড়ে থাকতে দেখি । আমরা তা উঠিয়ে এনে যথাযথ সম্মানের সাথে দাফন করি। কয়েক ঘন্টা না যেতেই আরেকবার কমিউনিস্টদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। আমরা এক দুশমনকে কয়েদ করি, তার নিকট জানতে চাই,আমাদের সাথীকে কে জবাই করেছে? সে এক কমিউনিস্টের নাম উল্লেখ পূর্বক বলে যে, ঐ ব্যক্তি তোমাদের সাথীকে জবাই করেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পায় যে, শহীদ মুজাহিদের লাশের ছিন্ন মস্তক সেখান থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছে। পরের দিন আবার দেখে যে, মাথা শরীরের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। দ্বিতীয়বার মুজাহিদকে জবাই করে এক অফিসারের দফতরে ফেলে রাখে। কিছুক্ষণ পর আবার সেখান থেকে কর্তিত মাথা

উধাও হয়ে যায়। উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে কিছুক্ষণ পর উধাও হওয়া মাথা কোথা থেকে এসে পুনরায় দেহের সাথে যুক্ত হয়। তারা হুকুমতের এক তাবেদার আলেমের নিকট ঘটনা সবিস্তারে উল্লেখ করে তাদের করনীয় কি হবে জানতে চায়। সে তাদের বলে, যদি তোমরা শহীদের মস্তকশূন্য দেহ পেশাবের সাহায্যে নাপাক করে দাও তাহলে তার মস্তক পূর্বের স্থানে ফিরে আসবেনা। সুতরাং খোদার দুশমন কমিউনিস্ট সেনারা শহীদের শরীর পেশাবের সাহায্যে অপবিত্র করে দেয়। এবং আরেকবার মাথা কেটে ফেলে। এবার তার মাথা গায়েব হবার পর দ্বিতীয়বার দেহের নিকট ফিরে আসেনি।

স্বপ্নের মাধ্যমে মুজাহিদ নিজের কবর চিহ্নিত করলো

হাফীযুল্লাহ আমীনের শাসনামলের কথা। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের সাহায্য করা এবং মুজাহিদদেরকে পিষে ফেলার জন্য হুকুমত নিজের অনুগত লোকদের খারমাত এলাকায় এনে জড়ো করে। মুজাহিদগণ সংখ্যায় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও প্রচন্ড লড়াই হয়। মুজাহিদদের মধ্যে ২৪জন শহীদ এবং তালিব খান নামক একজন নিখোঁজ হয়। অনেক অনুসন্ধানের পরেও তার কোন হদিস মিললো না । তালিব খানের ভাই শাওর খান এক রাতে স্বপ্নে দেখলো তার ভাই তাকে বলছে, “তোমরা যেখানে মর্টার তোপ স্থাপন করেছিলে সেখানে আমার লাশ পড়ে আছে। শাওর খান সাথীদের নিকট স্বপ্নের কথা বলে গুরুত্ব লাভে ব্যর্থ

হয়ে মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানীর নিকট স্বপ্নের আদ্যোপান্ত খুলে বলল। মাওলানা হক্কানী নির্দেশিত স্থানে অনুসন্ধানের জন্য কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলেন। হুকুম মোতাবেক মুজাহিদগণ সেখানে পাথর চাপা অবস্থায় তালিব খানের লাশ আবিস্কার করলেন। ছয়দিন অতিবাহিত হবার পরেও তার যখম থেকে রক্ত ঝরছিলো। তাকে সেখানে কে দাফন করেছে এ বিষয়ে মুজাহিদগণ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। তালিব খান মাওলানা হক্কানীর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন।

শহীদের রক্তে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাপ পড়লো

যারউন শহরে শের আগার সহযোদ্ধাদের অন্যতম মুজাহিদ আব্দুল জব্বার বর্ননা করেন, ১লা জুলাই ১৯৮৬ সালে পাগমানে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সামনা সামনি সংঘর্ষ চলাকালে আমাদের সাথী শের আগা মুহাম্মাদ শাহাদাত বরণ করে। আমরা তাকে সাদা কাফনে দাফন করি। কিছুক্ষণ পর দেখতে পাই, তার যখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে সাদা কাপড়ের উপরে সুস্পস্টভাবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” কালিমা ফুটে উঠেছে। এই অভাবনীয় কারামত আমার আরো অনেক সাথী প্রত্যক্ষ করে।

মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরত

মুহাম্মাদ নকীবুল্লাহ বিন আব্দুস সালাম নিজের চার সহোদর সহ মুহাম্মাদ আগা নামক উপত্যকায় ১৪০৪ হিজরীর ৯ই জিলহজ্জ দুশমনের মোকাবেলা করছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে দুশমন বাহিনী ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে। মুজাহিদগণ ১০০ ট্যাংক, মটর গাড়ি,এবং সাজোয়া যান সহ প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র গণীমত হিসেবে লাভ করেন।

মুহাম্মাদ নকীবুল্লাহ বলেন, সেই যুদ্ধে আমাদের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ নাঈম শহীদ হন। আমি রাতভর তার লাশের প্রহরায় নিযুক্ত ছিলাম। ঈদুল আযহার দিন সকালে আচমকা আশপাশের বড় বড় পাথর খন্ড বৃক্ষ রাজি এবং দরিয়া থেকে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায ভেসে আসতে থাকে। ভাবলাম হয়তো আমি স্বপ্ন দেখছি অথবা শুয়ে আছি এবং ইমাম সাহেব কুরআন তিলাওয়াত করছেন। ক্রমাগত আওয়ায শুনতে শুনতে সন্দেহ মুক্ত হবার জন্য নিজের দেহে চিমটি কেটে দেখলাম আমি জেগেই আছি এবং আমার আশপাশের সবকিছু মাওলার কালামে পাকের তিলাওয়াতে লিপ্ত রয়েছে।

শহীদ কর্তৃক স্বপ্নের মাধ্যমে গুপ্ত ভান্ডারের সন্ধান

মতীউল্লাহ এবং আতীকুল্লাহ আমায় বলেছেন, আমাদের সাথে উত্তম চরিত্র,পরহেযগার ও দরবেশ প্রকৃতির কাযী গুলাম মুহাম্মাদ নাম্মী এক মুজাহিদ

ছিলেন। তিনি একদিন এক পাহাড়ী গর্তে গুপ্ত ভান্ডারের সন্ধান লাভ করে আমাদেরকে বলেন, ওখানে সঞ্চিত সম্পদ উদ্ধার করে মুজাহিদদের মদদে কাজে লাগাবো। এর দুদিন পরে দুশমনের সাথে যুদ্ধ শুরু হলে তিনি শহীদ হয়ে যান। উল্লেখ্য সেই গুপ্ত ভান্ডারের অবস্থান সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ কিছু জানতোনা। প্রাণান্ত কোশেশ সত্বেও তার কোন পাত্তা পেলাম না। নিরাশ হয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে ফরিয়াদ করলাম,“হে আল্লাহ! যদি সেই ব্যক্তি সত্যিই শহীদ হয়ে থাকে, তাহলে তুমি স্বপ্নের মাধ্যেমে হলেও তার কাছ থেকে আমাদেরকে গুপ্ত ভান্ডারের সন্ধান নেবার ব্যবস্থা করে দাও”।

আতীকুল্লাহ বলেন, আমি সেই রাতেই গুলাম মুহাম্মাদকে স্বপ্নে দেখি । তিনি আমায় বললেন, গোপন ভান্ডার অমুক স্থানে পাথরের নীচে চাপা দেয়া অবস্থায় আছে। পরের দিন আমরা তার সন্ধান লাভ করি।

মতিউল্লাহ বলেন, আমি শহীদের মাথার
আধা আঙ্গুল পরিমান লম্বা একটি চুল আমার নিকটে থাকা কুরআন শরীফের ভেতর রেখে দিলাম। কয়েকদিন পর কুরআনের সেই পাতা উল্টে দেখতে পাই চুলটি পূর্বের তুলনায় বেশ লম্বা হয়ে গেছে। আব্দুলাহ আযযাম বলেন, সংরক্ষিত সেই চুল আমি নিজে মতীউল্লাহর কাছ থেকে হাতে নিয়ে দেখেছি।

শহীদের হাতে জমে যাওয়া রাইফেল

এক মুজাহিদ কমান্ডার কতিপয় আরব সহযোদ্ধার নিকট তার একসাথীর এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেই মুজাহিদ ক্যাম্পে পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তার মন সর্বদা সরাসরি দুশমনের মোকাবেলায় যাবার জন্য ব্যাকুল থাকতো। যখনি কোন অপারেশনের সময় আসতো, সে কমান্ডারের নিকট বিনীতভাবে সেই অপারেশনে অংশ নেবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতো। এভাবে একদিন সে কমান্ডারের পদ স্পর্শ করে বলল, আমাদের এলাকার একদল মুজাহিদ অভিযানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমায় তাদের সাথে যাবার অনুমতি দান করুন। কমান্ডার তার মাঝে জিহাদের প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে তাকে যাবার অনুমতি দিলেন। সে উফুল্ল মুখে মুজাহিদদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলো। রণাঙ্গনে সে সম্মুখ সারিতে থেকে প্রবল বিক্রমে লড়তে লড়তে একদিন শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোট রাখে ।

যুদ্ধ শেষে মুজাহিদরা শহীদদের সন্ধানে নেমে পড়লেন। নাম না জানা সেই নওজোয়ান নিজের রাইফেল শক্ত হাতে ধরে দুশমনের উপর ফায়ারিং করতে করতে মোর্চার ভেতরেই শাহাদাত বরণ করে। সাথীগণ তার হাত থেকে কালাশনিকভ পৃথক করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বন্দুকের উপর শহীদের হাত এমন শক্তভাবে বসে গিয়েছে যে, তারা শত চেষ্টাতেও তা বিচ্ছিন্ন করতে অসমর্থ হলেন। অনেক ভেবেচিন্তে তারা নিকটবর্তী

মারকাযের এক দ্বীনি আলেম মুজাহিদের শরণাপন্ন হন। মাওলানা সেখানে পৌছে শহীদের নিথর দেহের পাশে দাঁড়িয়ে বুলন্দ আওয়াযে কুরআনে কারীমের সেই আয়াত তিলাওয়াত করেন, যেখানে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,“ তোমরা শহীদদেরকে মৃত বলোনা, কেননা তারা জীবিত আছে”--- আয়াত তিলাওয়াত শেষে তিনি শহীদকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন; তোমার কতোইনা খোশ কিসমত যে, তুমি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছ, এমনিভাবে আল্লাহর দ্বীনের হেফাযতের জন্য তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব তুমি সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছে। এবার তুমি হাতের রাইফেল ছেড়ে দাও, যেন এটা তোমার আরেক ভাইর কাজে আসে এবং আমরা তোমাকে দ্বীনের নির্দেশনানুযায়ী দাফন করতে পারি।

কমান্ডার বর্ণনা করেন; এই কথা শেষ
করে মাওলানা রহমানী শহীদের রাইফেল স্পর্শ করার সাথে সাথে তা তার হাতে চলে আসে, এতোক্ষণ এর উপর চেপে থাকা শহীদের ইস্পাত কঠিন মুষ্ঠি মুহূর্তে আলগা হয়ে যায়।

শাহাদাতের পরেও সে হাসছিলো

মুহাম্মাদ শাদীন হাফেয ক্বারী আব্দুর রহমানের ব্যাপারে বর্ণনা করেন; সে দুপুর ১২টা নাগাদ শহীদ হয়, আমরা মাগরিবের সময় তাকে দাফন করি, দাফনের সময় সে জোরে জোরে হাসছিলো। তার কবরের উপর পাথর রাখার সময়েও তার খিলখিল হাসির আওয়ায শুনে আমরা একে অপরকে বলতে লাগলাম, সে হয়তো

মারা যায়নি। তখন সেখানে শতাধিক মুজাহিদ উপস্থিত ছিলেন। তার কবর থেকে প্রাণ কাড়া সুঘ্রাণ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিলো। উপস্থিত মুজাহিদদের মধ্যে বিশেষভাবে যাদের নাম উল্লেখ করা যায় তারা হলেন, শায়খ ফাতহুল্লাহ এবং হামদুল্লাহ।

আব্দুল ওয়াহিদ বিন ফয়য মুহাম্মাদ তারাকীর শাসনামলে আফগান ফৌজের কর্ণেল থাকা অবস্থায় মুজাহিদদের দলে শামিল হন। তিনি এক যুদ্ধক্ষেত্রে আমায় বলেন, আমি হেরাতের এক কমিউনিস্ট কর্মকর্তাকে কয়েদ করি, তার নাম আব্দুল ওয়াহাব। আমি তার নিকট জানতে চাইলাম। তুমি হাতিয়ার কেন ফেলে দিলে? সে উত্তরে বলল; আমি দেখলাম পুরো এলাকায় সফেদ লেবাস পরিহিত সৈন্যরা বিশাল আকারের অস্ত্র নিয়ে তোমাদের মদদে নেমে এসেছে। তখন হাতিয়ার ফেলা ছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা আমার চোখে পড়েনি।

কবর থেকে আলোর বিচ্ছুরণ

রহমাতুল্লাহ বর্ণনা করেন; আমাদের
তিন মুজাহিদ সাথী কমান্ডার আব্দুল মজীদ, রুযীখান ও মুহাম্মাদ আয়ুব শহীদের খাতায় নাম লিখায়। আমরা তিনজন কে দাফন করি। দাফন করার পরে ক্রমাগত তিন রাত তাদের কবর থেকে বিস্ময়কর আলোক বিচ্ছুরণ হয়। গ্রামের লোকজন নূরের ব্যপারে কানাকানি শুরু করলে তাদের কবর থেকে নূর প্রকাশ পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

তিন বছরের পুরনো তরতাজা লাশ

লোগড় প্রদেশের ‘বারকী বারাক’ এলাকার
এক পাহাড়ী উপত্যকা সংলগ্ন মোর্চায় ডাক্তার হামীদুল্লাহ এবং আমি দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। ডাক্তার হামীদুল্লাহ দুশমনের হামলায় শাহাদত বরণ করেন। আমাদের এলাকা পূর্বে শত্রুমুক্ত হয়েছিলো, সেখানে তাকে দাফন করলাম। ডাক্তার হামীদুল্লাহর এলাকা শত্রুমুক্ত হবার পর সেখানকার লোকজন দাবী তুললেন, আমাদের এলাকা আযাদ হয়ে গেছে, সুতরাং শহীদ হামীদুল্লাহর লাশ তুলে নিয়ে আমাদের ওখানে দাফন করবো। শত বুঝানো সত্বেও তারা তাদের যুক্তিতে অনড় রইলেন। আমার ধারণা ছিলো, এতদিনে তার লাশ বিকৃত হয়ে গেছে। আমি তাদেরকে আমার এই আশংকা সম্পর্কে অবহিত করলে তারা উত্তর দিলেন; শহীদের লাশ খেয়ে ফেলা অথবা বিকৃত করার মতো দুঃসাহস আফগানের মাটির হবেনা। তাদের নিরন্তর জোরাজুরির সামনে আমাকে পরাজয় স্বীকার করতে হলো। আমি আশপাশে নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করলাম । খোদা না করুন লাশের কোন রকম বিকৃতি বা পচন দেখে তাদের মনে যেন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়।

রাতের আঁধারে তার ভাইকে সাথে নিয়ে
আমি কবর খনন করলাম। শহীদ হামীদুল্লাহর দেহের কাপড়েই তাকে দাফন করা হয়েছিলো। কিন্তু তার শরীর তরতাজা দেখতে পেলাম। নখ, দাড়ি এবং চুল দৈর্ঘ্যে কিছুটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলো। তার শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক সুগন্ধ ভেসে আসছিলো।

দুই ঘন্টা পর আমরা লাশ সাধারণ মানুষের সামনে হাযির করলাম। তিন বছর অতিবাহিত হওয়া সত্বেও লাশ দেখে মনে হচ্ছিলো, এইমাত্র শহীদ হয়েছেন। উপস্থিত সকলে আল্লাহর কুদরতের মহিমা দেখে তাঁর প্রশংসায় লিপ্ত হলেন। উল্লেখ্য আফগানিস্তানে এধরনের অসংখ্য ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে।

যদি তুমি শহীদ হয়ে থাকো তাহলে মুচকি হাসি দিয়ে দেখাও

উসামা বিন যায়েদ ছাউনীতে দুশমনের অতর্কিত হামলায় ১৯৮৬ সালের ২৯শে মার্চ মুজাহিদ শের মুহাম্মাদ শহীদ হন। আরেক মুজাহিদ জাফরের সহোদর শের মুহাম্মাদের বীরত্ব ও দূরন্ত সাহসিকতা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো, একই কথা জাফরের বেলায়ও প্রযোজ্য। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে সাড়াশী আক্রমণকারী দলে জাফর, শের মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, গুল রহমান, ইউসুফ এবং আব্দুল বাকী শামিল ছিলেন। এই অভিযানে শের মুহাম্মাদের পাশাপাশি গুল মুহাম্মাদ ও প্রাণ বিসর্জন দেন। দাফনের পূর্বে জাফর তার শহীদ ভাইকে লক্ষ্য করে আবেগের আতিশয্যে বলেন; “যদি তুমি সত্যিই শহীদ হয়ে থাকো তাহলে মুচকি হাসি দিয়ে আমাদেরকে দেখাও”। তার কথা শেষ হতেই শের মুহাম্মাদের ঠোঁটে মৃদু হাসির গোলাপ ফুটে উঠলো। জাফর এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য চাক্ষুস করার জন্য তার মাকে সামনে নিয়ে এলেন। কিন্তু জাফরের আরেকভাই লাশ দেখলেও তাদের

মা শহীদ পুত্রের মুচকি হাসি দেখতে পারেননি। মা সেখানে আসার পূর্বেই শের মুহাম্মাদের চেহারায় গাম্ভীর্যতা ফুটে ওঠে।

লাশ থেকে নূর প্রকাশ পেলো

সারখাবের কাযী যামরে বর্ণনা করেন; কয়েক বছর পূর্বে মাসাঈ এলাকায় কমিউনিস্টদের সাথে মুজাহিদদের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা তিন দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। সেই যুদ্ধে ৮০ জন মুজাহিদের শাহাদাতের বিপরীতে ১৮০০ (আঠারোশত) রুশ সেনা প্রাণ হারায়।

যুদ্ধ শেষে দেখা গেলো, শহীদদের লাশের কারণে পুরো পাহাড়ী উপত্যকা বিস্ময়কর আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অসংখ্য মানুষ এই অভাবনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো। তাছাড়া কয়েক দিন যাবত সবুজ রংয়ের কবুতর আকাশ থেকে উড়ে এসে শহীদদের পাশে বসে থাকতো। কবুতর গুলো মুজাহিদদের লাশের চতুর্দিকে চক্কর দিতো। এই ঘটনা এতো বিপুল পরিমাণ মানুষের মুখ থেকে শুনেছি যে, অবাস্তব বলে মনেই হয়নি।

লাশের সুগন্ধ

কুতুব খিলের নিকটবর্তী ছোট্ট শহরে মুজাহিদ ও কমিউনিস্টদের যুদ্ধ চলছিলো। মুজাহিদ মুহাম্মাদ নাঈম আমার পাশে শহীদ হয়ে পড়েছিলেন। আমার মনে পড়লো, কিছুদিন

পূর্বে নিজের পরিবারকে নিরাপত্তার খাতিরে কাবুলের দিকে পাঠানোর পূর্বে সে বলে ছিলো, “তোমরা ঈদুল আযহার নামায কাবুলে আদায় করবে, আর আমি জান্নাতে ঈদের নামায পড়বো”।

শহীদ হবার কিছুক্ষণ পর লাশ থেকে নির্গত হয়ে এক ধরনের প্রাণ কাড়া সুঘ্রাণ পুরো উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। আমি পরে উপলদ্ধি করলাম, আশ পাশের পাহাড়, ঝোপ ঝাড়, ছোট্ট পাহাড়ী নদী সবস্থান থেকে সেই ঘ্রাণ আসছে।

মুহাম্মাদ সারনাওয়াল বলেন, আমি যারমাত এলাকায় এক শহীদের কবর থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি।

সে আমাদের নয় তোমাদের অন্তর্গত

৩১ জুলাই ১৯৮৬ সালে আমরা সারোব সংলগ্ন মুজাহিদ ছাউনীতে বসে ছিলাম। শের মুহাম্মাদ বর্ণনা করলেন; গযনীতে যুদ্ধ চলাকালীন কমিউনিষ্ট বাহিনীর দুই শিখ সেনা আমাদের নিকট এসে আশ্রয় নেয়। তারা আমাদের হয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিয়ে প্রাণ হারায়। কাবুলে তাদের পরিবার পরিজনের নিকট মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়ে তাদের লাশ নিয়ে যাবার জন্য বললাম। আত্মীয় স্বজন এসে তাদের লাশ শিখ ধর্মমতে আগুনে পোড়ানোর জন্য লাকড়ির উপর রেখে আগুন ধরিয়ে দিলো । আগুন নির্বাপিত হবার পর দেখা গেল কাঠ পুড়ে কয়লা হয়ে গেলেও তাদের কারো দেহে আগুনের সামান্য

তাপও লাগেনি। এই অবস্থা দেখে তাদের নিকটাত্মীয়রা বলতে লাগলো এরা আমাদের নয় এখন তোমাদের হয়ে গেছে। আমরা দুই জনের লাশ ফেরত নিয়ে ইসলামী বিধান মোতাবেক দাফন করলাম।

এদিকে এসো! কমিউনিস্টরা আমার লাশ নিয়ে যেতে চাইছে

হাজী ইহসানুল্লাহ গোলাম সখীর ভাইর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন; ‘চিমানী', উপত্যকার এক যুদ্ধে হিযবে ইসলামীর কমান্ডার রহীম শাহ এবং আমার ভাই গোলাম সখী শাহাদাত বরণ করেন। আমরা উভয় শহীদকে পাশাপাশি দাফন করি, সেই রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, গোলাম আমায় সাহায্যের জন্য আর্তস্বরে আহ্বান করছে। সে বলছিলো; “এদিকে এসো, কমিউনিস্টরা আমার লাশ নিয়ে যেতে চাইছে।”

আমার দুর্ভাবনার কারণেই এমন স্বপ্ন দেখছি ভেবে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর আবার সে স্বপ্নের মাঝে সাহায্য চাইতে লাগলো; “জলদী এদিকে এসো! কমিউনিস্টরা আমার লাশ নিয়ে যেতে চায়।” বিনিদ্র হয়ে আমি তৎক্ষণাত রশীদ শাহর ঘরে গিয়ে তার কতিপয় বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে কবরস্থানে হাযির হলাম, গিয়ে দেখি, বাস্তবিকই কয়েকজন কমিউনিস্ট সেনা দুই কবর খননের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা তাদের উদ্দেশ্যে গুলী বর্ষণ করতেই তারা লেজ গুটিয়ে পালালো।

উল্লেখ না করলেই নয় যে, কমিউনিস্টরা শহীদ মুজাহিদদের লাশ উঠিয়ে তাদের আখড়ায় নিয়ে লাশের পাশে বসে মদ্যপান পূর্বক নৃত্যের আসর জমানোর ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালাতো। কোন কমান্ডারকে শহীদ করতে পারলেই তারা এমন করার চেষ্টা করতো। তাছাড়া এমন করে তারা অন্যান্য সৈন্যদের মন থেকে মুজাহিদদের ভীতি দূর করার ব্যর্থ কোশেশ চালাতো।

ঠান্ডা বরফের মাঝেও শহীদের গরম শরীর

লোগড় অঞ্চলে শীতের মৌসুমে শৈত্যপ্রবাহের পাশাপাশি প্রচুর বরফপাত হয়ে থাকে। এমনই এক শীতে লোগড়ের দুশমন বাহিনী হামলা চালিয়ে ১৫জন বুযুর্গ চরিত্রের ব্যক্তিকে কয়েদ করে খোলা মরু প্রান্তরের দিকে চলে যায়। আমরা ভাবলাম, তাদেরকে জেলে বন্দী করার জন্য নিয়ে গিয়েছে। পরে জানলাম, তাদেরকে খোলা প্রান্তরে নিয়ে নিমর্মভাবে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। একজনের পায়ে গুলী বিদ্ধ হলে তিনি নীচে পড়ে যায়, অন্যদেরকে গুলীর আঘাতে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে রাশিয়ানরা চলে যায়।

তারা চলে যাবার কিছুক্ষণ পর যখমী ব্যক্তি মাথা উঠিয়ে দেখেন যে, তার সকল সাথী নির্জীব পড়ে আছেন এবং তাদের চারপাশে কয়েকটি বাঘ চুপচাপ দাড়িয়ে আছে, কিন্তু সেগুলো কোন লাশ স্পর্শ করেনি। বরং মনে হচ্ছিলো তারা লাশের প্রহরায় নিযুক্ত আছে। যখমী ব্যক্তি শরীরের

বিভিন্ন স্থানে গুলীর আঘাত নিয়ে প্রাণান্ত প্রচেষ্টার পর মুজাহিদদের নিকট পৌছলেন । তার বর্ণনা মোতাবেক মুজাহিদগণ দ্রুত সেখানে হাযির হলেন এবং কয়েক ফুট বরফের নীচ থেকে শহীদদের লাশ উদ্ধার করলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, বরফের নীচে চাপা পড়া সত্ত্বেও তাদের কারো লাশ জমে যায়নি এবং তাদের শরীরের উষ্ণতা বজায় ছিলো।

১৮ মাসের পুরানো লাশ থেকে রক্ত ঝরে পরে

হাজী সারওয়ার, মুহাম্মাদ মুআল্লিম
তূর খান এবং মুআল্লিম দাউদখান বর্ণনা করেন; কুতুবখীলের কাছাকাছি একস্থানে ৪৫ জন মুজাহিদ শহীদ হন, তাদেরকে সেখানেই দাফন করা হয়। ১৮ মাস পর ১৯৮৬ সালের আগস্টে দুশমন বাহিনী তাদের কবরস্থান এবং পাশের লোকালয়ে প্রচন্ড বোমা বর্ষণ করে। তাদের বোমার আঘাতে শহীদদের কবরগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। কবর ভেঙ্গে শহীদ মুবারক শাহ, হাজী মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ ইয়াসীনের লাশ বাইরে বেরিয়ে যায়। যখন আমরা লাশ দেখতে যাই তখন শহীদদের লাশ থেকে সদ্য আঘাত প্রাপ্ত জীবিত মানুষের দেহের ন্যায় তাজা রক্ত নীচে গড়িয়ে পড়ছিলো। তাদের নখ এবং দাড়ি চুল পূর্বের তুলনায় কিছুটা লম্বা হয়েছে। তাদের দেহ থেকে দুর্লভ ঘ্রাণ নির্গত হয়ে উপস্থিত সবার অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে দিলো। সেখানে প্রায় তিনশত মুজাহিদ স্বশরীরে উপস্তিত ছিল।

পাঁচ মাস পুরানো তরতাজা লাশ

১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে গারদেয় থেকে খোস্তে দুশমনের কনভয় এসে পৌঁছে। দুশমনের ঘেরাওয়ের ভেতরে পরে বাদশাহ খান শহীদ হয়ে যায়। আমরা তার লাশ সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হই। পাঁচমাস পর সংবাদ আসে যে, তার লাশ গারদেযের নিকট পড়ে আছে। একদল মুজাহিদ সেখান থেকে লাশ ক্যাম্পে নিয়ে আসে। শহীদ বাদশাহর লাশ দেখে মনে হচ্ছিলো, সে এই মাত্র চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছে। জঙ্গলে পড়ে থাকা সত্বেও কোন হিংস্র প্রাণী তার লাশ স্পর্শ করেনি।

যাওর এলাকায় শহীদ হবার ৮ মাস পর এক মুজাহিদের লাশের সন্ধান পাওয়া যায়। তার লাশ একদম তাজা এবং সুগন্ধযুক্ত ছিলো।

শহীদ হবার পরে পাচ বার মায়ের সাথে সাক্ষাত

আলোচ্য ঘটনা ভাই ফরীদুন শুনিয়েছেন, যিনি দীর্ঘ দিন যাবত রাজধানী কাবুলে বিভিন্ন হামলায় অংশ নিয়েছেন। ১৯৮২ সালের ঘটনা, কাবুলের পার্শ্ববর্তী লোগড় প্রদেশে পুলিশ একাডেমীর দুই শিক্ষার্থী মুজাহিদ দলে যোগ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছুটি নিয়ে বাড়ী ফিরে তারা এলাকার পরিচিতদের মাধ্যমে মুজাহিদ দলে শামিল হয়।

দীর্ঘ দিন জিহাদে লিপ্ত থাকার পর একদিন সেই দুইজনের একজন নিজ মুজাহিদ

গ্রুপের কমান্ডার ও অন্যজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসেবে তার নায়েব নিযুক্ত হয়। দ্বিতীয় মুজাহিদের আত্মীয় বলতে তার বৃদ্ধা মা বেঁচে ছিলেন, তিনি গ্রামে একাকী থাকতেন। মুজাহিদদের অবস্থান থেকে সেই গ্রামে যেতে হলে কাবুল লোগড় মহাসড়ক অতিক্রম করে যেতে হয়। গ্রামবাসী সর্বোতভাবে মুজাহিদীনদেরকে সাহায্য করতো, তারা মুজাহিদদের খাদ্যের যোগান দিতো। নায়েবে কমান্ডার একবার গ্রাম থেকে রুটি আনার দায়িত্ব কমান্ডারের মাধ্যমে নিজ যিম্মায় নেয়, সে নিজের বৃদ্ধা মায়ের সাথে সাক্ষাতের অনুমতিও নিয়ে নেয়।

সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সে নিজ সাথীদেরকে বলে, আজ আমি শহীদ হয়ে যাবো। সাথীগণ তার এই কথাকে তেমন আমলে নিলোনা, যেহেতু এমন আকাংখা তাদের প্রত্যেকের মনে সর্বদা বিদ্যমান থাকে। নির্ধারিত সময়ে সে খাবার নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নেয়। ঠিক তখন কাবুল থেকে এক বিশাল সামরিক কনভয় সেই গ্রামের সামনে পজিশন নেয়। সেখানে উপস্থিত হাতে গোণা কয়েকজন মুজাহিদ দুশমনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই দৃশ্য দেখে নওজোয়ান নায়েবে কমান্ডার নিজেও প্রতিরোধ হামলায় শরীক হয়। তারা দুশমনের বিশেষ ক্ষতি সাধনে সক্ষম হলেও এক পর্যায়ে তাদের গুলী ফুরিয়ে যায় এবং ৪০ জন মুজাহিদ বন্দী হয়। কয়েকজন মুজাহিদ তাদের হাত থেকে নিরাপদে সরে পড়তে সক্ষম হয়। রাশিয়ানরা বন্দী মুজাহিদদের হাত পা রশি দিয়ে বেঁধে এক গর্তে ঢুকিয়ে

বুলডোজার দিয়ে তাদেরকে মাটির সাথে পিষে ফেলে। সেই নওজোয়ানও শহীদদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

কোনক্রমে বেঁচে যাওয়া মুজাহিদগণ দ্রুত ক্যাম্পে পৌছে সাথীদের মর্মান্তিক পরিণতির খবর জানালো। এর দু'দিন পর সেই পুলিশ একাডেমী পালানো নওজোয়ানের বৃদ্ধা গর্ভধারিণী মা তার কমান্ডারের সামনে হাযির হয়ে বললেন, আমাদের গ্রামের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী টিলায় দুশমন পোস্ট কায়েম করেছে, তুমি তোমার সহযোদ্ধাদের নিয়ে হুশিয়ার থেকো। আর আমার বেটাকে নিষেধ করে দিও যেন এই বিপদসংকুল মুহূর্তে সে আমার সাথে দেখা করতে না যায়। এমন যেন না হয় যে, তার আসা যাওয়া দুশমনের চোখে ধরা পড়ে এবং তারা আমার আদরের দুলালের কোন ক্ষতি করে। তাকে যখন দেখতে মন চাইবে, আমি নিজেই এখানে এসে তার সাথে মোলাকাত করে যাবো।

শহীদের মায়ের মুখে একথা শোনার পর কমান্ডারের এই দুঃসাহস হলো না যে, সে দুঃখিনী মাকে তার একমাত্র জওয়ান বেটার শাহাদাতের খবর দিবে, যে সম্পর্কে বৃদ্ধা ততোক্ষণ পর্যন্ত বেখবর ছিলেন। তিনি বৃদ্ধার পরামর্শ মেনে চলতে সম্মতি দিলেন এবং নেহায়েত শ্রদ্ধার সাথে তার ফিরে যাবার ব্যবস্থা করলেন। তিন দিন পর বৃদ্ধা মা আবারো মুজাহিদ ক্যাম্পে এসেই কমান্ডারকে লক্ষ্য করে অভিযোগ শুরু করলেন; তুমি আমার বেটাকে নিষেধ করোনি, সে আজও আমার সাথে দেখা করার জন্য ঘরে গিয়েছিলো । আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে নিষেধ

করো, সে যেন আপাতত ঘরে না যায়। এরপর কমান্ডারের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব হলো না। তিনি বিস্ময়ের সুরে জানতে চাইলেন; আপনার বেটা এখনো আপনার সাথে মোলাকাতের জন্য ঘরে যায়? বৃদ্ধা “হ্যা” বলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। মুহূর্তের মাঝে কমান্ডার ঘেমে উঠলেন, তার দেহ মনে কম্পনের সৃষ্টি হলো, তথাপি তিনি বাস্তব ঘটনা চেপে গেলেন। বিদায় বেলায় শহীদের মা বলে গেলেন, তাকে বুঝিয়ে বলো যে, সে যেন দুশমন পোস্টের এতো কাছ দিয়ে ঘরে না যায়, অনর্থক এতো বড় ঝুঁকি নেবার প্রয়াজোনটা কী? পাঁচ দিন না যেতে বৃদ্ধা তৃতীয় বার কমান্ডারের নিকট এসে কিছুটা রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন; তুমি কেমন কমান্ডার হে! যে নিজের একজন সাথীকে সামলাতে পারোনা? পূর্বের বার আমি তোমার নিকট অভিযোগ করে যাবার পর আমার বেটার সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো, অথচ এখন সে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী ঘরে যাচ্ছে । বিগত পাঁচ দিন যাবত সে কিছুক্ষণ পরপর ঘরে গিয়েছে। কেন তুমি তাকে বারণ করছোনা?

এতোক্ষণ অতিকষ্টে কমান্ডার নিজেকে সংযত করে রেখে ছিলেন। তারপক্ষে আর সংযম ধরে রাখা সম্ভব হলোনা। তিনি চিৎকার করে বললেন, “মা! আজ দশদিন হতে চলেছে আপনার বেটা খোদার রাহে জান কোরবান করেছেন।

সেই কমান্ডার ফরীদুনের সামনে দুচোখে
বাধ ভাঙ্গা অশ্রুর প্লাবন নিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কমান্ডার বলেন, আমার নিকট পুত্রের শাহাদাত সম্পর্কে অবগত হবার পর

সেই পুত্রহারা মাতা দ্বিতীয়বার তার পুত্রের দেখা পাননি।

শহীদের বিস্ময়কর নড়াচড়া

মামুর বাবরাক ফরীদুনের ঘটনা শেষে
একই স্থানে সবার সামনে বলতে লাগলেন, ১৮ বছর বয়সী আনন্দ গুল লোগড়ের মুহাম্মাদ আগা জেলার কালামী শীখাক' নামক গ্রামে শাহাদাত বরণ করেন। আমরা তার লাশের ডানদিকে গিয়ে দাঁড়াই। সকলকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে সে তখন বামদিকে কাত হয়ে শোয়। অতঃপর তার বামদিকে দাঁড়াই। সঙ্গে সঙ্গে সে পুরো শরীর ডান দিকে ঘুরিয়ে নেয়। এবার আমরা তার শিয়রে দাঁড়াই, সে মাথা ঘুরিয়ে আমাদেরকে দেখার চেষ্টা করে। আমি তাকে শাহাদাতের খোশ কিসমতীর জন্য মোবারকবাদ জানাই, সাথে সাথে শহীদ আনন্দগুলের দেহ পূর্বের ন্যায় ডান দিকে কাত হয়ে যায়।

শহীদ কান্না জুড়ে দিলেন

ডাক্তার বাবরাক একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পাশাপাশি মুত্তাকী, পরহেযগার এবং উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি রোগীদের চিকিৎসার সময় এ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টির পূর্ণ অনুসরণ করতেন।

এই দরবেশ প্রকৃতির ব্যক্তি আরগুন রণাঙ্গনে শহীদ হন। শাহাদাতের পর তার দাফনে দুদিন বিলম্ব হয়।

তার অল্প বয়সী পুত্র পাথরের প্রতিমূর্তির ন্যায় বিষন্ন ও শোকার্ত মুখে পিতার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। উপস্থিত সবাই ভগ্নহৃদয়ে তার জন্য নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলো। চতুর্দিকে শোকের পরিবেশ বিরাজ করছিলো। স্বয়ং শহীদ ডাক্তার বাবরাকের নিষ্প্রাণ চোখ দিয়েও অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। শায়খ সায়্যাফের একজন কমান্ডার আখতার মুহাম্মাদ আমায় বললেন; দাফনের পূর্ব মুহূর্তের সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি যে, শহীদের চোখ বেয়ে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং তার বৃদ্ধা মা রুমাল দ্বারা সযত্নে চোখ মুছে দিচ্ছেন।

শহীদ মুজাহিদের তাকবীর ধ্বনি

কমান্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী বর্ণনা করেন; আমার নেতৃত্বে শের আলী নাম্মী এক পাকিস্তানী মুজাহিদ ছিলো। সে প্রায় সময়ই এই দোয়া করতো; “হে আল্লাহ! আমায় জীবিত অবস্থায় পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিওনা” শাহাদাত বরণের দিন যুদ্ধ ক্ষেত্রে রওয়ানার প্রাক্কালে সে নিজের ব্যবহৃত কাপড়চোপড় অন্যদের মাঝে বন্টন করে বলতে লাগলো; “ইনশাআল্লাহ আজ আমি শহীদ হয়ে যাবো।” যুদ্ধ শুরু হলে শের আলী রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্রমে লড়তে থাকে, হঠাৎ তার গুলী ফুরিয়ে যায়। তখন সে সর্বশক্তিদিয়ে রাশিয়ানদের উদ্দেশ্যে হুংকার ছুড়লো; “লেনিনের

সন্তানেরা! এখানে আঘাত করো” বলে সে নিজের মাথার দিকে ইংগিত করলো। খোদার ইচ্ছায় কিছুক্ষণ পর একটি গুলী তার মাথায় আঘাত হানে এবং সে ঘটনাস্থলে শহীদ হয়ে যায়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শের আলী ব্যতিক্রমী ধরণে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতো। শহীদ হবার দুইমাস পরেও আমি বিভিন্ন রণাঙ্গনে শের আলীর গলার সেই তাকবীরের প্রকম্পিত আওয়ায শুনেছি।

শহীদ হবার পরেও রহমাতুল্লাহর শরীর থেকে ঘাম বের হচ্ছিলো

মুহাম্মাদ ইউনুস বর্ণনা করেন; লোগড়ের মুজাহিদ রহমাতুল্লাহ শহীদ হয়। আমরা তাকে লোগড়ের ‘খোশ’ প্রান্ত থেকে ‘দুবান্দী' নামক স্থানে নিয়ে যাই। এই সফর চলাকালে তীব্র গরমের কারণে আমাদের ন্যায় তার শরীরও ঘেমে ভিজে যায়। তার দেহ নিঃসৃত ঘাম থেকে সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে।

শহীদ সায়্যেদ শাহ এবং রেশমী শাল

উমর হানীফ বর্ণনা করেন; আমাদের সাথে সায়্যেদ শাহ নাম্মী এক কুরআনে হাফেয মুজাহিদ ছিলেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী ও খালেস আবেদ প্রকৃতির এই নওজোয়ান রাতের বেলা স্বপ্নে যা দেখতেন দিনের বেলা প্রায়ই তা বাস্তবে ঘটতো, এছাড়া অসংখ্য কারামতপূর্ণ ঘটনা তার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিলো। সায়্যেদ শাহ শহীদ হলে আমরা যথা সময়ে তাকে দাফন করি।

দাফন কারীদের মধ্যে আমি (উমর হানীফ) নিজেও শামিল ছিলাম। কবরে নেমে আমি নিজহাতে তাকে মাটিতে রাখি। আড়াই বছর পর শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় তার কবর খনন করে দেখতে পাই লাশের উপর কালো রংয়ের রেশমী চাদর বিছানো রয়েছে। আমার সাথে কমান্ডার নুরুল হকও ছিলেন, আমরা ইতোপূর্বে কখনো এ ধরণের চাদর দেখিনি। চাদরে হাত লাগানোর পর তা থেকে এমন সুগন্ধ ভেসে আসে যা ভাষায় বর্ণনা করে বুঝানো সম্ভব নয়। শহীদের চেহারা পর্দা মুক্ত করে মনে হলো, তার চেহারা অবিকল পূর্বের মতোই আছে, শুধু দাড়ি কিছুটা লম্বা হয়েছে।

তাকে এই বাগানে খোঁজ করো

লোগড়ে হিযবে ইসলামীর সহকারী কমান্ডার ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আলী বর্ণনা করেন; রাশিয়ানরা আমাদের উপর হামলা চালায়, ট্যাংকের রাস্তায় বিস্ফোরণ বিছানোর জন্য আমরা মোল্লা আব্দুল কুদ্স এবং মোল্লা আব্দুলাহকে প্রেরণ করি। তারা নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, দুশমন দেখতে পেয়ে তাদের উপর গোলা বর্ষণ শুরু করে, গুলীর আঘাতে মোল্লা আব্দুল্লাহ শহীদ হন, মোল্লা আব্দুল কুদ্দুসের চোখ নষ্ট হয়ে যায়। আমরা মোল্লা আব্দুল্লাহর অনুসন্ধানে এক বাগানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখান থেকে চমৎকার ঘ্রাণ আমাদের অনুভূতিকে স্পর্শ করে। কমান্ডার জাফর বললেন; “তাকে বাগানে খোজ করো, সে এখানেই

আছে।” সুতরাং আমরা বাগানের ঝোপঝাড় পরিস্কার করে একস্থানে শহীদ আব্দুল্লাহকে প্রশান্ত মুখে চিরন্দ্রিায় শায়িত অবস্থায় আবিষ্কার করলাম।

ছয় মাস পর

মুহাম্মদ ইউনুস আমায় শুনিয়েছেন;
এক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। ১৩ দিন পরে আমরা তার লাশের সন্ধান পাই। মুখের দাড়ি এবং মাথার চুল সামান্য দীর্ঘ হওয়া ব্যতীত আমরা তার মাঝে অন্য কোন পরিবর্তন দেখতে পাইনি। তাকে দুবালীতে দাফন করা হলো। ৬ মাস পরে তার পরিবারের সদস্যগণ সেখানে আসেন সে বেঁচে আছে না শহীদ হয়ে গেছে জানার জন্য। লোকেরা তাদেরকে তার কবর দেখিয়ে দেয়, তারা কবর খনন করে তাকে ঠিক তেমন দেখতে পায়, যেমন সে দাফন করার সময় ছিলো।

শহীদের কপালের ঘাম থেকে মেশকের সুঘ্রাণ

কাবুলস্থ শরীয়া ফ্যাকাল্টিতে শিক্ষা সমাপনকারী মুহাম্মাদ খান বর্ণনা করেন; আমি শহীদ ঈদ মুহাম্মাদের কপাল থেকে ঘাম ঝরতে দেখি। গারদেযের যারমাত এলাকার মাদ্রাসা ছাত্র শহীদ মুহাম্মাদের কপালের ঘাম থেকে মেশকের সুঘ্রাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নিজের হাত সরিয়ে নাও

পাকতিয়ার সারমাত এলাকার রহমাতুল্লাহ ওয়াহীদ বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ মুহাম্মাদ কাসেম শহীদ হলেন, তখন তার হাত শরীরের যখমের উপর স্থাপন করা ছিলো। কিছুক্ষণ পরে তার বন্ধু মুহাম্মাদ সেখানে এসে যখমের উপর থেকে তার হাত সরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বুলন্দ আওয়াযে বলেন, “আমি তোমার বন্ধু, যখমের উপর থেকে হাত সরাতে দাও” একথা শেষে তার হাত সরাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট করতে হয়নি।

শহীদের দেহের দুই অংশ

ডেরা গাযীখানের যুলফিকার আলী পাকিস্তানের সেই সকল হাতেগোনা নওজোয়ানদের অন্যতম যিনি জিহাদোপলক্ষ্যে আফগানিস্তানের অধিকাংশ রণাঙ্গনে এক ডাক্তার ও মুজাহিদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এক শহীদ ও তার পিতার ঘটনা উল্লেখ পূর্বক বলেন; জুজান প্রদেশের সম্মানিত মা বাবার একমাত্র সন্তান মুজাহিদ আব্দুর রউফ একদিন আমার নিকটে এসে তার আঘাত প্রাপ্ত পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে বলে। আমি বললাম, এ তো সামান্য যখম, মুজাহিদ এরচেয়ে মারাত্মক যখমেও অনেক সময় ব্যান্ডেজ বাঁধেনা, তুমি কেমন মুজাহিদ হে? সে বলল, আমি স্বেচ্ছায় আপনার নিকট আসিনি, সাথীগণ জোরপূর্বক পাঠিয়েছে। দ্বিতীয় দিন সেই মুজাহিদ ক্যাম্প

পাহারাদারের দায়িত্ব পালন করছিলো। হঠাৎ কামানের গোলার আঘাতে তার শরীর দুটুকরো হয়ে যায়। তার পিতা আদরের সন্তানের লাশের সামনে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তোমার আমানত তোমার হাতেই তুলে দিলাম ।

শহীদের উষ্ণ পোষাক

ডেরা গাযী খানের ইকবাল হাশেমী বর্ণনা করেন ও খোস্তের বদর ব্রিগেড মারকাযে বেলাল নামক জনৈক মুজাহিদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। দুই প্রান্ত সেলাইবিহীন পাতলা এক ধরনের কাপড় তার শরীরে শোভা পাচ্ছিলো। ঠান্ডা মৌসুম ছিলো। আমি তাকে বললাম, ভাই ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, তুমি কোন গরম কাপড় পরে নাও। সে নির্বিকার ভঙ্গীতে বলল, “আমার ঠান্ডা লাগেনা। এই পোষাক আমার এক শহীদ বন্ধুর, যে এক বছর পূর্বে শহীদ হয়েছে। ময়লা হলে ধুয়ে আবার এটা পরে ফেলি বলে সে আমাকে পোষাকের ঘ্রাণ নিতে আহ্বান জানালো। নাকে স্পর্শ করা মাত্র পাতলা কাপড় থেকে মন কাড়া সুগন্ধ অনুভব করলাম। সে আবার বলল, “এই ঘ্রাণ আমার শহীদ বন্ধুর দেহ নিঃসৃত রক্তের, অসংখ্যবার ধোয়ার পরেও তা পূর্বের মতোই আছে।”

একমাস পুরানো তাজা লাশ

যাওর মারকায ১৯৮৬ সালের এপ্রিলের সংঘর্ষ শেষে দুশমনের দখলে চলে যায়। যদিও তারা চব্বিশ ঘন্টার বেশী মারকাযের উপর

নিজেদের দখলদারী কায়েম রাখতে পারেনি, কিন্তু যাবার পূর্বে পুরো মারকাযে বারুদের বিস্ফোরক ছড়িয়ে দিয়ে যায়। প্রায় এক মাস যাবত মুজাহিদগণ লুকানো বিস্ফোরক অপসারণ কাজে ব্যস্ত থাকেন। একস্থানে পাহাড়ের পাদদেশে জনৈক শহীদের লাশ পাওয়া যায়, একমাস অতিবাহিত হবার পরেও লাশ দেখে মনে হচ্ছিলো সে এই মাত্র শহীদ হয়েছে।

শহীদের লাশ থেকে বিস্ময়কর ও প্রাণকাড়া এক ধরণের সুগন্ধ প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে পড়ছিলো। মুজাহিদ ওয়ালী খান ১৯৮৬ সালের জুন মাসে আমাকে এই ঘটনা শুনান।

তারা ভাত এবং গোশত খাচ্ছিলো

কুন্দুযের আমান নামক স্থানের হাজী
জান মুহাম্মাদ গুল বর্ণনা করেন; “রাশিয়ান বোমারু বিমান আমাদের ৭ জনের এক ছোট্ট মুজাহিদ দলের উপর বোমা বর্ষণ শুরু করে। নির্বিচার বোমার আঘাতে আমি ব্যতীত বাকী মুজাহিদ খোদার রাহে প্রাণ বিলিয়ে দেয়। আমি শহীদদের লাশের মাঝে চুপচাপ পড়ে থাকি। আমি মাথা উঠিয়ে দেখতে পাই, আমার শহীদ সাথীগণ ভাত এবং গোশত খাচ্ছে।”

জান মুহাম্মাদ রক্তাক্ত কাপড়ে ঘরে ফিরলে তার মা তাকে কাপড় বদলে ফেলতে বলেন। উত্তরে জান মুহাম্মাদ উত্তর দিলেন; আমার একান্ত এরাদা এই কাপড়েই শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোট রাখবো।” পরের দিন জান

মুহাম্মাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়, সে রক্তমাখা কাপড়ে শাহাদাত বরণ করে নিজের সাথীদের দলে শামিল হয়।

শাহাদাতের সুখ স্বপ্ন

একবার আমি নিজে স্বপ্নে দেখলাম মহান রাব্বুল আলামীন আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করেছেন, পাশে বসে সাথীগণ অঝোর ধারায় অশ্রুপাত করছেন। শরীর থেকে আত্মা বের হবার সময় এমন সুখানুভূতি এবং প্রশান্তি লাভ করছিলাম যা এখনো অনুভূত হচ্ছে। আজ পর্যন্ত সেই প্রশান্তি আমার দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শাহাদাত এমন প্রশান্তিদায়ক এক অনুভূতি যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবেনা।

কবর থেকে বিস্ময়কর ও দুর্লভ সুগন্ধ

আরগুনের রণাঙ্গনে এক বাংলাদেশী মুজাহিদ শহীদ হয়। আমরা তাকে জঙ্গলে দাফন করি। দাফন করার পরপরই তার কবর থেকে বিস্ময় কর ও দুর্লভ সুগন্ধ বের হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সুঘ্রাণ অনুভব করে উপস্থিত সবাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। নিঃসন্দেহে এই সুগন্ধী আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্য হতে ছোট্ট নিদর্শন এবং শহীদদের জন্য অসংখ্য খোদায়ী নেয়ামত সমূহের সামান্য এক নেয়ামত মাত্র। এই ঘটনা বেলুচিস্থান, করাচী ও সীমান্ত প্রদেশের সাবেক ডি, আই, জি, হামীদুল্লাহ খান ১৯৯৪ সালের ২রা

সেপ্টেম্বের ইসলামাবাদে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বর্ণনা করেন।

জঙ্গলে লাশের সুঘ্রাণ

পাকতিয়া প্রদেশে হাজী ঘাটির নিকটবর্তী ফয়েয পোস্টের কমান্ডার আব্দুল কাদির ডুগারওয়ান বর্ণনা করেনঃ১৯৮৭ সালের ঈদুল ফিতরের দিন রাশিয়ান বাহিনী আচানক আরব মুজাহিদদের মারকায আল -জাদীদের উপর প্রচন্ড বেগে হামলা চালায়। মারকাযে হাতে গোনা কয়েকজন মুজাহিদ অবস্থান করছিলেন। কমান্ডার আব্দুর রহমান

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

উচ্চারণ করলে পাঁচ মুজাহিদ সামনে অগ্রসর হয়ে আধা ঘন্টা যাবত দুশমন বাহিনীর গতি রোধ করে রাখেন। ইত্যবসরে অন্যান্য মুজাহিদ তাদের মদদে উপস্থিত হন। যুদ্ধে মিশরের মুজাহিদ আব্দুল্লাহ শহীদ হন। বহু অনুসন্ধানের পরেও তার লাশ খুঁজে পেলাম না। কেউ কেউ বললেন , হয়তো দুশমন তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। এক মাস পর মারকাযের আশপাশে অচেনা কয়েক ব্যক্তির সন্দেহজনক চলাফেরা দেখে মুজাহিদগণ তাদেরকে কয়েদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে তারা স্বীকার করে যে , এখান থেকে কিছু দূরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় একস্থান থেকে প্রাণকাড়া এক ধরণের সুগন্ধ অনুভব করি। এমন ধরণের সুঘ্রাণ যা ইতোপূর্বে কখনো আমরা অনুভব করিনি। সুঘ্রাণের

উৎসস্থলের সন্ধানে চলতে চলতে একজায়গায় খোলামেলা অবস্থায় একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখি। সেই লাশ থেকে ঘ্রাণ নির্গত হয়ে সমগ্র জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ছিলো। একথা শুনে মুজাহিদগণ লাশের সন্ধানে বের হন। সামান্য সময় পরে তারাও সেই সুগন্ধের উৎস পেয়ে যান। তারা দেখেন, তাদের মিশরী সাথী শহীদ আব্দুল্লাহর লাশ পড়ে আছে, যে দুশমনের মোকাবেলায় সবার প্রথমে বের হয়েছিলো। একমাস পরেও লাশ দেখে মনে হলো এই মাত্র মারা গিয়েছে। জঙ্গলের কোন হিংস্র প্রাণী তার ধারে কাছেও অগ্রসর হয়নি। লাশের সুঘ্রাণে পুরো জঙ্গলের আকাশ বাতাস পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

পশু পাখীর মাধ্যমে মুজাহিদদের জন্য খোদায়ী মদদ

আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা ঘটনা আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি। সঙ্গের মুজাহিদ এবং উলামায়ে দ্বীন যারা আমার সাথে দ্বিতীয়বার জিহাদে আফগানে অংশ নেবার জন্য এখানে এসেছেন তারা প্রত্যেকে সাক্ষী যে, মনে হচ্ছিলো আফগানিস্তানের পাহাড় বাতাস, বৃক্ষ-লতা এবং পানি দুশমন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এ কোন কবি- সাহিত্যিকের বাগাড়ম্বরতা নয়, বক্তার সুরেলা ওয়ায নয়।আকাশচারী পাখী আফগান জিহাদে মুজাহিদদের মদদে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং বিষাক্ত পাহাড়ী বিচ্ছুর দংশনে শত শত রুশ সেনা জাহান্নামের পথ ধরেছে। অথচ তেরো বছরের

প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চলাকালে সেই ভয়ংকর বিচ্ছুর দংশনে একজন মুজাহিদ সামান্য আহতও হয়নি।

আরগুনের নিকটবর্তী পাহাড়ের মোর্চায় স্রেফ ৪ জন মুজাহিদ অবস্থান করছিলেন, রাতের আঁধারে ৫০ জন রুশ কমান্ডো নিঃশব্দে তাদের দিকে অগ্রসর হয়। মুজাহিদগণ তাদের ব্যপারে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলেন। রাশিয়ানরা পাহাড়ে উঠামাত্র ঝাঁকে ঝাঁকে বিচ্ছুর কবলে পড়ে। কয়েকজন ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায়, অবশিষ্ট সৈন্যগণ দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ভয়ার্ত আর্তনাদ শুরু করে। চিৎকার শুনে মুজাহিদগণ তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন। খোদায়ী মদদ বিমান, ট্যাংক, কামান, রাইফেলের মুখাপেক্ষী নয়, তাঁর মদদ বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু, পাখী, বাতাস প্রভৃতির রুপ ধরে মুজাহিদের সহায়তা করে।

বোমারু বিমান এবং কুদরতী বিমান

ঘটনা এক
বিখ্যাত কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী যিনি প্রতিমূহুর্তে দুশমনের মোকাবেলায় শহীদী মৃত্যুর পেছনে ছুটেছেন, মৃত্যু তার কাছ থেকে দূরে পলায়ন করেছে। তিনি বর্ণনা করেন; “আমি প্রায় সময়ে দেখেছি যখনি দুশমনের বোমারু বিমান আমাদের উপর হামলার উদ্দেশ্যে এসেছে, সাথে সাথে অগণিত নাম না জানা পাখী মাটি এবং বিমানের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে অবস্থান নিয়েছে। ফলে জঙ্গী বিমানের নিক্ষিপ্ত

বোমা, মেশিনগানের গুলী মুজাহিদদের খুব বেশী ক্ষতি করতে পারেনি। কারণ তাদের নিক্ষিপ্ত গোলা বারুদ সঠিক নিশানায় পৌছতে ব্যর্থ হতো।

ঘটনা দুই
কান্টার এলাকার সুবিখ্যাত মুজাহিদ হাজী গুল মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন; আমি কমপক্ষে দশ বার মিগ বোমারু বিমানের নীচে পাখী উড়তে দেখেছি, যেগুলো অত্যাধুনিক মিগের চেয়েও অধিক দ্রুত গতি সম্পন্ন, অথচ মিগ জঙ্গী বিমানের গতি শব্দের চেয়ে তিনগুণ দ্রুত।

ঘটনা তিন
সুবিজ্ঞ আলিমে দ্বীন এবং বিশ্ব বিখ্যাত মুজাহিদ কমান্ডার মাওঃ আরসালান রহমানী বর্ণনা করেন; বোমারু বিমান আমাদের দিকে আসার পূর্বেই আমরা সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে যেতাম। তা এই ভাবে যে, আচানক আকাশে নাম না জানা এক ধরণের পাখী আমাদের অবস্থানের উপর ঘুরে বিচিত্র শব্দ করতে থাকতো। পাখী দেখেই আমরা দুশমন বিমানের আগমন সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যেতাম।

ঘটনা চার
কুরবান মুহাম্মাদ নাম্নী মুজাহিদ কমান্ডার বলেন; একবার আমরা তিন শত মুজাহিদ সম্পূর্ণ খোলা এক পাহাড়ী উপত্যকায় অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ আমাদের মাথার উপর বোমারু বিমান এবং পাখী এক সাথে এসে হাযির হয়। দুশমন জঙ্গী বিমানের প্রচন্ড বোমা বর্ষণের ফলে আমরা প্রত্যেকে মনে করতে

থাকি যে, হয়তো আমি একা বেঁচে আছি এবং অন্য সকল মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছে। কিন্তু খোদার কুদরতে বোমারু বিমান চলে যাবার পরে দেখতে পাই, আমাদের মধ্য হতে একজনও সামান্যতম যখমী হয়নি।

ঘটনা পাঁচ
মাওলানা আব্দুর রহীম বর্ণনা করেন;
আমি বোমারু বিমানের নীচে পাখী উড়তে দেখলেই সহযোদ্ধাদের এই বলে সুসংবাদ দিতাম যে, আল্লাহর মদদ পৌছে গিয়েছে। আল্লামা আব্দুল্লাহ আযযাম লিখেন, কতিপয় মুজাহিদ আমায় বলেছেন যে, আমরা জঙ্গী বিমানের সাথে পাখী দেখামাত্র আন্দায করে নিতাম আল্লাহর মদদ আমাদের সাথেই আছে।

এক মুজাহিদ বলেন, ছোট ছোট বাচ্চারাও বিমান দেখে বুঝতে পারতো যে, কোন বিমান বোমা বর্ষণ করবে আর কোন বিমান করবেনা। তা এইভাবে যে, তারা বিমানের পাশাপাশি পাখী আসতে দেখলে বুঝে নিতো এই বিমান বোমা বর্ষণ করবে এবং কালক্ষেপণ না করে মুজাহিদদের পাশাপাশি নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটতো। আর বিমানের পূর্বে পাখী না আসলে তারা বুঝতো যে, এই বিমান বোমা বর্ষণ করবেনা এবং তারা নির্বিকার ভাবে খেলাধূলায় মগ্ন থাকতো।

ঘটনা ছয়
রাইদ আব্দুল হামীদ বর্ণনা করেন; প্রতিদিন তিনবার মুজাহিদদের উপর বি, এম-২১, বি, এম-১৩ এবং জঙ্গী বিমানের সাহায্যে হামলা পরিচালনা করা হচ্ছিলো। একবার ফায়ার করলে ৫২টি মিসাইল এবং রকেট ছুটে আসছিলো, জঙ্গী বিমান আধা টন ওযনের বোমা

নিক্ষেপ করছিলো। একটি বোমা বিস্ফোরিত হবার ফলে মাটিতে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়, আমি নিজে ইঞ্চি টেপ দিয়ে পরিমাপ করে দেখেছি তা আট মিটার গভীর এবং ৪৬ মিটার প্রশস্ত ছিলো।

রাইদ আব্দুল হামীদ বলেন, বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র এবং নিক্ষিপ্ত গোলা বারুদের অধিকাংশ মুজাহিদদের নিকট এসে অবিস্ফোরিত অবস্থায় পড়ে থাকতো। যদি সেগুলো বিস্ফোরিত হতো তাহলে এক সপ্তাহও মুজাহিদদের পক্ষে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা অসম্ভব ছিলো ।

ঘটনা সাত
সীদান এলাকার নেতৃস্থানীয় মুজাহিদ মৌলবী আলীম বর্ণনা করেন, একবার আমাদের এ্যান্টি এয়ার গান (বিমান বিধ্বংসী মেশিনগান) বিনষ্ট হয়ে পড়ে। আমরা আল্লাহর দরবারে বোমারু বিমানের হামলা থেকে নিরাপত্তা কামনা করে দোয়া করি। দোয়া শেষ না হতেই আচমকা ঘনকালো মেঘ এসে আমাদের উপত্যকার পুরো এলাকা অন্ধকার করে দেয়, এভাবেই মহান রব আমাদেরকে দুশমনের জঙ্গী বিমানের অসহায় নিশানা হবার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন।

পাখী কর্তৃক বোমারু বিমান আক্রান্ত

কুরবান মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন; দুশমনের মুহুর্মুহু আক্রমণের মুখে তিনি আকাশে অদ্ভুত কিছু পাখী দেখতে পান। তার ভাষায়; বোমারু বিমান তীব্রগতিতে বোমা

বর্ষণ শুরু করে, নীচে তিনশত মুজাহিদ খোলা ময়দানে থাকা সত্বেও তাদের কারো দেহে সামান্য বালুকণার ছিটাও লাগেনি। আঁকে ঝকে পাখীর কারণে বোমাগুলো কোন দিকে গায়েব হয়ে যায় তাও আমরা বুঝতে পারিনি।

মাওলানা আরসালান রহমানী বর্ণনা করেন; আমরা ‘শাতুরী' নামক এলাকায় ২৫জন মুজাহিদ অবস্থান করছিলাম। আচমকা ২ হাজার রুশ সেনা আমাদের উপর হামলা চালায়। আমাদের মাঝে চার ঘন্টা ব্যাপী ঘোরতর লড়াই অব্যাহত থাকে, এরপর রাশিয়ানরা পিছু হটে যায়। তাদের ৭০ জন কতল এবং ১২৬ জন আমাদের হাতে কয়েদ হয়। বন্দীদের নিকট জানতে চাই, কি কারণে তোমরা পরাজয় স্বীকার করলে? উত্তরে তারা বলে; মার্কিন ট্যাংক এবং কামান চতুর্দিক থেকে আমাদের উপর গোলাবারুদ নিক্ষেপ করছিলো, গোলার তীব্রতায় বাধ্য হয়ে আমরা পরাজয় মেনে নিই । মাওলানা আরসালান বলেন, সেই যুদ্ধে আমাদের সাথে কোন ট্যাংক অথবা কামান ছিলো না। প্রত্যেকের হাতে কালাশনিকভ রাইফেল ছিলো এবং আমরা বিরামহীন গতিতে তার সাহায্যে গুলী বর্ষণ করছিলাম।

বিচ্ছু মুজাহিদদের দংশন করেনি

উমর হানীফ বর্ণনা করেন; যুদ্ধের বছর গুলোতে অনেক রাতে আমাদের বিছানায় বিষাক্ত বড় বড় পাহাড়ী বিচ্ছু দেখতে পেতাম। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এসময় কোন বিচ্ছুর দংশনে একজন মুজাহিদের দেহে

সামান্য চুলকানী হয়েছে এমন অভিযোগ আমরা শুনিনি।

খোদার মদদ

যেখানে আজ আমরা নিশ্চয়তার সাথে আযান দিয়ে নামায আদায় করছি, অস্ত্র উঠিয়ে চলাফেরা করছি এই ময়দানে যখন যুদ্ধ চলছিলো, সেখানে দুশমন বাহিনীর বুলেট প্রুফ দুর্ধর্ষ কমান্ডো বাহিনী নেমে এসেছিলো। তারা যখন হামলা চালায় তখন আমাদের মহান দিক নির্দেশক জালালুদ্দীন হক্কানী ও কমান্ডার ফযলুর রহমান খলীল উপস্থিত ছিলেন। তীব্র সংঘর্ষ শেষে দুশমন বাহিনী ৬শ'র অধিক সাথীর লাশ ফেলে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। এখনো পর্যন্ত ইয়াবর’ এর যমীনে রাশিয়ানদের পঁচা হাড্ডিকণা খুঁজে পাওয়া যাবে।

সেই যুদ্ধে শরীক এক মুজাহিদ বলেন, হঠাৎ গুলীবর্ষণ শুরু হলে আমি আত্মরক্ষার তাগিদে পাহাড়ী টিলা থেকে নীচে ঝাঁপ দিই। বিশ/বাইশ হাত নীচে এক পাহাড়ী গর্তের ভেতর পতিত হয়ে মনে হলো আমি কোন নরম গদির উপর পড়েছি। পায়ের নীচে তাকিয়ে দেখলাম বিশাল এক অজগরের উপর আমি নিপতিত হয়েছি। বিশালাকৃতির অজগর দেখে ভয়ে আমি জড়ো সড়ো হয়ে গেলাম । উপরে দুশমনের বোমা বর্ষণ, আর নীচে এই জীবিত সাপ। অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আমি নড়াচড়াও ভুলে গেলাম। এই ভেবে সান্ত্বনা খুঁজছিলাম যে, দুশমন তো কাফের, হয়তো আল্লাহ এই সাপের মুখে লাগাম লাগিয়ে দিবেন, ফলে সে আমার কোন ক্ষতি

করতে পারবে না। এভাবে প্রায় দু'ঘন্টা সাপের উপর নিথর পড়ে রইলাম, বিস্ময়ের ব্যাপার এসময়ে অজগর সাপটি কোনরকম নড়াচড়া কিংবা আমার উপর হামলার চেষ্টা করেনি।

পৃথিবীর সকল কিছুর উপর মহান রাব্বুল আলামীনের কর্তৃত্ব বিরাজমান। এই সংঘর্ষে ৫৫০টির অধিক স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র মুজাহিদদের লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু মুজাহিদগণ সামান্যতম ক্ষতির সম্মুখীন হননি। তাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভীতির সঞ্চার হয়নি, আল্লাহ তায়ালা বড় বড় পাহাড়ের মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন। (মাওঃ মাসুদ আযহারের কিতাব হতে সংগৃহীত)

মুজাহিদদের জন্য পাখীর সাহায্য

একথা যে কোন মুজাহিদের নিকট জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে যে, জঙ্গী বিমান মুজাহিদদের কাছাকাছি আসার পূর্বেই ঝাকে ঝাকে পাখী তাদের অবস্থানের উপরে এসে হাযির হতো, যার মাধ্যমে মুজাহিদগণ দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। জঙ্গী বিমানগুলো মাটির খুব কাছাকাছি নেমে আসলে আসমানী পাখীগুলোও তাদের সাথে সাথে নীচে নেমে আসতো, উল্লেখ্য, উচ্চ প্রযুক্তিতে তৈরী যুদ্ধ বিমানের গতি শব্দের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে থাকে। মুজাহিদগণ এবিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন যে, যখন বিমানের নীচে পাখী উদয় হতো তখন ক্ষতির পরিমাণও খুব কম হতো বরং ক্ষতি হতোইনা বলা চলে।

মাওলানা আরসালান বলেন, অনেক বার আমি পাখীর ঝাঁক যুদ্ধ বিমানের নীচে দেখেছি। মুজাহিদ শমশের এবং মৌলবী আব্দুল হাদীদও অসংখ্যবার এমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

আব্দুল করীম আব্দুর রহীম বর্ণনা করেন, এবার দুটি ট্যাংক খুব নিকটে পৌছে আমাদের উপর গুলী বর্ষণ শুরু করে। দুশমন আমার কে জীবিত গ্রেফতার করতে চাচ্ছিলো। এই মুসীবত থেকে বাঁচার জন্য আমরা আল্লাহর মদদ কামনা করলাম। আচমকা গাঢ় কালোমেঘ পুরো প্রকৃতিকে ঢেকে দেয়, আমরা ট্যাংকের চোখ ফাকি দিয়ে নিরাপদে সটকে পড়ি।

ইদুর এবং পানি লুকানো বিস্ফোরক পরিষ্কার করলো

পূর্বোক্ত ঘটনার তুলনায় অবিশ্বাস্য এবং ঈমান দ্বীপ্ত ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে পানশিরের যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

১৯৮৩ সালের শেষ দিকে একদল রাশিয়ান
ফৌজ পানশির উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাহাড়ের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। মুজাহিদগণ অল্প সময়ের ভেতর তাদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়। তারা স্থান ত্যাগের পূর্বে চিরাচরিত অভ্যানুযায়ী উপত্যকার সর্বত্র ছোট ছোট মাইন এবং বিস্ফোরক দ্রব্য বিছিয়ে যায়। বারুদের বিস্ফোরক গুলো কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য সেগুলোর উপরে প্লাস্টিকের আবরণ লাগানো হয়, যেন পানি লেগে সেগুলো অকেজো না হয়ে যায়। কয়েকজন মুজাহিদ

বিস্ফোরকের আঘাতে মারাত্মকভাবে যখমী হন। শীতের তীব্রতার কারণে মুজাহিদগণ বিস্ফোরক অপসারণ করতেও ব্যর্থ হন। ১৯৮৪ সালের বসন্ত মৌসুমে তারা দ্বিতীয়বার বিস্ফোরক অপসারণের কাজে হাত দিয়ে হয়রাণ হয়ে দেখেন যে, সকল বিস্ফোরক অকেজো হয়ে পড়েছে। রাশিয়ানদের এই অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ব্যর্থ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা পাহাড়ী ইদুরদের ব্যবহার করেন। পাহাড়ী ইদুরগুলো তাদের ধারালো দাঁতের সাহায্যে, সকল বিস্ফোরকের প্লাস্টিক আবরণ খুলে ফেলে তার কার্যকারিতা বিনষ্ট করে দেয়, অতঃপর বৃষ্টির পানি বারুদকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। আফগান মুজাহিদদের এই ঘটনা মক্কার আবাবীল, নমরুদের জীবন বিনাশী মশা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছূর গুহায় মাকড়সার ঘটনা মনে করিয়ে দেয়।

গায়েবী মদদ

আল-মারকাযুল ইসলামী পেশোয়ারের ইনচার্জ মুহাম্মাদ কাসেম বর্ণনা করেন যে, একবার লোগড়ের উপকণ্ঠে ৭জন মুজাহিদ (৩ পাকিস্তানী, ২ আফগানী, ২ আরব) দুশমন পোস্টের উপর হামলা করেন। পোস্টে প্রায় শখানেক কমিউনিস্ট সেনা উপস্থিত ছিলো। উভয় পক্ষ থেকে অবিরাম গোলা বর্ষণ চলছিলো। আচানক মুজাহিদদের ওয়ারলেসে দুশমনের ওয়ারলেস লাইন যুক্ত হলো। ওয়ারলেসের মাধ্যমে মুজাহিদগণ দুশমনের প্লান পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি

লাভ করলেন। দুশমনের পারস্পরিক কথোপকথন নিম্ন রূপ ছিলো।

হেড কোয়ার্টারঃ“মুজাহিদগণ সংখ্যায় খুব অল্প, তাদের বিরুদ্ধে আরো তীব্র বেগে হামলা চালাও।”

পোস্টের বক্তাঃ “মুজাহিদদের সংখ্যা প্রচুর, আমরা তাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছিনা।”

হেড কোয়ার্টারঃ“সাথীদের নিয়ে ওদের প্রতিহত করো, অনতিবিলম্বে তোমাদের মদদে পাঁচশত তাজাদম সিপাহী পাঠাচ্ছি।” পোস্টের অপারেটরঃ “মুজাহিদদের মাঝে এক হাজারের অধিক পাকিস্তানী কমান্ডো বাহিনী রয়েছে, আর এক মিনিটও তাদের মোকাবেলা করতে পারছিনা।”

দুশমন বাহিনীর এই কথোপকথন শোনার পর মুজাহিদদের মনোবল শতগুণে বৃদ্ধি পেলো, তারা বুঝলেন আল্লাহর গায়েবী মদদ তাদের জন্য রয়েছে। তারা দ্রুত নিজেদের মোর্চা থেকে বাহিরে এসে দুশমন অবস্থান লক্ষ্য করে রকেট লাঞ্চার ছুড়তে লাগলেন। এই আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাশিয়ানরা মুহূর্তের মাঝে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালানোর রাস্তা ধরে। এভাবে কোন রকম ক্ষতি ব্যতীত মুজাহিদগণ দুশমন পোস্ট দখল করে নেন।

বিষাক্ত বিচ্ছুর স্পর্শে ৬০ রুশ সেনার মৃত্যু

লোগড়ে মুজাহিদ গ্রুপের সহকারী আমীর মুহাম্মাদ ইউসুফ বলেন, আমাদের এক সহযোদ্ধা বদর মুহাম্মাদ গুলের ভূপাতিত শরীরের উপর দিয়ে দুশমনের ট্যাংক অতিবাহিত হলেও সে বিন্দুমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয়নি।

মুজাহিদ আব্দুস সামাদ এবং মাহবুব উল্লাহ বর্ণনা করেন যে, কমিউনিস্ট বাহিনী কুন্দুযের এক বাড়িতে অস্থায়ী আবাস গেড়ে বসে। হঠাৎ বড় বড় কিছু বিচ্ছু তাদের উপর আক্রমণ করে। এই অভাবনীয় আক্রমণে ঘটনাস্থলেই ৬০জন রুশ সেনা প্রাণ হারায়, অন্যরা প্রাণ ভয়ে কালবিলম্ব না করে স্থান ত্যাগ করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আফগান জিহাদ চলাকালে কোথাও সাপ অথবা বিচ্ছুর দংশনে একজন মুজাহিদও সামান্য যখমী বা অসুস্থ হবার সংবাদ পাওয়া যায়নি।

কুকুরের ওয়াফাদারী

মুজাহিদ আব্দুল জব্বার বর্ণনা করেন
যে, আমাদের ‘মারী’ নামক গ্রামে এক নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট বাস করতো। তার নিকট ভয়ানক হিংস্র প্রকৃতির একটি কুকুর ছিলো, যে তার দেহরক্ষীর দায়িত্ব পালন করতো।

একদিন আমি এবং ফয়জানুল্লাহ সেই কমিউনিস্টকে হত্যার ইচ্ছায় তার ঘরে প্রবেশ করি। আমাদেরকে দেখা সত্বেও কুকুরটি স্বভাব বিরুদ্ধভাবে বিস্ময়কর নীরবতা পালন করলো। ফয়জান কমিউনিস্টকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে চোখের পলকে নিজ মটর সাইকেলে সওয়ার হয়ে মারকাযের পথ ধরে। বিশালাকৃতির কুকুরটি ক্ষিপ্র গতিতে মটর সাইকেলের অনুগমন শুরু করে, ফয়জান ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকবার শূন্যে ফায়ার করা সত্ত্বেও অবিচল কুকুর তার পেছনে চলতে থাকে। পরবর্তীতে কুকুরটি ফয়জানের একান্ত অনুগত হিসেবে সর্বত্র ছায়ার ন্যায় তার সাথে সাথে হাযির হতো।

জাজীর যুদ্ধে অভাবনীয় ভাবে মুজাহিদদের নিরাপত্তা লাভ

মুআল্লিফ বাসাইর বর্ণনা করেন; জাজীর রণাঙ্গনে আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, যখন আমাদের অবস্থানের উপর দুশমনের বোমারু বিমানগুলো প্রচন্ড বেগে হামলা চালালো এবং বোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা এক গাছ ছেড়ে আরেক গাছের নীচে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটলাম, ঠিক তখন মুজাহিদ কমান্ডারদের প্রধানতম দিক নির্দেশক মুহতারাম সায়্যাফ আকাশের দিকে ইশারা করে আমায় বললেন, ঐ যে দেখো, বোমারু বিমানের নীচে পাখীর দল, খোদার মদদ চলে এসেছে আর দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই।

দ্বিতীয় দিন আমি আকাশে বিচরণ কারী জঙ্গী বিমানের তলদেশে কালো বর্ণের কিছু

দেখতে পেয়ে উচ্চ আওয়াযে সাথীদের উদ্দেশ্যে বললাম, সবাই নিজ নিজ জান বাঁচানোর চেষ্টা করো, কারণ দুশমন বোমা ছুড়ে মারছে। কালো জাতীয় বস্তুকে আমি বোমা ভেবেছিলাম। সাথীরা আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়ে বললেন, ওগুলো বোমা নয় বরং পাখীর ঝাঁক, যেগুলো যেকোন আক্রমণের পূর্বে দুশমন বিমানের নীচে উড়তে থাকে। রাশিয়ান জঙ্গী বিমানগুলো অদ্ভুত ধরণের এক বোমা ছুড়েমারে যা বিস্ফোরণের আগমূহুর্তে ক্ষুদ্রাকৃতির হাজারো বোমায় রূপান্তর হয়। এবং একটন ওযনের বোমা নিক্ষেপ করে। যার বিস্ফোরণে বিশাল বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়। তারা টাইম বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্রও নিক্ষেপ করে, সেই সাথে মর্টার এবং মেশিন গানের গুলীও ছুড়তে থাকে। এছাড়া নিকট এবং দূরের সকল পাহাড়ে সন্তর্পণে বিশেষ কমান্ডো বাহিনী নামিয়ে দেয়। সেই আহযাবের যুদ্ধের ঘটনা মনে পড়লো। কুরআনের ভাষায়;“ যখন দুশমনের ফৌজ উপর এবং নীচ থেকে তোমাদের উপর হামলা চালায়, তোমাদের চোখে ভীতি ভর করে, হৃদপিন্ড পান্ডুর হয়ে যায়, তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে বিভিন্ন অবান্তর ধারণা পোষণ করতে থাকো, সেই মুহূর্তে ঈমানদারদের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছিলো এবং কঠিন ধরণের কম্পনের সৃষ্টি করা হয়েছিলো।” (আয়াত এবং তরজমা দ্রষ্টব্য)

এই বিপদ সংকুল মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক এক তীব্র তুফান প্রবাহিত হতে লাগলো। যার শীতলতার ব্যাপারে মুজাহিদগণ বলেন, আফগানিস্তানে শৈত্য

প্রবাহ শুরু হয় তখন মাটিতে কয়েক মিটার উঁচু বরফ জমে যায় এবং হাড় কাঁপানো বাতাস বয়ে যায়। এই বাতাস সেই শৈত্য প্রবাহের তুলনায় অনেক বেশী প্রচন্ডতর ছিলো। তার প্রতিক্রিয়ায় পেশোয়ারেও মারাত্মক ঝড় দেখা দিলো। বড় বড় গাছ সমূলে উপড়ে পড়লো। সেই বাতাসের প্রচন্ডতায় দুশমনের প্রবল হামলা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। কুরআনের ভাষায়ঃ “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তোমাদের উপর কৃত করুণা স্মরণ করো। যখন তোমাদের উপর বিশাল বাহিনী হামলে পড়লো। অতঃপর আমি তাদের সামনে অন্ধকার বিছিয়ে দিলাম, আর এমন সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করলাম যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি।

সাপ, বিচ্ছু আফগান জিহাদের আরেক কারামত

কয়েক জন মুজাহিদের মুখে শুনেছি যে, আফগান জিহাদ শুরু হবার পর সাপ, বিচ্ছ ও বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী কখনো মুজাহিদদের সামান্যতম ক্ষতি করেনি যদিও দিন ও রাতের অধিকাংশ সময় মুজাহিদগণ পাহাড় ও বনে বাদারে সময় কাটাতেন। অথচ অসংখ্য দুশমন সেনা সেগুলোর আক্রমণে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাওঃ সাইফুল্লাহ আখতার বর্ণনা করেন; ১৯৮৩ সালে খোস্তের রণাঙ্গনে আমি এক পাহাড়ে বিমান বিধ্বংসী কামান নিয়ে অবস্থান করছিলাম। দুশমনের অনবরত আক্রমণের মুখে ঘুমানোর মওকা তেমন মিলতো না বলা চলে। এক রাতে নিদ্রার উদ্দেশ্যে শয্যা গ্রহণের পর পায়ের

আঙ্গুলে সামান্য চুলকানী অনুভূত হলো, মনে হলো নরম কিছু আমার পদযুগল স্পর্শ করেছে।
কাটার ন্যায় কিছুর উপস্থিতি টের পেয়ে আমি দ্রুত টর্চ জেলে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটি পাহাড়ী বিচ্ছু নেমে যাচ্ছে। পাথর চাপা দিয়ে বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললাম। পায়ের যে স্থানে বিচ্ছু লেগেছিলো সেখানে সামান্য ব্যথা অনুভব হলো। ভাবলাম এবার হয়তো তার বিষ পুরো দেহে ছড়িয়ে পড়বে, একাকী থাকার ফলে অজানা ভীতি পুরো মনকে আচ্ছন্ন করলো। পরিশেষে আল্লাহর রহমত কামনা করে শুয়ে পড়লাম, কিছুক্ষণের ভেতর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম। সকালে বিনিদ্র হয়ে সেখানে সামান্য কালো দাগ ব্যতীত কোন ব্যথার অস্তিত্ব টের পেলামনা।

এরচেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা শুনিয়েছেন তার ঘনিষ্ট বন্ধু মাওঃ আব্দুস সামাদ সায়্যাল। এই সফরের শেষ ভাগে তার সাথে আমার মোলাকাতে তিনি এই ঘটনা আমায় শুনিয়েছেন।

তিনি বলেন; ১৯৮৬ সালে আরগুনের নিকটবর্তী ‘খারগুশ’ এলাকায় আমাদের মারকাযের অবস্থান। অভিযান শেষে এক রাতে মারকায়ে ফিরে ক্লান্ত শরীর নিয়ে দ্রুত স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকে গাঢ় ঘুমে ঢলে পড়ি। শরীরের বিভিন্ন স্থানে চুলকানী শুরু হলেও প্রগাঢ় নিদ্রার কারণে এদিকে কোন মনোযাগ দিতে পারিনি। ঘুমের ভেতরেই শরীর চুলকিয়ে বারবার পার্শ্ব বদল করেছি। সকালে বিনিদ্র হয়ে চুলকানোর উৎস অনুসন্ধানের জন্য স্লিপিং ব্যাগ খুলতেই বড় একটি বিচ্ছু বেরিয়ে দ্রুত পালানো

শুরু করলো। রাতভর স্লিপিং ব্যাগে আমার সাথে বন্দী থাকা সত্ত্বেও বিচ্ছুটি আমাকে দংশন করেনি, কিন্তু আমি তাকে মেরে ফেললাম। এঘটনা শুনে আমি খুব বেশী বিস্মিত হইনি, কারণ এখানে এধরণের অসংখ্য ঘটনা জিহাদের প্রথমভাগ থেকেই ঘটে চলেছে। আল্লাহর মদদের এরচেয়েও বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রতিনিয়ত আফগানিস্তানে প্রকাশ পেয়েছে।

আব্দুস সামাদ সায়্যালের দ্বিতীয় ঘটনা

গারদেয এলাকায় দুশমন ছাউনীর নিকটে মুজাহিদদের অস্থায়ী কেন্দ্র ছিলো। মারকাযের হেফাযতের জন্য তারা পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে পর্যবেক্ষণ চৌকী স্থাপন করেন, যেখানে ৪ জন মুজাহিদ সর্বক্ষণ সশস্ত্র অবস্থায় প্রহরায় নিযুক্ত থাকতেন। সুরক্ষিত এই মোর্চায় বসে মারকাযের বিরুদ্ধে পরিচালিত যে কোন পদক্ষেপ প্রতিহত করার ব্যাপারে তারা যথার্থ ভূমিকা পালন করতেন। দুশমন এই মোর্চা কব্জা করার জন্য নানা ধরণের ফন্দি ফিকির আটতে থাকে।

একরাতে মোর্চার পাহারাদার মুজাহিদগণ পাহাড়ী যমীনে মিলিটারী বুটের আওয়ায শুনতে পান। প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধির জন্য তারা নীচে নামা মাত্র তাদের কানে অনেক মানুষের আর্তচিঙ্কার এবং পলায়নের আওয়ায় ভেসে আসে। দ্রুতপায়ে সেখানে পৌছে টর্চের আলোয় এক বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। প্রায় ১৫ জন

কমিউনিস্ট সেনা পাথুরে যমীনে পড়ে আছে, যাদের অধিকাংশ মারা গিয়েছে, অবশিষ্ট দুয়েকজন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। পাহারাদার মুজাহিদগণ মারকায থেকে তাদের বাকী সাথীদের খবর দিয়ে ঘটনাস্থলে নিয়ে এলেন। অনুসন্ধিৎসু চোখে চতুর্দিকে তাকিয়ে তারা দেখলেন মৃতদের দেহে বড় বড় পাহাড়ী বিষধর বিচ্ছু লেগে আছে, মুজাহিদদের দেখামাত্র সেগুলো পাথরের গর্তে ঢুকে পড়লো। তারা বুঝলেন যে, আল্লাহ তায়ালা ঐ চার মুজাহিদ এবং তাদের মোর্চা হেফাযতের জন্য বিচ্ছুর মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। মোর্চা অবরোধের বদমতলবে যে ফৌজ পাহাড়ে এসেছিলো তাদের মধ্য হতে ১৫ জনকে বিচ্ছু বাহিনী বিষাক্ত হুলের মাধ্যমে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজাহিদদের হেফাযত

মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন: “আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু আসতে পারে না, প্রত্যেকের জন্য একটি নির্ধারিত সময়সীমা রয়েছে।”

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, “আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ সংরক্ষক, তিনি সর্বাধিক দয়ালু।”

মুহাম্মাদ মঙ্গল গনী বর্ণনা করেন; আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, আখতার মুহাম্মাদ নাম্মী জনৈক মুজাহিদের ভূপাতিত শরীরের উপর দিয়ে ট্যাংক অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তার শরীরের কোথাও সামান্য যখম

হয়নি। ট্যাংকের চালক তাকে সুস্থ দেহে জীবিত দেখে পুনরায় ট্যাংকের মুখ ঘুরিয়ে তার উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। তথাপি আল্লাহর অসীম কুদরতে আখতার মুহাম্মাদ প্রাণে বেঁচে থাকে। এবার তারা তাকে অন্য দুই মুজাহিদের সাথে বেঁধে তাদেরকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির ন্যায় গুলী বর্ষণ করে। বাকী দুই মুজাহিদ তৎক্ষণাত শহীদ হলেও আখতার মুহাম্মাদ তখনও আহত অবস্থায় বেঁচে যায়। রাশিয়ানরা মৃত ভেবে তাদেরকে ওখানে ফেলে চলে যায়, এবার আহত আখতার মুহাম্মাদ প্রাণান্ত চেষ্টায় মারকাযে ফিরে আসে এবং আল্লাহর রহমতে আফগান জিহাদের শেষ দিন পর্যন্ত রুশ হায়েনাদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখে।

কারমাল পানিও পাবে না

মুহাম্মাদ সিদ্দীক মদীনা ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তিনি 'চকোরী' এবং কাবুলের উপকণ্ঠে অবস্থিত মুজাহিদ দলের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন, তার নেতৃত্বে কাবুলে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালিত হয়। বারবাক কারমালের প্রেসিডেন্ট ভবন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সমরাস্ত্র বিভাগ, আফগান ও রুশ সামরিক কর্মকর্তাদের আবাসিক এলাকা অসংখ্যবার তার দলের টার্গেটে পরিণত হয়। মুহাম্মাদ সিদ্দীক ‘চকোরী’ গাঁয়ের বাসিন্দা ছিলেন। বারবাক কারমাল চকোরীর পার্শ্ববর্তী কামারী’র সন্তান। উভয় গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে

চলা ছোট্ট নদীর উপর স্থাপিত পুলটি তাদের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করছিলো। মুহাম্মাদ সিদ্দীক কারমালের উদ্দেশ্যে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলে ছিলেন, চকোরীর পবিত্র যমীন এবং তার জঙ্গলে পা রাখার দুঃসাহস কোরনা। একবার তিনি কামারী গ্রামের দিকে প্রবাহিত পানির গতিপথ বন্ধ করে দেন। কারমাল দুজন কমিউনিস্ট মন্ত্রীকে তার নিকট পাঠিয়ে পানির মুখ খুলে দেবার অনুরোধ জানালো, কেননা পানির অভাবে কারমালের দুটি উদ্যান ধ্বংসের প্রান্তে পৌছে ছিলো। তারা প্রস্তাব দিলো, পানি ছেড়ে দেবার বিনিময়ে মুহাম্মাদ সিদ্দীক প্রচুর অর্থ লাভ করতে পারেন। মুহাম্মাদ সিদ্দীক তাদের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান পূর্বক বললেন, “আমি তোমাদেরকে অগাধ অর্থ সম্পদ দান করবো এই শর্তের ভিত্তিতে যে, তোমরা অস্ত্র সমর্পণ করবে। খোদার কসম! আমি কাবুলে কারমালের চেয়ে বেশী দিন হুকুমত পরিচালনা করবো এবং আমি আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুমত কায়েম করে ছাড়বো।”

ইটের স্তুপের নীচে এক ঘন্টা

যিন্দানী গুল বলেন, আমি ছোট একটি নালার কিনারে বসে ছিলাম, আচমকা বোমা বর্ষণ শুরু হলো, আমি দ্রুত নালার ভেতর লাফিয়ে পড়লাম। ইত্যবসরে আরো পাঁচ ব্যক্তি সেখানে এসে হাযির হয়। আমাকে হতভম্ব করে তারা আমার উপর পতিত হয়। হঠাৎ বোমার আঘাতে নালার পার্শ্ববর্তী ইটের দেয়াল

বিধ্বস্ত হয়ে আমাদের উপর ধ্বসে পড়ে। ইটের আঘাতে সেই পাঁচ ব্যক্তিই শহীদ হয়ে যায়। আমার অবস্থা অবর্ণনীয়, ইট এবং পাঁচ শহীদের নীচে চাপা পড়ে আমি হাতও নাড়াতে পারছিলাম না, সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকারতো প্রশ্নই আসেনা। এভাবে ঘন্টাখানেক পড়ে থাকার পর কোন দিক থেকে যেন কয়েক জন সাহায্যকারী উপস্থিত হলেন, শহীদদের লাশ এবং ইটের ভগ্নস্তুপ সরিয়ে তারা আমায় এই বিপদের হাত থেকে রেহাই দেন।

মুজাহিদদের আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা

যে কোন অভিযানের পূর্বে মুজাহিদগণ
সেই অভিযানের ব্যাপারে খুটিনাটি সকল পরিকল্পনা সম্পন্ন করে নিজদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে একান্ত আন্তরিকতা, বিনয়, অসহায়ত্ব ও পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে সাহায্যের জন্য দোয়ায় লিপ্ত হতেন। সর্ববিধ প্রস্তুতির পরেও তাদের দোয়া এবং অঝোর ধারায় কান্না একথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিলো যে, মুজাহিদদের নির্ভরশীলতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর। জীবনবাযী রেখে যুদ্ধে যাবার পূর্ব মুহুর্তে রবের দরবারে দোয়া কী পরিমাণ ঈমান ও বিশ্বস্ততার পরিচয় বহন করে তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? এই দোয়ার পরে দেহ মনে কী প্রশান্তি বিরাজ করে তা মুজাহিদ ব্যতীত আর কেউ কি উপলব্ধি করতে পারবে?

ঈমানদ্বীপ্ত একটি ঘটনা

'নামরোয’ প্রদেশে ‘শাহসওয়ার' এবং 'মারজান' নামক দুই ভাই ছিলো। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর শাহসওয়ার কমিউনিস্ট দলে শামিল হয়, মারজান পূর্ব হতেই পূর্ণ মুমিন হিসেবে পরিচিত ছিলো। এক সংঘর্ষে শাহসওয়ার মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়, খবর পাওয়া মাত্র তার ভাই মুজাহিদ মারজান রাইফেল নিয়ে কমান্ডারের সামনে হাযির হয়ে মুরতাদ শাহ সওয়ারকে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো । কমান্ডার তাকে অনুমতি দিলেন। মারজান দ্বীন ও মিল্লাতের দুশমন নিজের আপন ভাই শাহ সওয়ারকে গাছের সাথে রশি দিয়ে মযবুত ভাবে বেঁধে তাকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির ন্যায় গুলী বর্ষণ করে। শাহ সওয়ারের মৃত্যু নিশ্চিত হবার পর সে সাথীদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, মাওলার শোকর যে আমি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছি।

রাশিয়ানদের ভেতর আত্মঘাতী লড়াই

ওয়ারদাক এলাকায় রুশ আফগান যৌথ বাহিনীর সাথে মুজাহিদদের সাত দিন যাবত লড়াই চলছিলো। বিরামহীন গোলাগুলীর ফলে মুজাহিদদের গোলা বারুদ নিঃশেষ হয়ে যায়, তারা আল্লাহর দরবারে সাহায্যের জন্য করুন স্বরে প্রার্থনা জানান। রাতের আঁধারে দুশমনের অবস্থানের দিক থেকে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক গোলাগুলী ও বিস্ফোরণের আওয়ায শুনে মুজাহিদদের বিস্ময়ের সীমা

রইলো না। তারা ভাবলেন, হয়তো মুজাহিদদেরই অন্য কোন গ্রুপ বিপরীত দিক থেকে দুশমনের উপর হামলা চালিয়েছে। অনুসন্ধানের পর জানা গেলো, রাতের বেলা এখানে কোন মুজাহিদ দল পা রাখেনি বরং দুশমন দল কোন এক বিষয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং মারণাস্ত্র নিয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজাহিদদের জন্য সাহায্য স্বরূপ এসেছিলো, এই সংঘাতে উচ্চ পদস্ত অফিসারসহ পাঁচ শতাধিক রুশ সেনা যমদুয়ারে পা রাখে।

দুশমনের মনে ভীতি

জনৈক মুজাহিদ বলেন, দুরবীনের সাহায্যে আমরা দুশমনের প্রতিটি নড়াচড়া এবং তাদের ক্যাম্পে আগত প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। রাতের আঁধারে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত মিনি ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যরা সামান্য সময়ের জন্যও কংক্রীটের ছাদ ও দেয়ালের বাইরে থাকতে চাইতোনা। তাদের মনে সর্বদা এই ভীতি কাজ করতো যে, না জানি কখন মুজাহিদরা হামলা চালায়।

মুজাহিদদের দুঃসাহসিকতা

নিম্নে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের কিছু টুকিটাকি ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছেঃ

যুদ্ধ চলাকালে কোন মুজাহিদ পানি অথবা খাদ্য কিংবা পেশাব পায়খানার প্রয়াজোনীয়তা অনুভব করেনি, সবার মন-মস্তিষ্কে একটি মাত্র ভাবনা এবং একটি মাত্র লক্ষ্য বিরাজ করছিলো তা এই যে, আল্লাহর দ্বীনের দুশমনকে ধূলিস্যাৎ করে দেবো, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কায়েম করবো। একথা উল্লেখ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করছিনা যে, রণাঙ্গণে নামায আদায়ের সময় যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, দোয়ার সময় যে অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং হৃদয়ে যে একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা উদয় হয় তা পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। জীবন মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আমাদের মুখের উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত দোয়া এরূপ ছিলো, “দুশমন যেন আমাদের মোর্চার দিকে অগ্রসর হয় এবং আমরা তাদেরকে জাহান্নামের রাস্তায় পাঠাতে পারি।”

রাইফেলগুলো আমাদের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলো, কিন্তু দুশমন মোর্চার দিকে অগ্রসর হবার স্থলে নেড়ি কুকুরের ন্যায় লেজ গুটিয়ে পলায়ন করলো। আমরা পলায়ন পর দুশমনকে ভেড়া-বকরীর ন্যায় রাইফেলের মুখে আটক করে সামনে হাকিয়ে চললাম। গনীমতের মাল একত্রিত করছিলাম। এবার গুলীর আওয়ায থেমে গিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে “তাসলীম শাহ” (আত্মসমর্পণ করো) “তাসলীম শাহ” এর আওয়ায বুলন্দ হচ্ছিলো।

এই বাক্যের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণের দিকে আহবান করা। সামনের ময়দানে দুশমনের সারিসারি লাশ পড়েছিলো।

ঝোপ ঝাড়, নালা এবং পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দুশমনের বিক্ষিপ্ত সেনাদল আত্মসমর্পণ করতে লাগলো। মৃতদের রাইফেল ও গোলাবারুদ কুড়িয়ে একস্থানে জমা করা হলো। বিকেল ৫টার দিকে যুদ্ধ বন্দী, গনীমতের মাল, অস্ত্রশস্ত্র সহ মুজাহিদগণ মারকাযের পথ ধরলেন। ক্লান্ত শ্রান্ত শরীর এবং ক্ষুৎ পিপাসায় শুস্ক মুখে তাদের চেহারায় মাওলার পক্ষ থেকে দান কৃত এই অভাবনীয় বিজয়ের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার ছাপ ঠিকরে বেরুচ্ছিলো। কৃতজ্ঞতার অশ্রুও দেখা গেলো দুয়েকজনের চোখে।

দুশমনের মাঝে আরসালান রহমানীর ভীতি

বিখ্যাত আলেম ও মুজাহিদ কমান্ডার মাওঃ আরসালান রহমানী রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের সংঘবদ্ধ করা এবং রণাঙ্গনে দুরন্ত সাহসী ভূমিকা পালনের কারণে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছেন। কাবুল রেডিও প্রতিদিন তার ব্যাপারে বিষোদগার করতো। তাকে মানুষ খাদক' নামে অভিহিত করা হয় রাশিয়ানদের মদদ পুষ্ট প্রচার মাধ্যমে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াত অনুযায়ী কাফিরদের জন্য মূর্তিমান আতংক এবং মুমিনদের জন্য সীমাহীন রহমদিল ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন, এই বিশেষণ তারমাঝে পুরোপুরি রূপে বিদ্যমান ছিলো। একবার যুদ্ধ চলতে চলতে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো, রাশিয়ানরা আলোকবোমা নিক্ষেপ করে দুজন মুজাহিদকে অরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে

তাদেরকে ঘিরে ফেলে। সেইদুই মুজাহিদ সিংহ বিক্ৰমে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাদের বিরামহীন গুলীর আঘাতে ১৭ জন রুশ সেনা প্রাণ হারায়, তারাও মারাত্মকভাবে যখমী হন। যখম অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাশিয়ানদের একটি হেলিকপ্টার এসে তাদেরকে বন্দী করে কাবুল নিয়ে যায়। মাওঃ আরসালান রহমানী এ সম্পর্কে অবগত হওয়া মাত্র তৎকালীন আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মুহাম্মাদ দোস্তকে পত্র মারফত হুশিয়ারী প্রদান করেন যে, “গ্রেফতার কৃত আমার দুই সন্তানকে (মুজাহিদ) অনতিবিলম্বে ফেরত দিয়ে যাও অন্যথায় ‘শীরানা’য় অবস্থিত তোমার শ্বশুরালয় মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে।” সমগ্র আফগানিস্তানের লোকেরা এরপর বিস্ময়াভিভূত হয়ে শুনলো যে, বিশেষ একটি হেলিকপ্টারে সাদা ফ্লাগ উড়িয়ে শীরানায় অবতরণ করে যখমী দুই মুজাহিদকে তাদের সাথীদের হাতে ছেড়ে দেয়। সেই দুই মুজাহিদ সুস্থ হয়ে আবার রাশিয়ান সেনা এবং তাদের সেবাদাসদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ে।

স্বপ্নের মাধ্যমে বিমান বিধ্বংসী মেশিনগানের ট্রেনিং

হরকতে ইনকিলাবে ইসলামী পাকতিয়া প্ৰদশের কমান্ডার মাওঃ আরসালান রহমানীর দূর সম্পর্কীয় ভাই শাহ মুহাম্মাদকে লাহোরে ওলামাদের এক সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয় যে, আপনাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয় কে?

উত্তরে তিনি আকর্ষনীয় একটা ঘটনা শুনালেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

১৯৭৯ সালে আমরা রাশিয়ানদের একটি বিমান বিধ্বংসী মেশিনগান ছিনিয়ে নিই। দখলে নিলে কি হবে, আমাদের মধ্যে এমন একজন মুজাহিদও ছিলো না যে এর ব্যবহার জানে, মনের মধ্যে সীমাহীন পরিতাপ নিয়ে রাতের বেলা ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখলাম যে, সাদা লেবাসধারী একজন বুযুর্গ ব্যক্তি বিমান বিধ্বংসী মেশিনগানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এরপর দেখলাম, তিনি সতর্ক হাতে মেশিনগানের বিভিন্ন অংশ আলাদা করলেন। আলাদা করার পর তিনি পুনরায় সেটিকে জোড়া লাগিয়ে বিস্ফোরক পুরো করে নিক্ষেপ করলেন। সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর স্বপ্নের প্রতিটি দৃশ্য ক্রমাগত আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। স্বপ্নে সেই বুযুর্গকে যেভাবে মেশিনগানের যন্ত্রাংশ আলাদা করতে এবং বিস্ফোরক পূর্ণ করতে দেখেছিলাম, ঠিক সেভাবে আমিও আলাদা করলাম, অতঃপর বিস্ফোরক ভরে জোড়া লাগালাম। সেদিন বিকেলের দিকে দুশমনের এক জঙ্গী বিমান লক্ষ্য করে পরীক্ষামূলক গুলী ছুড়লাম, মহান রবের ইশারায় আমার প্রথম হামলায় মিগ-২১ বিধ্বস্ত হল।

প্রতিপক্ষও বাস্তব স্বীকারে বাধ্য হল

পানির ঝর্ণা ধারা মাটি ফুড়ে বের হবার ঘটনা অসংখ্য স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। আল-ফাতাহ গন্ডে’ পানির প্রচন্ড অভাব বিরাজ করছিলো, বারুদের বিস্ফোরণে একটি গর্ত

তৈরী হয়ে কিছুক্ষণের ভেতরেই তা পানি পূর্ণ কুয়ায় পরিণত হয়।

এখানে এমন এক দৃশ্যের বর্ণনা করা হচ্ছে যা সংবাদ পত্রের মাধ্যমে পুরো বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সে সম্পর্কে অবহিত নয় এমন লোকও অনেক রয়েছে।

১৯৮৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন (সিংগাপুর) পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। করাচী থেকে প্রকাশিত দৈনিক জংপত্রিকা মারফত পাকিস্তান সহ গোটা উপমহাদেশের মানুষ এ সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। সংবাদটি নিম্নরূপ:

“শত শত আরব নওজোয়ান আফগানিস্তানে
রুশ আফগান যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে। ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন সিংগাপুর সংস্করণে এক রিপোর্ট থেকে এই সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী আরব যোদ্ধাদের অধিকাংশ লেবানন, মিশর, সিরিয়া ও ইয়েমেন থেকে এসেছে, যারা বিশ্বাস করে আফগান যুদ্ধ আসলে ইসলাম এবং কমিউনিজমের মধ্যে এক সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ। আরব মুজাহিদগণ সকলেই সাধারণ স্বেচ্ছাসেনা হিসেবে এখানে এসেছেন, নিয়মিত সেনাদের সাথে তাদের কোনই সম্পর্ক নেই। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ বিবেচনা করেই তারা সুদূর আরব থেকে আফগান যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এদের সিংহভাগ ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।” রিপোর্টের

প্রথমাংশে রণাঙ্গনে প্রকাশিত কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

হেরাল্ড ট্রিবিউনের রিপোর্ট অনুযায়ী, যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো কখনো শহীদ মুজাহিদদের আওয়ায শোনা গিয়েছে, যার অর্থ দাঁড়ায়, শহীদগণ মৃত্যুবরণ করেননি। কয়েক মাস পূর্বে আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে এক রাতে দুই মুজাহিদের কবর থেকে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি দৃশ্যমান হয়েছে, যা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছিলো। বিশ্বস্ত এক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে, শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদদের দেহ হতে প্রাণ কাড়া সুগন্ধও নির্গত হয়। অপরদিকে রুশ-আফগান বাহিনীর কোন সদস্য মারা যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সেই মৃতদেহ হতে বিষাক্ত দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সউদী আরবের হেলাল আহমর হাসপাতালের পরিচালক আবু হুযাইফার মতে, এধরণের ঈমানদ্বীপ্ত অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পাবার ফলে মানুষ খুব দ্রুত জিহাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং দলে দলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রওয়ানা হচ্ছে। (দৈনিক জং ২৫ জুলাই ১৯৮৬)

স্বপ্নে হারিয়ে যাওয়া মুজাহিদের সাক্ষাত

যারবান অঞ্চলে অবস্থিত মুজাহিদদের মারকায সিরানা’র উপর সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত রুশ জঙ্গী বিমান অনবরত বোমা বর্ষণ করে, বোমার আঘাতে মারকায ধূলিকণায় পরিণত হয়। এক মুজাহিদ শহীদ, একজন যখমী এবং একজন হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া

মুজাহিদের সন্ধানে পরবর্তী পাঁচ দিন আশপাশের পুরো এলাকা চষে ফেললেও কোথাও তার খোঁজ মিললো না। ছোট্ট একটি বাচ্চা এবং মুজাহিদ সাথী আব্দুল ওয়াহিদ স্বপ্নে দেখলো হারিয়ে যাওয়া মুজাহিদ বলছে, “আমি রান্না ঘরে খড় কুটোর নীচে চাপা পড়েছি।” আব্দুল ওয়াহেদের বর্ণনানুযায়ী দ্রুত রান্না ঘরের ছড়ানো ছিটানো লাকড়ির নীচ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হলো। অবিকৃত লাশ থেকে প্রাণ কাড়া সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিলো।

বরকত

মাওলানা জালালুদ্দীন হক্কানী বর্ণনা করেন, আমি জনৈক মুজাহিদকে কিছু গুলী দিলাম, যা নিয়ে সে যুদ্ধে অংশ নেয় এবং দুশমনকে লক্ষ্য করে অসংখ্য গুলী বর্ষণ করে কিন্তু খোদার রহমতে আমার দেওয়া গুলী হতে একটি গুলী ও কমে যায়নি। সে ঠিক ততগুলো গুলী নিয়ে ফিরে আসে যতগুলো নিয়ে গিয়েছিলো।

দুশমনের দৃষ্টিসীমা থেকে মুজাহিদদের অদৃশ্য হয়ে যাবার ঘটনাঃ

আমি রাশিয়ানদের সামনে ছিলাম কিন্তু তারা আমায় দেখতে পায়নি

কাবুলের মুসাবী এলাকার আব্দুল কুদ্দুস বর্ণনা করেন, “রুশ-আফগান বাহিনী

আমাকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে। তারা লোকদেরকে ধরে ধরে আমার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চায়। তারা গ্রামের লোকদের পরিচয় পত্র চেক করতে থাকে। আমার নিকট এসে পরিচয় পত্র দেখাতে বললে আমি পরিচয় পত্র তাদের হাতে দিলাম। যে সৈনিক পরিচয় পত্রে অনুসন্ধানী চোখ বুলাচ্ছিলো সে ইতোপূর্বে আমাকে দেখেছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে সে আমাকে চিনতে না পেরে পরিচয় পত্র ফেরত দিলো। তারা চলে যাবার পর আমি পার্শ্ববর্তী বাগানে গিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলাম। ওদিকে রাশিয়ানরা গ্রামের বাসিন্দাদের উপর নিপীড়ন শুরু করলো। তারা অগ্নি দৃষ্টি হেনে প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন করছিলো বল আব্দুল কুদ্দুস কোথায়? তারা উত্তরে বলল, এই মাত্র তোমরা তার আইডেন্টি কার্ড চেক করেছো, আব্দুল কুদুস তখন তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলো। রাশিয়ানরা গ্রামের সর্বত্র আমাকে খুঁজতে লাগলো, এমনকি এক সময় সেই বাগানে আমার সামনে এলেও তারা আমাকে দেখতে পায়নি।”

রাশিয়ানদের চোখের সামনে অদৃশ্য পর্দা নেমে এসেছে

মুজাহিদ আব্দুল কুদ্দুস আরো ঘটনা বর্ণনা করেন।

“এক সংঘর্ষে দুশমন জঙ্গী বিমান আমাদেরকে লক্ষ্য করে গ্যাস মিশ্রিত বিষাক্ত বোমা নিক্ষেপ করে, গ্যাসের

সংক্রমণে আমার নওজোয়ান পুত্র আব্দুল্লাহ এবং আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আমরা বেহুশ অবস্থায় পড়ে থাকি, উল্লেখ্য আমরা বাপ-বেটা উভয়ে রোযাদার ছিলাম। বেহুশ থাকা কালীন বিশাল পদাতিক বাহিনী আমাদের অবশিষ্ট সাথীদের উপর হামলা চালায়। ট্যাংক সমভিব্যহারে তারা দীর্ঘ সময় আমাদেরকে সন্ধান করতে থাকে, কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পায়নি। অথচ আমরা তাদের সামনেই বেহুশ হয়ে পড়েছিলাম। হুশ ফেরার পর আশপাশে তাদের ট্যাংকের চাকা ও বুটের দাগ এবং পরিত্যক্ত বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখে আমরা তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম।”

কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে দুশমনের দৃষ্টি থেকে গায়েব হয়ে গেলাম

আফগানিস্তানের আদিবাসী গোত্র সুলাইমান যাঈ' এর সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ফকীর রমযান একজন দরবেশ প্রকৃতির মুজাহিদ, যিনি দখলদার রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে ১৯৮০ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন; পাকতিয়া প্রদেশের আরগুন এলাকায় মুজাহিদগণ রণাঙ্গনে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তাদের মাঝে আমিও শামিল ছিলাম। আচানক পাহাড়ের আড়ালে দুশমনের ট্যাংক এসে হাযির হয়। তখন আমি একদম খোলা ময়দানে ট্যাংকের সামনে পড়ে যাই। পার্শ্বেই ছোট্ট এক নালা এবং কূপ

দেখতে পেয়ে সেদিকে ছুটলাম, ট্যাংকের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কূপের ভেতর ঝাপ দিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে কূপের মুখ বন্ধ দেখলাম, এভাবে সারিবদ্ধ ৫/৬টি কূপের সামনে ছুটে দেখলাম সবগুলোর মুখই বন্ধ। ইত্যবসরে ট্যাংক আমার খুব নিকটে পৌছে মুজাহিদদের লক্ষ্য করে গুলী বর্ষণ শুরু করে। আমি আল্লাহর দরবারে সাহায্যের ফরিয়াদ জানিয়ে কুরআনের একটি আয়াত পড়তে লাগলাম যার তরজমা নিম্নরূপঃ “অতঃপর আমি তাদের সামনে ও পিছে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করালাম, ফলে তারা দেখতে ব্যর্থ হলো।” আশ্চর্য হলেও সত্য কিছুক্ষণের মধ্যে ট্যাংক উল্টো পথ ধরে চলে যায়।

(সমাপ্ত)